কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৪। দ্বিতীয় বৎসর।

দ্বিতীয় খণ্ড,—১২৯৫-৯৬।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত সম্পাদিত।

তাহিরপুর—রাজসাহীর আদর্শ-ভূম্যধিকারী
মহানুভব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়
মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "কর্ণধার" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY WOOMA CHURAN CHAKERBUTTY
AT
THE HERALD PRINTING WORKS:
107, Bow-Bazar street, Calcutta.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১১২
২(ক)

সূচিপত্র।

	বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
১।	আগমনী—ভক্তের রোদন (গান)	সম্পাদক	২২৪
২।	আধ্যাত্মিক কৌতুক (পদ্য)	শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়	৯৫
৩।	আমেরিকায় অবস্থান	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	১৩১
৪।	কর্ণধার ও আমাদের নিবেদন	সম্পাদক	১
৫।	করমেতি বাই	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব	৯৭
৬।	তেগ্ বাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহ	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত	২১৩
৭।	দাদা ও আমি (সমালোচনা)	সম্পাদক	৪১
৮।	দু' দিন	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী	১৩৬
৯।	ধর্ম্মকম্পন	শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী	৮৩
১০।	পরিণাম—হরিনাম	সম্পাদক	২৫
১১।	প্রবাস-পর্য্যবেক্ষণ	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	২৫৯
১২।	ফুলের সাজি—নং ১ (কবিতাগুচ্ছ)		১৬
	অঞ্চলের বাতাস	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল	
	শৈশব-গান	শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	
	অরণ্যে	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়	
	সুন্দর	সম্পাদক	
	প্রেম	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	
১৩।	ফুলের সাজি—নং ২ (কবিতা ও গান)		৩৭
	শক্তির ধ্যান	৺ রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর	
	বিবাদ-ভঞ্জন	শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়	
	প্রেম-গীতি	শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার	
	ভ্রান্ত-তারা বা খদ্যোতিকা	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	
১৪।	ফুলের সাজি—নং ৩ (কবিতা)		৬১
	ভগ্ন-হৃদয়	৺ হেমনাথ দত্ত	
	নিশীথে বংশীধ্বনি	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৫।	ফুলের সাজি—নং ৪ (কবিতা ও গান)		৮৯
	সাধন-সঙ্গীত	৺ রায় গঙ্গাচর সরকারণ বাহাদুর	
	পাতা	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়	
	বিরহ-গীতি	শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার	
	সুন্দরী	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	

১৬। ফুলের সাজি—নং ৫ (কবিতা ও গান)			২১৭
রাসলীলা	...	... শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত ...	
প্রেম-উপহার	...	.. শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভাবে ভুল	...	... শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
মা	...	... শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	
১৭। ফুলের সাজি—নং ৬ (কবিতা ও গান)			২৬২
ভবানী-স্তব	...	... সম্পাদক	
ফুল-নারী	...	... শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ...	
প্রেম-গীতি	...	... শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ	
বিদায়	...	... শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
শেষ	...	... সম্পাদক ...	
১৮। বউ কথা কও	...	... শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৯
১৯। বিবিধ প্রসঙ্গ	...	... সম্পাদক	১৪২, ১৯২
২০। বিমলা	...	...শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	২৩২
২১। মনুষ্যত্ব	...	... শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে ...	১১০
২২। মহিলা (সমালোচনা)	...	সম্পাদক ...	২৪৫
২৩। মাধবী-বল্লরী (সমালোচনা)	...	শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার...	১৯৩
২৪। মীরাবাই	...	... সম্পাদক ...	২৫৩
২৫। শিশু-যোগী	...	... শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র পাল ...	১০১
২৬। সঙ্গীত	...	... সম্পাদক ...	৮৭
২৭। সংসার-আশ্রম (উপন্যাস)	...	সম্পাদক	৭,২৫,৪৯,৭৩,১১৯,১৪৫
২৮। সংসার না দর্পণ ?	...	শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র সেঠ ...	১২৬
২৯। সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং	...	শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার	১৪
৩০। স্বপ্নদর্শন—কলিকাতা	...	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত ...	১৩৬
৩১। সাধন ও সাধক	...	সম্পাদক	৬৫, ৯১
৩২। সাধন-সঙ্গীত ...	...	শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ...	২৩
৩৩। সাহিত্য-সংবাদ		সম্পাদক	৪৭, ৯৫, ২২০, ২৬৫
৩৪। সিপাহি যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রধান সেনাপতির কার্য্য-শিথিলতা	...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ...	২
৩৫। সুরে বাঙ্গালা ...	...	শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ...	২

দ্বিতীয় বৎসর, দ্বিতীয় খণ্ড। ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১২৯৫।

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১। কর্ণধার ও আমাদের নিবেদন	...	সম্পাদক ...	১
২। সংসার-আশ্রম (উপন্যাস)	...	সম্পাদক ...	৭
৩। ফুলের সাজি (কবিতা গুচ্ছ)	...	... ...	১৬
অঞ্চলের বাতাস	...	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ...	
শৈশব-গান	...	শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ..	
অরণ্যে	...	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় ...	
সুন্দর	...	সম্পাদক ...	
প্রেম	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ...	
৪। সিপাহিযুদ্ধের প্রারম্ভে প্রধান সেনাপতির কার্য্য-শিথিলতা	...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত	২০
৫। সাধন-সঙ্গীত	...	শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ...	২৩

জনৈক মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ভূপতি মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শান্তিতত্ত্ব প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কর্ণধার সম্পাদক
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত

শঙ্কর বিজয়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনী, ধর্ম্মপ্রাণ নূতন নাটক, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

"শঙ্কর বিজয় নাটক, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত দ্বারা বিরচিত। শঙ্কর চার্য্যের বৃহৎ জীবনী হইতে নাটকাকারে যে সকল অংশ দেওয়া যাই পারে, তাহা সুন্দররূপে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থখ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ত এই গ্রন্থখানি কোন নাট্যশালায় অভিনীত হইতে দেখিলে বি হইব। এরূপ নাটক অভিনয় দ্বারা কেবল দর্শকবৃন্দের আনন্দ লা তাহা নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁহারা জ্ঞান লাভ আমরা পারিবেন। হারাণ বাবু একজন পরিচিত লেখক, সুতরাং তাঁহার রচনা সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছুই বলিতে হইবে না।" সময়, ৯ই বৈশাখ, ১২৯৫।

* "গ্রন্থকারের ধর্ম্মবুদ্ধি ও সদুদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।" ১ বঙ্গবাসী।

"গ্রন্থকর্ত্তা উপযুক্ত বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এ সমস্ত বিষয় সকলের সুগোচর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। * * * স্থানে স্থানে ধর্ম্মভাবের বেশ অঙ্কুর দৃষ্ট হইল। ভাষার লালিত্য আছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।" সোমপ্রকাশ।

* "গ্রন্থকার গ্রন্থখানি প্রণয়নে যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। স্থানে স্থানে লেখকের লিখিবার শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা তাহার এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।***" প্রজাবন্ধু।

* "আমাদের আরো আনন্দের বিষয় যে, হারাণ বাবু লিখিতে শিখিয়া অবধি ভক্তি প্রেমে মাতোয়ারা! অধিক কি, এবারও তাঁহার উদ্বোধন-গীতি গাইতেছে—* " অনুসন্ধান।

ইঁহারি প্রণীত সর্ব্বজন প্রশংসিত ও আর্য্য নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত, 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক' একটি মাত্র চরিত্রে নবরসের অপূর্ব্ব সম্মিলন!

"পর পর বেশ সামঞ্জস্য আছে, সূতার টান আছে। * নবমে শান্তি, অভিনয় দর্শনে শান্তি লাভ হইয়াছে। রক্ষিত মহাশয়ের উদ্দেশ্যও রক্ষিত হইয়াছে।" সহচ

* "কবিত্ব আছে, লালিত্য আছে, মধুরত্ব আছে।" প্রজাব

"জিনিস উত্তম হইয়াছে" স

* "নাটকখানি উত্তম হইয়াছে।" এডুকেশন গে

* "পাঠকগণের বিশেষ অনুভব শক্তি না থাকিলে, উত্ত রসের আস্বাদন করিবার সম্ভব হইতে পারে না।" সোম প্রক

কর্ণধার কার্য্যালয়ে ও আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলি

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় বৎসর।

[দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯৫-৯৬।]

কর্ণধার ও আমাদের নিবেদন।

গুরুভার স্কন্ধে লইয়া কর্ণধার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। দুস্তর সংসার-সাগরের প্রবল ঝটিকায়—ঘটনা-স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া, ইহার প্রথম বর্ষ বড়ই বিপদ-সঙ্কুলাবস্থায় কাটিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও সাহিত্য রাজ্যে, যদিও কর্ণধার মহানুভব সহৃদয় জনগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া, গৌরব ও প্রতিপত্তি লাভে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছে, তথাপি আমরা—আমাদের আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। যে মহান্ উদ্দেশ্য ও গন্তব্য-পথ লক্ষ্য করিয়া, কর্ণধার আপন ক্ষুদ্র হৃদয়, বিশাল ভবার্ণবে পাতিত করিয়াছে, যে গভীর উদাত্তভাবে বিমুগ্ধ হইয়া, কর্ণধার অসীম ধর্ম্ম ও সাহিত্য রাজ্যের পথিক হইয়াছে, যে কঠোর দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া, কর্ণধার স্বীয় কর্ত্তব্য-ব্রতে দীক্ষিত হইবার অভিলাষে কৃতসঙ্কল্প,—সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন—সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভব-কর্ণধার ভগবান—কি—সে উদ্দেশ্য সফল করিবেন না? ভক্তের ভগবান—সাধকের কল্পতরু! এ ত শাস্ত্রের কথা!—শাস্ত্রের কথা কি কখন অন্যথা হইতে পারে? তাই আশা হয় যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে—লক্ষ্য উর্দ্ধদৃষ্টি হইলে—সর্ব্বমাঙ্গল্যে পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারিলে,—এক দিন না এক দিন—জীবনের চির আশা—প্রাণের গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস—ও অনন্ত পিপাসা মিটাইয়া কৃত-কৃতার্থ হইব।

। ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১২৯৫।

কর্ণধারের উদ্দেশ্য ও আশা, কেবলই মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি ও আর্থিক সাহায্যে সফল হইবার নয়;—আরও কিছু—আরও বেশী। তাহা ভগবন, তোমারই সকরুণ কৃপা কটাক্ষ—তোমারই রাতুল চরণাশ্রয় লাভ! মানুষের যে একটুও অতি সামান্য শক্তি, তাহাও দেব, তোমারই অনন্ত শক্তি-সঞ্জাত; সুতরাং তোমার দয়ায় বঞ্চিত হইলে, কর্ণধার গন্তব্য পথে চলিবে কিরূপে? তুমি লীলাময়,—সর্ব্বত্রই তোমার লীলা বিদ্যমান,—লীলা খেলাই তোমার একমাত্র কার্য্য! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লীলায় সৃজন—লীলায় পালন—লীলায় পুনঃ লয় পাইবে। তাই আবার বলি,—অন্তর্য্যামি! ভাষায় প্রকাশ করিব না—করিবার ক্ষমতাও নাই,—আমাদের অন্তরের ভাব বুঝিয়া—প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানিয়া,—হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিয়া—খেলিতে খেলিতে—কি এই নশ্বর কর্ণধারের নশ্বর খেলার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিবে না? ভব-কর্ণধার! তোমার শুভাশীর্ব্বাদ ও করুণ দৃষ্টি লাভ করিলে, আমাদের এই নশ্বর কর্ণধারও—কালে অবিনশ্বর অমর-পদ লাভ করিতে পারে; তাই দেব, নামে নামে মিলাইয়া, অনুক্ষণ তোমারই মহিমা গান করিয়া আসিতেছি: আমাদের এ পার্থিব কর্ণধার, পাপীর কি—কাহারও উদ্ধারকর্ত্তা নয়; এ নিজেই নিজের দুর্গতিতে জীবন্মৃত, নিজেই উদ্ধার পাইলে কৃত-কৃতার্থ হয়; পরিত্রাণকারী—তুমিই সে ভব কর্ণধার! তবে বুঝিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া তোমার নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই, সকল দুঃখের অবসান হয়!—তাই দেব, আমরা নামে নামে মিলাইয়া—তন্ময়ভাবে কর্ণধারের বিষয় চিন্তা করিব;—অভ্যাস গুণে—শুভ মাহেন্দ্র-যোগ সম্মিলনে যদি তোমার প্রতি কোন রকমে প্রাণ টানিতে পারে, এই মাত্র। শুনিয়াছি, কোন পবিত্র পুরাণের একস্থলে লিখিত আছে যে, পুত্র নারায়ণের নাম প্রাণভরে উচ্চারণ করিয়াই, ভাগ্যবতী জননী ইহ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন!

দেব! দুঃখের সময় তোমায় সকলেই ডাকে, কিন্তু সুখের অবস্থায় বোধ হয় বড় একটা তোমার নাম গ্রহণ করে না।—কিন্তু দেব, আমরা তোমায় দুঃখের দিনেও ডাকিয়াছি, আজ সুখের দিনেও প্রাণভরে ডাকিয়া তোমায় কৃতজ্ঞোপহার দিব। উপহার আর কিছু নয়—কয়েক বিন্দু আনন্দাশ্রু মাত্র! কর্ণধারের তিরোভাবের আশঙ্কায় এক সময়ে বিষাদপূর্ণ গভীর দীর্ঘশ্বাসে তোমার

আসন বিচলিত করিয়াছি, আজ সুখের দিনে আনন্দাশ্রু-নীরে তোমার অভয় চরণ যুগল সিক্ত করিব। সে সুখ কি, ক্রমে নিবেদন করিতেছি।

যদি প্রকৃতই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে ইচ্ছাময়, সে ইচ্ছা তোমার ইচ্ছায় সম্মিলন হয়,—তাহার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী, ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। নতুবা কর্ণধার ত এক রকম বন্দই ছিল,—তাহার আশানুযায়ী লৌকিক-সাহায্য মিলিবে না ভাবিয়া, আমরা হাল দাঁড় ত এক রকম ছাড়িয়াই ছিলাম!—তবে কে হঠাৎ কুল মিলাইয়া দিল?—কে সঞ্জীবনী-মন্ত্র-বলে প্রাণে তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত করিল?—কাহার ইচ্ছায়—আবার কর্ণধার সাহিত্য-রাজ্যে আবির্ভাব হইল? দেব, এ সকলেরই মূল তুমি! তোমার ইচ্ছা না হইলে, কর্ণধার সহসা এক জন মহানুভব হৃদয়বান মহাত্মার অন্তর আকৃষ্ট করিল কেন? অনেক ধন কুবেরের হস্তে ত কর্ণধার পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ *** এ ব্যক্তিই বা কেন আপনা হইতে স্বেচ্ছায় এ ব্যয়-ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন? ইহাতে ইঁহার স্বার্থই বা কি? আহা, ব্যথার ব্যথী *** কুল-ভূষণ, ধন্য তোমার মহানুভবতা, ধন্য তোমার সাহিত্যানুরাগ, ধন্য তোমার ঔদার্য্য! যে স্বতঃসিদ্ধ মহান্ উদারতা গুণে আকৃষ্ট হইয়া তুমি কর্ণধারের জীবন রক্ষা করিলে, করুণা-নিধান ভব-কর্ণধার মঙ্গলময় হরি, ঈদৃশ আরও বহু কল্যাণকর কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ, ইহ পরলোকে নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন;—আমরা প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার নিকট সর্ব্বান্তকরণে অবিরাম তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি! আমরা দীন হীন দুর্ব্বল, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অশ্রুবিন্দু অপেক্ষা উপকারীর প্রতি ভক্তি ও সম্মান দেখাইবার আর কি অধিক মূল্যবান দ্রব্য আছে—জানি না,—থাকিলেও, সে ক্ষমতা আমাদের নাই।

কর্ণধার আবার যে পাঠকের হস্তে দিতে পারিব, এ আশা ছিল না।—তাহার কারণ, গত বৎসর আমরা কতকগুলি গ্রাহকের দৌরাত্ম্যে বড়ই জ্বালাতন হইয়াছিলাম। সেই উৎপীড়নে অস্থির হইয়া মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যদি ভগবান কখন এমন দিন দেন যে, হৃদয় বিহীন গ্রাহকের মুখাপেক্ষা না হইয়াও, বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত নিয়মিতরূপে কর্ণ-

ধার প্রকাশ করিতে পারিব, কোনরূপ আর্থিক সাহায্যাভাবে "হা—হুতাশ" করিতে হইবে না, তবেই আবার ইহার দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ করিব—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। বৎসরের যথা সময়ে কর্ণধারের আবির্ভাব না হইলেও, আমরা যে সঙ্কল্প ব্রতে সিদ্ধকাম হইলাম, ইহা আমাদের পক্ষে বড় কম সুখ—কম সৌভাগ্যের কথা নয়! তাই আজ আমাদের এত আনন্দ—এত উৎসাহ! এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক মূল্য দিয়া—সুহৃদভাবে দশ জন মাত্র গ্রাহক হ'ন—বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতারক হইয়া—শত্রুভাবে শতেক জন গ্রাহক বা ভক্ষক হ'ন, এ অনুরোধ আমরা আর কাহাকেও করি না। 'হারামী'র দশ টাকা অপেক্ষা, 'হালালী' র একটি মাত্র পয়সাও ভাল! আর সেই জন্য উপহারের প্রলোভনও দেখাইলাম না।

তা'র পর কর্ণধারের লিখন-প্রণালী।—আজ কাল 'ধর্ম্ম ও সাহিত্য' বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষালোক-প্রাপ্ত নব্য সম্প্রদায়দিগের মধ্যে একটি তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। কর্ণধারও প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম ও সাহিত্য ইহার প্রাণ—এবং ইহার জন্ম বা আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্যও এই জন্য। কার্য্যতঃ পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ না করিলেও, ইহার লক্ষ্য বরাবর এই এক-ই ভাবে আছে, থাকিবে ও। তাই কর্ণধারের কোন কোন নব্য-পাঠক, মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, "কর্ণধারে এত নীরস ধর্ম্ম-প্রবন্ধ (?) থাকে কেন?" এ প্রশ্নটি নূতন নয়—প্রথমবর্ষের প্রচারেও এ কথা একবার উঠিয়াছিল। নব্য সম্প্রদায়দিগের মতে, ধর্ম্ম—সাহিত্যের উন্নতি পথের অন্তরায়। কিন্তু এ শ্রেণীর লেখক ও পাঠকদিগের নিকট আমাদের নিবেদন যে, ধর্ম্ম ও সাহিত্য এ জিনিসটি কি, একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন। বলা বাহুল্য, মূল—ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন—সাহিত্যের উন্নতি ত দূরের কথা—তাহার অস্তিত্বও থাকে কিনা সন্দেহ! যেহেতু, সাহিত্য বিশাল ধর্ম্ম-বৃক্ষের একটি প্রধান শাখা। যাহা প্রকৃত সাহিত্য, তাহার স্তরে স্তরে ধর্ম্মের গভীর ভাব জীবন্তভাবে ফুটিয়াছে। ঈদৃশ ধর্ম্মভাবপূর্ণ সাহিত্য, গভীর মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে, অন্তরে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, সংস্কৃত 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক লিখিয়াই গ্রন্থকার দণ্ডী হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন চিন্তাশীল ভাবুক পাঠক, আমাদের পঞ্চম বেদস্বরূপ বিশাল ভারতগ্রন্থ—কিম্বা ভক্তি ও শান্তিরসপূর্ণ পবিত্র ভাগবত পাঠ করিয়াই, সংসার সুখে জলাঞ্জলি দেন। এই ত সাহিত্য—এই ত কাব্য!—এই ত রচয়িতা—এই ত পাঠক! তাই বলিতেছিলাম, যাহা প্রকৃত সাহিত্য, তাহা ধর্ম্মের জীবন্ত ভাব ভিন্ন কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না, আর সে সাহিত্যের ক্ষমতা যে কত, তাহা বর্ণনাতীত! আজ কাল নাকি রাশি রাশি 'কাব্যি' বাহির হইয়াই সাহিত্যের শ্রাদ্ধ করিতেছে, তাই সেই শ্রেণী গ্রন্থকার এবং পাঠকদিগের নিকটও ধর্ম্ম জিনিসটা অতি অপাদার্থ 'কিম্ভূত কিমাকার' ভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃত আপন প্রাণের ভাব লিখেন কয় জন? উচ্ছ্বাসের সময় কলমের মুখে বাহির হয় বৈত নয়!—আর সেই জন্যই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মতভেদও হইয়া থাকে। যাইহোক, এ সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। আর, আমাদের ও বেশী কিছু নূতন বলিবার নাই,—যেহেতু প্রথমবর্ষের প্রচারে এ সম্বন্ধে বেশ একটি গভীর-চিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গ—বিশেষ নব্য সম্প্রদায়কে সেই প্রবন্ধটি দেখিতে অনুরোধ করি। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিতও বলিয়াছেন,—"Literature is but a branch of Religion!" এ কথায় এমন বলিতেছি না যে, ধর্ম্ম-প্রবন্ধ লিখিলেই সে ধার্ম্মিক হইল—বা তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। তবে এই অবধি বেশ বলা যায় যে, বাজে ফক্কড়ী বা ইংরাজী গন্ধপূর্ণ প্রণয় ও ভালবাসার আদ্যশ্রাদ্ধ না করিয়া, যদি সময়ে সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুই একটি প্রবন্ধও আলোচনা করা যায়, তবে তাহাতে নিজেরও উপকার আছে, আর পাঁচ জনেরও প'ড়ে—অন্ততঃ লেখকের সদুদ্দেশ্য দেখেও তৃপ্তি লাভ হয়। বিশেষতঃ আমাদের এ ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষে,—যেখানে আহারে বিহারে—শয়নে স্বপনে—কথায় কার্য্যে—এমন কি প্রত্যেক অতি ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্র হইতে মহা মহা বিষয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—ধর্ম্মের ভাব ওৎপ্রোত ভাবে সীমাবদ্ধ, এ হেন স্থলে যে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিপথের প্রধান সুহৃদ—সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মের ভাব সংমিশ্রণ হইবে, ইহারই বা বৈচিত্র্য কি!

তবে এখানে এক কথা উঠিতে পারে যে, "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"—সকলের রুচি সমান নয়। সে কথা স্বতন্ত্র। সে শ্রেণীর পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু কর্ণধার যাহাতে সর্ব্ব শ্রেণীরই পাঠ্য হইবার উপযোগী হয়, এবম্বিধ প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশ করিতে আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটী করিব না। এই দ্বিতীয় বর্ষ হইতে আমরা কর্ণধার নূতন পর্য্যায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বজায় রাখিয়া—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে ইহার প্রাণস্বরূপ করিয়া সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, জানিনা। তবে উপন্যাসই হ'ক, চুট্‌কি গল্পই হ'ক, আর রহস্য-পূর্ণ সামাজিক বা সাময়িক চিত্রই অঙ্কিত হ'ক,—যাহা কিছু ইহাতে বাহির হইবে, তাহাতেই ধর্ম্ম ও নীতির ভাব বিদ্যমান থাকিবেই;—এ মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া—কর্ণধার কখনই বিপথগামী হইবে না! এখন মঙ্গলময়—সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা ভগবানের ইচ্ছা!

অনুগ্রাহক, গ্রাহক, সহযোগীবর্গ ও পাঠক মহোদয়—সকলকেই আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা সকলকেই হৃদয়ের আলিঙ্গন দিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি লাভে অভিলাষী। দশের উৎসাহ ও সহানুভূতি ভিন্ন, মানুষ কার্য্যক্ষেত্রে কোন্ কালে সফল মনোরথ হইয়াছে? কর্ণধারের পুনর্জীবন লাভের জন্য যাঁহারা একান্ত উৎসুক ছিলেন, তাঁহাদের মঙ্গলেচ্ছার প্রতিদান স্বরূপ, আমরা প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা আনন্দ সহকারে উপহার দিতেছি।

এখন আবার বলি, ভাবরূপ অব্যক্ত—ভক্তের ভগবান—কল্পতরু ভব-কর্ণধার, দেব! যাহা চিরদিন তোমার নিকট চাহিয়া আসিতেছি, তাহা কি পাইব না? জীবনের সে চির আশা ও এই নশ্বর কর্ণধারের অভিলাষ কি পূর্ণ করিবে না?—হাঁ দেব, আশা হয়, করিবে! তাহার ইঙ্গিত ও আভাস পাইয়াছি। তাই আজ আবার নব উদ্যমে, নব অনুরাগে কর্ণধারের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ করিলাম। দেব, এখন আশীর্ব্বাদ কর—হৃদয়ে বল দাও, যেন সফল মনোরথ হই। মহান্ কর্ত্তব্য-ব্রত ও সদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিহঙ্গের ন্যায় কেবলই শূন্যে—শূন্যে—

মহাশূন্যে ভ্রমণ না করি! অন্তর্য্যামি, ভক্ত-বৎসল ভগবন, এই আমাদের প্রাণের গভীর প্রার্থনা—এই আমাদের অন্তরের ঐকান্তিক নিবেদন!!!

সংসার-আশ্রম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ও মা,—মা! ও মা,—আর যে পারিনে মা!"

"বাবা! কি কর্‌ব বল্,—আর একটু দেরি কর্।"

"ক্ষিদেয় যে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গেল মা! বাবা গো, তুমি এখন কোথায়?"

অষ্টম বর্ষীয় একটি বালক অনাহারে ছট্‌ফট্ করিতেছে, পার্শ্বে ধূলি-শয্যায় শায়িতা তাহার অভাগিনী জননী। বালকের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে মায়ের করুণ-হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল; প্রাণের স্তরে স্তরে যেন শত বৃশ্চিকে দংশন করিল; অন্তর-গ্রন্থি গুলি শিথিল হইয়া পড়িল। অমনি দীনের সম্বল—দুর্ব্বলের বন্ধু—অনাথের সহায়—শোণিত ধারা—অশ্রুবেশে বক্ষস্থল ভাসাইয়া, শোকের প্রথমোচ্ছ্বাস সান্ত্বনা করিল। হায়, দুঃখময় কঠোর সংসারে যা'র 'মা' নাই, তা'র মত হতভাগ্য আর কে আছে!

একটি বিষাদপূর্ণ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মা কহিলেন,—"বাবা, আর কাঁদিস্ নে,—ও বাড়ীর ঠাকুজ্জিকে ব'লে এসেছি, দুটি ভাত দিয়ে যাবে এখন। এতক্ষণে তা'দের রান্না হ'য়ে গেছে, কি কাজের গতিকে বুঝি আস্‌তে পাচ্ছে না;—যা' হ'ক, এই এল ব'লে।"

মায়ের কথা শেষ হইতে না হইতে, একটি বৃদ্ধা এক খানি ছোট থালায় কিছু অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া, মাতা প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে কতই অনুনয় বিনয় করিলেন। সম্মুখে পাত্রপূর্ণ অন্ন-ব্যঞ্জন দেখিয়া, বালকটি যেন সজীব হইল। আনন্দিত হইয়া জননীকে কহিল,—"মা, দাদা কি খা'বে?—এ থেকে দাদাকে ও দুটি দে।"

দারিদ্র্য! তোমায় শত কোটি নমস্কার। তুমি মহান্ হইতেও মহান্—

অনন্ত মহান্! তোমারি প্রভাবে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা নবজীবন লাভ করে। তোমাতেই ধর্ম্ম, তোমাতেই জ্ঞান, তোমাতেই প্রেম; এক কথায় তুমিই স্বর্গ! দুগ্ধপোষ্য বালক, ক্ষুধায় জর্জ্জরিত,—তাহার মুখে এই কথা, "মা, দাদা কি খা'বে?—এ থেকে দাদাকেও দুটি দে।" কি উদার ভাব!—কি সুন্দর মাধুর্য্য!—কি জ্বলন্ত আত্মত্যাগ! দারিদ্র্য, তোমার আদর—তোমার মাহাত্ম্য, এ সংসারে কয় জনে বুঝিতে সক্ষম!

মাও তাহাই করিলেন,—এক খানি ভাঙা পাথরে তাহা হইতে কিয়দংশ অন্ন ব্যঞ্জন তুলিয়া রাখিলেন। সোনার চাঁদ বালকটিও চাঁদপারা মুখে—হরষিত মনে অবশিষ্ট অন্ন কয়টি ভক্ষণ করিতে লাগিল।

দয়ার শরীর বৃদ্ধা কহিল,—"ছোট বউ, এ কয়টি ভাতে বিনোদের কি হ'বে? আর ধীরেন্ শৈলেন্-ই বা খা'বে কি? তুই ত না খেয়েই মচ্ছিস ব'ল্লে হয়।"

"আর বোন্, ভগবান খেতে দেন কৈ! যে দিন থেকে তিনি গেছেন, পোড়া পেটের দায়ও সে দিন হ'তে ঘুচেছে। সাধু পুরুষ তিনি,—তাঁর স্বর্গ হ'য়েছে,—এ যন্ত্রণার হাত এড়িয়েছেন;—আমি মহাপাপিনী, তাই এ সব ভোগ কর্‌বার জন্যেই বেঁচে আছি। এখন বোন্, তোরা আশীর্ব্বাদ কর্, যেন এই ছানা কয়টি রেখে শীগ্‌গির ভালয় ভালয় স'রে যেতে পারি।"

অনাথিনী রোদন করিল—তাহা বড়ই করুণাত্মক—বড়ই মর্ম্মভেদী! বৃদ্ধা নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। অবশেষে কহিল,—"ছোট বউ, আর কাঁদিস্ নে।—তোর ভাবনা কি?—তোর এত গুলি সোনার চাঁদ রয়েছে, একটিও কি মানুষ হ'বে না? এখন আয়,—আমাদের বাড়ী থেকে যা' যা' দরকার, নিয়ে এসে দুটো খাওয়া দাওয়া কর্। মিছে কেঁদে আর কি হ'বে!"

"বোন্, এক আধ্ দিন নয়,—নিত্যি কে দেবে বল্? তোরাই যেন আমার আর জন্মের কে ছিলি! বোন, তোদের এ ঋণ কখন ভুল্‌ব না।"

"সে কথা যা'ক, এখন আয়।" এই বলিয়া বৃদ্ধা, রমণীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাদের বাটীতে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——জেলার অন্তর্গত মধুপুর গ্রাম। এখানকার রায়েরা বনিয়াদী। এক সময়ে ইহাদের প্রবল প্রতাপে নিকটস্থ গ্রামবাসী সকলেই সশঙ্কিত ছিল। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে সমস্ত স্থান যেন আনন্দে নৃত্য করিত। অনাশ্রিতের আশ্রয় দান, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, শরণাগতকে রক্ষা, অতিথি ও বিপ্রসেবা প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণকর কার্য্যে রায়েরা চির প্রসিদ্ধ। যখন মানুষের ভাগ্যে কমলার শুভদৃষ্টি পতিত হয়, তখন সকল দিক হইতেই তাহার শুভ ফল ফলিয়া থাকে। ইঁহাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। পৈতৃক বিষয়ের বাৎসরিক আয় দশ বার হাজার টাকা,—তদুপরি জগদীশ ও হরিহর—এই দুই ভায়ের স্ব-উপার্জ্জিত আয়ও পাঁচ ছয় হাজার টাকা হইবে; সুতরাং এ বিপুল অর্থের প্রভাবে পল্লীগ্রামে ইঁহারা বেশ গণ্য মান্য ও আদব কায়দার সহিত সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কবির মর্ম্মস্পর্শী উক্তি,—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" ইহা অতি সত্য কথা! সৌভাগ্য-লক্ষ্মী কাহারও চিরস্থায়ী নয়। ঘটনা চক্রের অনিবার্য্য গতি ও গ্রহ-বৈগুণ্য কে রোধ করিবে? অনন্ত কাল-স্রোত অমোঘ প্রতাপে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। ভীষণ দারিদ্র্য-রাক্ষস নিমেষ মধ্যে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। জ্যোৎস্নাময়ী সুখ-রজনী যেন সহসা ভীষণ অমানিশায় পরিণত হইল। সুবিমল পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রাসে পতিত হইয়া ফুল্লময়ী ধরণীকে বিষাদ-আঁধারে আচ্ছন্ন করিল। শান্তিময় রায় পরিবার ঘোর অশান্তির করাল হস্তে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিবিধ হিতকর কার্য্য সাধনই, রায় পরিবারদিগের জীবনের ব্রত ছিল। আজ কাহার পিতৃদায়, আজ কাহার মাতৃদায়, আজ কাহার কন্যাদায়, আজ কাহার ভদ্রাসন লইয়া মহাজন টানাটানি করিতেছে; আজ কাহার পুত্রের অর্থাভাবে লেখাপড়া হইতেছে না, আজ কাহার ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়াছে—স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ অনাহারে মৃতপ্রায়, এইরূপ বহু সংখ্যক অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করাই ইঁহারা জীবনের সার বুঝিতেন। তদুপরি বার মাসে ষষ্ঠী ও মাকাল পূজা হইতে দোল দুর্গোৎসব

পর্য্যন্ত কোন পর্ব্বই ফাঁক যাইত না। আত্মীয় কুটুম্ব—মামাত, পিসতুত, মাসতুত, ত্বদীয় শ্যালক, তস্য সম্বন্ধীয় স্ত্রী পুরুষ সকলেই, আত্মীয়তা দেখাইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইঁহাদের স্কন্ধে—চোব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রকমে যৎকিঞ্চিৎ—স্বল্প পরিমাণ ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। তা' ছাড়া, সময়ে সময়ে আপনাদের প্রয়োজন মত সমস্ত খরচও ইঁহাদেরই মস্তকে হাত বুলাইয়া নির্ব্বাহ হইত। সম্মুখে দুটা খোস্‌নাম করিয়া, মনে মনে আপনাদের দুরবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক হিংসায় গর্জ্জিতে থাকিতেন, আর যাহাতে তাঁহারা ত্বরায় উচ্ছন্ন যা'ন,—অন্ততঃ পরস্পরে সমান অবস্থাপন্ন হ'ন, সে জন্যও ইষ্ট দেবতার নিকট মানস করিতে ক্রটী করিতেন না। বস্তুতঃ, অনুদার সঙ্কীর্ণ হৃদয়ই ঈদৃশ অকৃতজ্ঞভাব ও পরশ্রীকাতরতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই নীচতাই ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম!

অপরিণামদর্শিতা মানুষের উন্নতি পথের প্রধান অন্তরায়। সম্পদের সময় পরিণাম কেহ বড় একটা চিন্তা করে না।—অধিকন্তু, বর্ত্তমান সুখের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইঁহাদেরও ক্রমে ক্রমে সেই রোগে ধরিল। মিতব্যয়িতার মহত্ব যে কি, তাহা ইঁহারা বুঝিলেন না। প্রথম প্রথম কতকটা নিষ্কামভাবে দান করিয়া শেষে আপনাদের পরিমাণ বুঝিতে না পারিয়া, মনে কিছু অহং ভাবের সঞ্চার হইল। বার্ষিক যা' আয় আছে, পাছে মান সম্ভ্রমের লাঘব হয়, এজন্য তদতিরিক্ত খরচও চলিতে লাগিল। ঊর্দ্ধ লক্ষ্য ক্রমে নিম্নে পরিণত হইল। জীবনের কর্ত্তব্য-ব্রত সমূহ ক্রমে অলীক যশোলিপ্সার মধুমা-যবনিকায় আচ্ছন্ন করিল; সুতরাং অধঃপতনের সূত্রপাতও দেখা দিল।

বিশ্বচক্রীর বিমোহন চক্রের এমনই মহিমা যে, মানুষের অদৃষ্ট-পটে যখন কুগ্রহের করাল-ছায়া অঙ্কিত হয়, তখন তাহার সমগ্র দল বলও কেমন এক কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে সমবেত হয়। একে ত আয়ের অধিক ব্যয়, তাহার উপর এই সময়ে কতকগুলি কুলোকের ষড়যন্ত্রে, জগদীশ ও হরিহর উভয়েরই চাকরি বন্দ হয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা বরং অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখাই অধিকতর হাসিয়া থাকে!

"আহা, বাবা কি মজাই ক'রে গেছেন, নাম 'সই' করলেই টাকা!" এই উপায়ই ইঁহাদের কালস্বরূপ হইল। আধুনিক অনেক কাপ্তেন বাবুকেও এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইতে দেখা যায়; এবং তাহার পরিণামের বিসদৃশ ফলও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আরও, কিছু সম্পত্তি বা বিষয় আশয় থাকিলে, প্রায়ই অনেক বাস্ত ঘুঘু মৌখিক আত্মীয়তা দেখাইয়া, উপযাচক ভাবে টাকা কর্জ্জ দেয়। কিসে সে হাজার টাকার জিনিস শত টাকায় পাইবে, কিসে তাহার এক গুণে দশ গুণ লাভ হইবে, এই চেষ্টায় সে নিয়তই ব্যস্ত; সুতরাং এ সময়ে রায়েদের এ শ্রেণীর সুহৃদ অনেক দেখা দিলেন। কেহ কহিলেন,—"সেকি ম'শায়, আপনাদের টাকা ধার দেব, এতো আমার পরম সৌভাগ্য!" কেহ বলিলেন,—"আরে ম'শায়, আপনারা হুকুম কর্‌লেই ত টাকা আপনি এসে ঘরে উঠে, এ জন্যে আর বেশী বল্‌ছেন কি।" এইরূপ কত শত দাঁড়কাক ও শকুনি জুটিল, এবং তাঁহাদের অমিতব্যয়িতার পরিণাম—দারিদ্র্য-পেষিত—নির্ব্বাণ-জীবনের রুধির মাংস ভক্ষণাভিলাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কুলীন-কুল-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বল্লালের মহিমা বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে পরিব্যাপ্ত! এ মহাপ্রভুর অনুগ্রহে, আজ বহুলোক জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত ও ভিটেচ্যুত হইয়া, বহুকষ্টে দিন গুজ্‌রাণ করিতেছে। ইঁহারই অমোঘ প্রতাপে আজিও পূর্ব্ববঙ্গ ও রাঢ় দেশীয় অনেক বালিকা কন্যাকে অকালে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। বল্লাল, তোমায় কোটী কোটী নমস্কার!—দেশাচার, তোমাকেও ধন্যবাদ!*

জগদীশের ছয়টি কন্যা; একটি ছাড়া আর সকল গুলিই সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী আর কি! কোনটীর নাক নাই, কোনটীর বর্ণ অমাবস্যার রাত্র, কোনটীর আকর্ণ বিস্তৃত মুখ-চন্দ্রমা! একে ত এইরূপ রূপবতী কন্যারত্ন, তা'তে আবার বড় বড় উপাধিধারী—সহজ—কোমল মুখ্যি;—কেহ বা

* আমরা হিন্দু—শাস্ত্রের দাস, হিন্দু-বিবাহ-প্রণালী বিষয়ে নতশিরে অনুমোদন করি; তবে যে দেশাচার ও লোকাচারের অতিরঞ্জিত কল্পনায় 'বল্লালী' মত বিসদৃশ ভাবে পরিণত হইয়াছে, আমরা সে আচার বিনয়াদি নব গুণ বিহীন কৌলিন্য (?) মতের পোষকতা করি না।

খানাকুলের বসু সর্ব্বাধিকারী, কেহ বা কোন্নগরের মিত্রকুল-চূড়ামণি, কেহ বা আক্‌নার ঘোষবংশ ধনুর্দ্ধর;—এইরূপ একের নম্বর আখ্যায়িকা-ধারী পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ায়, ফি মেয়ের প্রতি গড়ে প্রায় চারি হাজার টাকা ব্যয় পড়িল। সে কি! দেনা হইতেছে বলিয়া কি মেয়েছেলে গুলোকে যেমন তেমন কুলীনের ঘরে দেওয়া যাইতে পারে? রাম! রাম! সমাজে তা' হইলে যে অতি খাট হইয়া থাকিতে হইবে! (?)

কনিষ্ঠ হরিহরের, এখন একটি মাত্র কন্যা বিবাহোপযোগী হইয়াছিল। সুতরাং তাহার অর্থেও ঐ হিসাবে খরচ পড়িল। বলা বাহুল্য যে, ইনিও একটি ১ লা (পয়লা) নম্বরের কুলীন জামাতা করিলেন।

চলিত কথায় বলে,—"ব'সে খেলে গাঁঙের বালিও আঁটে না।" ইহা অতি সত্য কথা। জগদীশ ও হরিহরের কাজ কর্ম্ম গিয়াছে, কিন্তু খরচের মাত্রা কিছুই কমে নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। মৌলিক কায়স্থ কন্যার সুপাত্রে বিবাহ দেওয়া বড় সহজ কথা নয়; সুতরাং ইহাদিগকে সুপাত্রস্থ করিতে ক্রমে দেনা চাপিতে লাগিল।—কলেক্টরীর খাজনা বন্দ হওয়ায়, দু' এক খানি বিষয়েও হাত পড়িল; তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই। আজ অমুক নম্বরের তালুক, আজ অমুক এলেকাভুক্ত লাট, এইরূপে একে একে সোনার বিষয়গুলি হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। কোম্পানীর লোকেরা ঢোল পিটিয়া নিলামের ইস্তাহার দেয়—প্রভুভক্ত প্রজা আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে; কিন্তু কে কা'র কথা কানে লয়! 'আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি!' যাঁহারা প্রকৃত বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের হিতবাক্য সকল এখন ইঁহাদের অন্তরে শেলবৎ বিঁধিতে লাগিল। দুষ্ট গ্রহের কুলাল চক্রে ইঁহারা যন্ত্র-পুত্তলের ন্যায় নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জগদীশের অপেক্ষা হরিহরের প্রতি সাধারণের স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তাহার কারণ, হরিহর অধিক আত্মত্যাগী—নিজের প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, পরোপকার করিয়া থাকেন, আর

জগদীশ কিছু অধিক স্বার্থপর,—অন্যের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াও আপনার সামান্য প্রয়োজনটি পর্য্যন্ত সম্পন্ন করেন। হরিহরের, অগ্রজের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। 'দাদা—দাদা' করিয়া তিনি অনেক সময়ে অধীর হইতেন। দাদা যাহা করিবেন—দাদা যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্ত হইত না; কিন্তু দাদা যে ভিতর ভিতর তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিতেছেন, তাহা তিনি ভ্রমেও মনে স্থান দেন নাই।

পাড়া প্রতিবাসীরা কিন্তু তাহা জানিত; এজন্য সময়ে সময়ে অনেকে হরিহরকে সাবধান হইতে বলিত। কিন্তু হরিহর একান্ত ভ্রাতৃ বৎসল,—তাঁহার কানে সে কথা কিছুতেই স্থান পাইত না। জগদীশ আপনার কন্যা গুলির বিবাহোপলক্ষে যে সুবিস্তৃত ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়াছেন, হরিহরও সরল মনে সেই সকল ঋণপত্রে আপন নাম দস্তখৎ করিয়াছেন। তাঁহার মন অতি উদার, এক মুহূর্ত্তের জন্যও জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস হয় নাই। তিনি ভাবিতেন,—"যদি দাদার-ই সব যায়, তবে আমার বিষয় থাকলেই বা কি—আর গেলেই বা কি!" হরিহর, তোমার মত ভাই যদি সকলের মিলিত, তাহা হইলে সংসারে আজ আর অবিরাম এরূপ ভীষণ হলাহল-স্রোত উঠিত না!

গোপীমোহন বসু, হরিহরের এক সম্পর্কীয় ধনী শ্বশুর। এই সময়ে তিনি হরিহরকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখ বাবাজী, তোমাদের বিষয় আশয় গুলি ত একে একে সমস্ত যাইতে বসিয়াছে। যেরূপ জড়াইয়া পড়িয়াছ, তাহাতে অতি শীঘ্রই তোমাদিগকে নিঃস্ব হইতে হইবে; অতএব আমার বিবেচনায়, তোমরা দুইখানি মাত্র চক আমাকে বিক্রয় কর, সেই টাকা হইতেই তোমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইবে; বড় জোর দু' তিন হাজার টাকার আয় কমিয়া যাইবে, কিন্তু অবশিষ্ট গুলি রাখিয়া যাইতে পারিলে, তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি পুরুষানুক্রমে মোটা ভাত কাপড়ের জন্য, আর কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না।" এ কথা শুনিয়া হরিহর অভিমানে একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"কি, আমি ত্রিলোচন রায়ের পৌত্র—গোবিন্দ রায়ের পুত্র, আমরা পুরুষানুক্রমে জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছি,—আজ কিনা আমি আপনার নিকট নত হ'য়ে দাস খতে 'মহামহিম'

পাঠ লিখিব ?” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বসু মহাশয় মনে মনে একটু দুঃখজনক কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“এই রে, এদের হ’য়ে এসেছে, বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা দেখ,—আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি !”

ফলে ও তাহাই হইল। দিন যায়—মাস যায়, বিশ্ববিধ্বংশী অলক্ষ্মীর করাল গ্রাস ক্রমে ক্রমে অধিকতর বিস্তৃত হইতে লাগিল। সেই বিভীষিকা-ময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি—নির্ম্মম রাহু বেশে রায় পরিবারের সুখ-শশী চিরদিনের মত পূর্ণগ্রাস করিল। সংসারের মধ্যে হাহাকারের রোল পড়িয়া গেল; এবং অতি সত্বরই মা কমলা, সেই চিরশান্তিময়ী পবিত্র পুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দুঃসময় বুঝিয়া দূরবর্ত্তী আত্মীয় কুটুম্বগণ একে একে স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। রায় পরিবারের মধ্যে যাহা কখন হয় নাই, সেই সকল অতি কুৎসিত ও কুক্রিয়ার আসক্তি বাড়িল, পরস্পরের মধ্যে মনোভঙ্গের সূত্রপাত হইল, প্রায়ই কথায় কথায় খুঁটী নাটী লইয়া কলহ চলিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত রায়েদের বৃহৎ পরিবার একান্নবর্ত্তী ছিল, কিন্তু সময়ের অনিবার্য্য গতিতে, ঠিক সময়ানুযায়ী ফল-ই ফলিয়া থাকে। এদিকে জগদীশ ও হরিহর—পরস্পরের স্নেহ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। এখন আর জগদীশের কোন বিষয়ে স্বার্থ নাই, সুতরাং হরিহরের প্রতি তাঁহার ভালবাসার হ্রাস হইয়া আসিল;—এমন কি, কোন কিছু সামান্য কারণেই জগদীশ হরিহরকে অযথা ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

জগদীশ কিছু চাপা প্রকৃতির লোক; সময় বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই বিষয়ের উপসত্ব হইতে কিছু আত্মসাৎ করিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন। হরিহরের ছেলে পিলে অনেক গুলি, সুতরাং এক্ষণে উভয়ে একান্নভুক্ত থাকেন, ইহাতে তাঁহার বড় একটা ইচ্ছা নাই; তিনিও ছুতা নাতা খুঁজিতেছিলেন। এমন সময় এক দিন বাটীর মেয়ে মহলে কি একটা গাছের তুচ্ছ ফল উপলক্ষ করিয়া কথায় কথায় বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। জগদীশও অবসর বুঝিলেন, তাই তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট বই দুঃখিত হইলেন না। হরিহরকে ডাকিয়া কহিলেন,—“দেখ, দিন দিন আর এ বড় ভাল লাগে না;

—ইহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুই-ই দোষ,—দেখ্‌তে শুন্‌তেও বড় মন্দ! অতএব আমার বিবেচনায় পৃথক পৃথক আহার কর্‌লেই ভাল হয়।” হরিহর ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে কহিলেন,—“দাদা, আমার পরিবারেরা কি খেয়ে বাঁচ্‌বে? তোমার যেন জামাতারা সময় বিশেষে সাহায্য কচ্ছেন—পরে কর্‌বেনও, আর ছেলেটীও দশ টাকা আন্‌ছে; কিন্তু দাদা, আমার ত আর কোন উপায়-ই নেই! ছেলে গুলি ত সব অপগণ্ড শিশু, জামাইটিও মানুষ হ’লেন না; সুতরাং মেয়েটিকেও পুষ্‌তে হ’চ্ছে; তারও আবার মেয়ে দুটি আছে। আর মণি,—তা’ সে তা’র নিজের ছেলে মেয়ে নিয়েই ব্যস্ত, সে আর বেশী কি কর্‌বে? তাই বল্‌ছি, দাদা, আমি কি ক’রে এত গুলি পরিবারকে প্রতিপালন কর্‌বো?” গুণধর দাদা অবলীলাক্রমে কহিলেন,—“তা’ আমি কি ক’রে জান্‌বো?—যে যা’র অদৃষ্টে খায় পরে।” জগদীশ আর অধিক কিছু না বলিয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন; হরিহর একটি বিষাদপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

* * * * *

দারুণ দুঃখে ও অপমানে হরিহর সত্বরই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে অনন্ত-শয্যায় শায়িত হইলেন। আমরা শুনিয়াছি, হরিহরের এক এক দিন অতি শোচনীয় অবস্থায় কাটিয়াছিল। সমস্ত দিন আহার নাই, হরিহরের শিশু সন্তানটী পর্য্যন্তও উপবাসী, কিন্তু জগদীশ অবলীলাক্রমে ষোড়শোপচারে সপরিবারে আহারাদি করিয়া যথারীতি আমোদ আহ্লাদ করিয়াছে। জগদীশ ও ত্বদীয় পাষণ্ড পরিবারদিগের ব্যবহার এতদূর মর্ম্মস্পর্শী যে, মৃত্যুশয্যায় যখন হরিহর ছট্‌ফট্ করিতেছে, তখন তাহারা একবার চক্ষের দেখাও দেখে নাই। পাড়া প্রতিবাসীরা সকলেই হরিহরের দুঃখে দুঃখিত,—তাহারা হরিহরের এই অন্তিম সময়ে সকলেই অবস্থানুযায়ী—কেহ আর্থিক সাহায্যে—কেহ বা শারিরীক পরিশ্রমে হরিহরের পরিবারদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিল। জগদীশ ও ত্বদীয় পাষণ্ড পরিবার মণ্ডলী প্রতিদিনই ইঁহাদের প্রতি যে সকল ভীষণ লোম-হর্ষণ আচরণ করিয়াছিল, তাহা লিখিয়া আর লেখনীকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা

করি না। আর, আমাদেরও সে অবসর নাই—পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে,—যেহেতু, কথা প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূর পিছাইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমরা আমাদের আলোচ্য-আখ্যায়িকা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

ফুলের সাজি।

অঞ্চলের বাতাস।

মলয়-সমীরে আছে কত পবিত্রতা ?
কত শীত ম'রে যায় পরশি' তাহারে ?
কত ফুলে ঢেকে দেয় বিরস ধরারে ?
আনে সে কবিতা কত—কত পুণ্য-কথা ?
কত দূর হ'তে আসে, ল'য়ে কি মমতা ?
কত দূরে যেতে পারে রেখে আপনারে ?
কত শক্তি দিতে পারে মুমূর্ষু জনারে ?
ঘুচাইতে পারে কত—পাপ, তাপ, ব্যথা ?

জননীর স্নেহ-ভরা অঞ্চল-বাতাসে,
কোন্ শিশু ফুটে নাই দেব-শিশু প্রায় ?
ঘূর্ণি ভেবে ফণি ধরি' বিহ্বল তরাসে
কে কিশোর ছুটে নাই জুড়া'তে হেথায় ?
কে যুবক—কোন্ পাপী এ পুণ্য-সৌরভে
শত নাগ-পাশ ভাঙি' দেবত্ব না লভে ?

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

শৈশব গান।

এস শৈশবের সখা কে কোথায় আছ
আজিকে খুলিয়ে প্রাণ,
সবে দাঁড়ায়ে শৈশব- সাগরের তীরে
গাইব শৈশব-গান।
এস হাতে হাত ধরি বুকে প্রেম ভরি
আঁখি ভরি' ল'য়ে আশা,
আজি যৌবন-উদ্যানে ফুটায়ে যতনে
শৈশবের প্রিয় ভাষা।
শুধু জীবন-প্রবাহে ছুটিয়ে ছুটিয়ে
নিয়ত মরণ-মুখে,
এ যে নিশি দিন ধরি' বেড়াই কাঁদিয়ে
বেদনা বহিয়ে বুকে।
হেথা আঁধার হৃদয়ে ফুটিয়ে কুসুম
নীরবে ঝরিয়ে যায়,
তারে চরণে দলিয়ে চ'লে যায় সবে
কেহ না ফিরিয়ে চায়।
হেথা আঁখি খুঁজে প্রেম না পাই দেখিতে
হৃদয় খুঁজি'য় মারা,
আর এমন করিয়ে পারিনে থাকিতে
হারায়ে শৈশব-ছায়া।
তাই ডাকি আয় সবে শৈশবের সখা
আজিকে খুলিয়ে প্রাণ,
পুন দাঁড়ায়ে শৈশব- সাগরের তীরে
গাইব শৈশব-গান।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

অরণ্যে।

(গীতি)

গোঁজার মত গজার তরু* গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি।
বায়ুর দোলে হেলে দুলে পাতায় পাতায় ঘেঁসাঘেঁসি॥
ডালের ভিড়ের বিষম মেলা,
পাক জড়ানো লতার মালা,
মনটি শাদা প্রাণটি খোলা,
বুকে বুকে মেশামেশি॥
পাতার বুকে লতার পিঠে,
সকাল বেলার রোদটি মিঠে,
তলায় তলায় ছায়ার ছিটে,
আঁধার আলোয় হাসাহাসি।
প্রকৃতির এই ভাবটি আমি
সবার চেয়ে ভালবাসি॥

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

সুন্দর।

জগতের সকলি সুন্দর প্রেমিক-নয়নে,
নাহি মন্দ কণামাত্র কিছু অনন্ত-সৃজনে!
অতি ঘৃণা করি মোরা যায় মনের বিকারে,
সে যে দেয় আনন্দ-অন্তরে আলিঙ্গন তারে!
প্রেম-চক্ষে সম ভাবে যেই দেখে সমুদয়ে—
আত্ম পর ভেদ জ্ঞান ত্যেজি বিবেক-সহায়ে,
মহান্ ত সেই মহাজন মরিত্রী-মাঝারে,
তাঁর কাছে সকলি সুন্দর অসীম-সংসারে!
ক্ষুদ্রচেতা হেরে নিজমত সকলি কুরূপ,
ধরা কিন্তু অনন্ত সুন্দর- আলয় স্বরূপ!!

---

* আরণ্য বৃক্ষ বিশেষ।

সুন্দর এ মহীতলে সকলি সুন্দর,
মহান্ মানব হ'তে কীট ক্ষুদ্রতর!!
ফল কথা—
আপনি সুন্দর হ'লে সকলি সুন্দর—
ন্যায় ধর্ম্ম অলঙ্কারে হ'য়ে বিভূষিত,
বিপরীতে সমুদয় অতি কুৎসিত,
প্রকৃতির এ নিয়ম চির সহচর!!

প্রেম।

নিতি নিতি হেরি আমি স্বভাবের দ্বারে,
অস্ফুট মুকুল এক ফুটিয়া র'য়েছে,
হেথা হোথা যেথা যাই মধুরে বেঁধেছে,
পরস্পরে বাঁধা এক আকর্ষণ-তারে।
প্রফুল্ল গোলাপ যেন সমুখে ফুটিয়ে,
বিনিময় চায় তার সৌরভ-কিরণে,
অসম্পূর্ণ হৃদি তাই অবাক্ হইয়ে,
বাঁধা প'ড়ে রহে যেন কাহার চরণে!
স্বর্গচ্যুত আত্মা যেন ফোটা হেথা হোথা,
এ ডাকিছে এরে, আর সে ডাকিছে ওরে!
বিমল কিরণ-সুধা তাহাদের স্বরে,
ক্ষরিতেছে শূন্যময় কি মোহ মমতা!
তোমরা গো দেব দেবী, দেবের সন্তান,
প্রেম-ফুল ঘরে ঘরে কর গো চয়ান!

শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

সিপাহিযুদ্ধের প্রারম্ভে
প্রধান সেনাপতির কার্য্য-শিথিলতা।

সিপাহিযুদ্ধের সময়ে মহামতি লর্ড কানিঙ্, যেরূপ ধীরতা, সমদর্শিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। গবর্ণর জেনেরলের ধীরতার সহিত যদি প্রধান সেনাপতির কার্য্য-তৎপরতা পরিস্ফুট হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, চিরস্মরণীয় সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, সহসা ভয়ঙ্কর ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রধান সেনাপতি আনসন্ প্রথমে তাদৃশ কার্য্য তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। উপস্থিত সময়ে তিনি সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিদিগের উত্তেজনা হইতে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঐ বিপ্লব যে সর্ব্বব্যাপী হইয়া ব্রিটীশ শাসনের মূলভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিবে, তাহাও তিনি অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আন্‌সন ভবিষ্যতের বিষয় না ভাবিয়া, নিদাঘকালে হিমালয়ের সুখ-স্পর্শ-সঙ্গম মলয় পবনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এ তৃপ্তি-সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। ১২ই মে সহসা অম্বালা হইতে একজন তরুণ বয়স্ক সংবাদ বাহক উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে এক খানি পত্র সমর্পণ করিল। ঐ পত্রে দিল্লীর ঘটনার বিষয় অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। প্রধান সেনাপতি পত্র পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মিরাটের সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এক ঘণ্টা পরে তাঁহার নিকটে আর এক খানি পত্র পৌঁছিল। এই দ্বিতীয় পত্রও যদিও অস্পষ্ট ভাবে লিখিত ছিল, তথাপি উহাতে বোধ হইল যে, মিরাটের সিপাহীরা উত্তেজিত হওয়ায়, যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা বিমুক্ত হইয়াছে এবং দলে দলে দিল্লীতে যাইয়া মিরাট ও দিল্লীর উভয় স্থানে ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়াছে।

যখন এই সংবাদ প্রথমে প্রধান সেনাপতির নিকটে পৌঁছিল, তখনও তিনি উহার গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তিনি যে কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়া ছিলেন, যে দায়িত্ব ভার তাঁহার উপর সমর্পিত ছিল, তিনি সে কর্ত্তব্য—সে দায়িত্বের বিষয় ভাবিয়া তখনও বিচলিত হ'ন

নাই। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, এখন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতি নিরোধ জন্য অবশ্যই তাঁহাকে কিছু করিবে হইবে। দিল্লী এখন উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে, তত্রস্থ ইউয়োপীয়গণ এখন উন্মত্ত সিপাহিদিগের উৎপীড়নে ও নিষ্পেষণে নিপীড়িত, নির্জ্জীত বা নিহত হইতেছে; সুতরাং এখন নিকটে যত ইউরোপীয় সৈন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎসমুদয় যথাস্থলে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া প্রধান সেনাপতির বোধ হইল। প্রধান সেনাপতি ইহা ভাবিয়াই ঐ দিনে (১২ই মে) মাসৌরী নামক স্থানে আপনার একজন এডিকং পাঠাইলেন। উক্ত স্থানে ৭৫ গণিত ইউরোপীয় সৈনিককে অম্বালায় পাঠাইয়া দিতে, ঐ এডিকংকে আদেশ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যস্থলে যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহাদিগকেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইল। প্রধান সেনাপতি সৈন্য পাঠাইবার এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিমলা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি লর্ড ক্যানিঙ্‌কে লিখিলেন যে, উপস্থিত বিষয়ে আনুপূর্ব্বিক জানিতে তাঁহার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যদি সংবাদ মন্দ হয়, তবে তিনি অম্বালায় যাইতে প্রস্তুত আছেন। এই পত্র পাঠাইবার অব্যবহিত পরেই তাড়িত-বার্ত্তাবহ তাঁহার নিকটে আর একটি সংবাদ উপস্থিত করিল। এই বার তিনি মিরাটের ঘটনার বিশদ বিবরণ জানিতে পারিলেন, প্রধান সেনাপতি এখনও অবিচলিতভাবে ছিলেন, অবিচলিত ভাবে এখনও হেমগিরির প্রাকৃতিক শোভা এবং তুষারসম্পাতে সমীরণের স্নিগ্ধতার সুখানুভব করিতে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে, তাহা তিনি এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। অথবা বুঝিতে পারিয়াও তদনুরূপ কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বনে সত্বর হ'ন নাই। ক্রমে অনেক ভাবিয়া তিনি উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুই দল ইউরোপীয় সৈনিককে অম্বালায় যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। সিরমুরের গুরুক্ষা সৈন্যদলও দেরা হইতে মিরাটে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। প্রধান সেনাপতি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া তিনি অন্যান্য স্থানের অস্ত্রাগার

রক্ষার্থ অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গবর্ণর জেনারলকে লিখেন যে, ফিরোজপুরের দুর্গ ৬১ গণিত পদাতিক দল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে। গোবিন্দগড় ৮১ গণিত সৈন্যদল রক্ষা করিবে। জলন্ধর হইতে ৮ গণিত দুই দল সৈন্য যাইয়া ফিলোরে দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু ফিলোরে কামান সকল সজ্জিত থাকিবে। নাসৌরীর গুরুক্ষা সৈন্যদল এবং ৯ গণিত অশ্বারোহী ঐ সকল কামানের রক্ষক হইয়া অম্বালায় যাইবে।

এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রধান সেনাপতি ১৪ই মে অম্বালায় যাত্রা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তথায় উপনীত হন। এই স্থানে তাঁহার নিকটে নানারূপ গোলযোগের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যে, পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, অথবা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সুতরাং ইহাদের নিকট হইতে তিনি কোনরূপ সাহায্য আশা করেন নাই। এই সঙ্কটকালে তাঁহাকে গুরুতর বিঘ্ন বিপত্তির প্রতিকূলতা করিতে হইয়াছিল। অভিযানের দ্রব্যাদি ও কামান সকল পাঠাইবার কোনরূপ সুবিধা ছিল না। উপস্থিত সময়ের অসুবিধা তাঁহার নিকট গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহার মধ্যেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ শত্রুর প্রতিকূলে সজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার সহযোগীদিগের নিকট হইতে তিনি সমুচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই। পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিক দলের উপরেও তিনি আশা ভরসা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শারিরীক শক্তি ক্ষীণতর ছিল। অসুস্থতায় তিনি দুর্ব্বল এবং আপনার অবলম্বিত কার্য্যের অনভিজ্ঞতায় তিনি শৃঙ্খলাশূন্য ছিলেন। পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিক দল হইতে সাহায্য প্রাপ্তির কোন আশা ছিল না। প্রধান সেনাপতি এই সময়ে অম্বালার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারিতেন, পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর লর্ড লরেন্সও তাঁহাকে ঐরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। লরেন্স ঐ সৈনিক দলকে নিরস্ত্র করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রধান সেনাপতি লর্ড লরেন্সের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য

প্রণালীর অনুমোদন করেন নাই। যেহেতু, অম্বালার সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই কার্য্য প্রণালীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রীকরণের অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এখন সকলেই এই প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্যত হন। প্রধান সেনাপতি ইঁহাদের অমতে কোন কার্য্যই করেন নাই। তিনি অম্বালার এই সৈনিকদলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না এবং রাখিয়া যাইতেও সমর্থ হইলেন না। এ দিকে উক্ত সৈনিক দলের অফিসরেরা বলিতে লাগিলেন যে, সিপাহিদিগের নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করা উচিত নয়, নিরস্ত্রীকরণে ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে। প্রধান সেনাপতি ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া অম্বালার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্রী করিলেন না। তাহাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার দিকে চাহিয়া তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় রাখিলেন; সুতরাং সিপাহীরা পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা প্রধান সেনাপতির ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখায় নাই। সেনাপতি আন্‌সন অফিসরদিগের কথায় নির্ভর করিয়া যেরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, তাহারা আবার সেইরূপ অসহিষ্ণু হইয়া কিছু দিনের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অস্ত্রই গবর্ণমেণ্টের শ্বেত কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করে।

প্রধান সেনাপতি অম্বালার সৈনিকগণের অফিসরদিগের কথাতেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর সার্ জন লরেন্স (লর্ড লরেন্স) তাঁহাকে যে কার্য্য প্রণালীর অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হন নাই।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সাধন সঙ্গীত।

(স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ভিন্ন সমস্তই অজন্ত উচ্চারিত হইবে)

মহড়া—তেওট।

মধুর্ হরিনাম্—কৈবল্য ধাম্!
এ ভব ঘোরে, সে অকুল পাথারে, বল আর কেবা তারে? মনঃ রে!
সে নাম্-তরী বৈ রবে কিসে পরিণাম? ১।

পর মহড়া—তেওট।

কালীয় গঞ্জন্, বিপদো ভঞ্জন্, ভক্ত মনোরঞ্জন, সেই রাঙা চরণ!
ও তাই বলি মন্—কর রে হৃদয়ে ধারণ্!

দশকুশি।

মুখেরো বচনে শুধু, পাবি না সে বিমল বিধু, রে!
বাক্য মনে ঐক্য ক'রে, হ'বে ডাকিতে—চা'ও যদি চাঁদ ধরিতে!

মেল্‌তা—তেওট।

সে যে প্রাণের ধন্, প্রাণ বিনে নয় পূর্ণকাম! ২।

পঞ্চম সওয়ারি।

হৃদয় কুঞ্জ মাঝে, এসো হে সেই বাঁকা সাজে—
ধড়া চূড়া যেমন্ ছিল ব্রজে!
বামে ল'য়ে রাই কিশোরী, দাঁড়াবে সেই ভঙ্গী করি,
বাঞ্ছা, ভৃঙ্গ রূপো ধরি, মজিব পদ-সরোজে।

লোফা।

দয়া কর দয়া সিন্ধু, দীনোজনে দীনবন্ধু, সুমতি সুগতি দিয়ে দান্!
(ওহে অধম তারণ) ডাকিতে না জানি হরি, মায়ার ঘোরে মিছে ঘুরি,
নিজ গুণে তারিতে হ'বে হে শ্যাম্! (ওহে পতিত পাবন)

চৌতাল।

দীনের দিন্ যতই শেষ্, ততই ক্লেশ্, কাল্‌ভয়ে বিশেষ!
কেবল্ ভরসা অন্তের্ ধন্, অভয় চরণ্, যেন মন্ বিস্মরণ্ হয় না হৃষীকেশ!

মেল্‌তা।

যেন রসনা জপে তারক ব্রহ্ম রাম!*

শ্রীমনোমোহন বসু।

---

* গড়পার অবৈতনিক নগর সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গীত।

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১।	সংসার-আশ্রম (উপন্যাস)	সম্পাদক	২৫
২।	সন্তপ্তানাং তমসি শরণং	শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম্,এ	৩৪
৩।	ফুলের সাজি (কবিতা ও গান)		৩৭
	শক্তির ধ্যান	৺ রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর।	
	বিবাদ ভঞ্জন	শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর।	
	প্রেম গীতি	শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল,	
	খদ্যোতিকার ভ্রান্ত-তারা	শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।	
৪।	দাদা ও আমি (সমালোচনা)	সম্পাদক	৪১
৫।	সাহিত্য-সংবাদ	সম্পাদক	৪৭

জনৈক মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ভূপতি মহোদয়ের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,
১৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান শাখা ৩৩ প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বীণার গ্রাহকবর্গের প্রতি নিবেদন।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত বীণা নাম্নী মাসিক পত্রিকা এখন বন্দ আছে। যাঁহারা ইহার পূর্ণমূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কর্ণধার ২য় সংখ্যাও পাঠান গেল। কর্ণধার যদি তাঁহাদের মনোনীত হয়, তবে অনায়াসে ইহার গ্রাহক হইতে পারেন; যেহেতু ইহার মূল্য অতি অল্পই। আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছি; যেরূপে হৌক, কর্ণধারের কিছু আয় দাঁড়াইলেই হইল। আমরা বীণার সকল গ্রাহককেই সাদরে সসম্মানে আহ্বান করিতেছি। শীঘ্রই মাঘের তৃতীয় সংখ্যা বাহির হইবে। ইহার মধ্যে যাঁহারা মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারাই কর্ণধারের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন। মূল্য না পাঠাইলে ৩য় সংখ্যা কাহারও নিকট প্রেরিত হইবে না। ১ম বর্ষের কর্ণধার ১৲ টাকা।

কর্ণধারের গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা গত বৎসর ইহার মূল্য দেন নাই, তাঁহাদের নাম কাটা গেল, এ বৎসরের পত্রিকাও একেবারে বন্দ করিলাম। তবে যাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গত বৎসর নিয়মিত মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন, যেন এ বৎসরও আমাদের প্রতি সেইরূপ কৃপাদৃষ্টি করেন। কেবল তাঁহাদেরই উৎসাহ ও আগ্রহে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য—কর্ণধারের ৩য় সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫ই মাঘের মধ্যে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন; এ সম্বন্ধে আর বেশী বলা বাহুল্য মাত্র। মূল্য না পাঠাইলে ৩য় সংখ্যা কাহারও নিকট প্রেরিত হইবে না। কিমধিক নিবেদন মিতি।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত, কর্ণধার কার্য্যালয়,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত শারদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মহাপ্রস্থান বা পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ (দৃশ্যকাব্য) মূল্য ॥০ আনা, সরলা(ঐতিহাসিক উপন্যাস) ৮০, নিরাশ-প্রণয় (সামাজিক উপন্যাস)১॥০স্থলে ১৲টাকা, তিনখানি একত্র লইলে দুই টাকাতেই পাওয়া যায়। জ্যোতিপ্রকাশ। নূতন প্রবন্ধ পুস্তক ।০ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রেম-প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা ১৲ প্রণয় পরিণাম ১৲ সরলা ৵০ প্রেমময়ী ৵০ দুই বন্ধু ৵০ ভণ্ড দলপতি দণ্ড (প্রহসন) ৵০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম বর্ষের একত্র বাঁধাই, মূল্য ২৲, ২য় বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক ১॥০ টাকা মাত্র। নমুনার সংখ্যা ৵০ আনা। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, ৫৮নং কলেজষ্ট্রীট।

সংসার-আশ্রম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৺ হরিহর রায়ের দুই সংসার ছিল। প্রথমা স্ত্রী একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া, অতি অল্পদিনের মধ্যে গতাসু হওয়ায়, হরিহর মধুপুরের অতি নিকটবর্ত্তী বিজয়নগর গ্রামে, দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর পুত্রটির নাম মণীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়া স্ত্রী—আনন্দময়ীর ধীরেন্দ্র, শৈলেন্দ্র, বিনোদ ও সুবোধ নামে চারিটি পুত্র, এবং বিন্দুবাসিনী, হেমাঙ্গিনী ও বিজয়া নামে তিনটি কন্যা। পুত্র ও কন্যাগুলির মধ্যে বিন্দুবাসিনীই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা। হরিহরের জীবিতাবস্থায় এই কন্যাটির মাত্র বিবাহ হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পুত্র কয়টির মধ্যে কাহারও বিবাহ হয় নাই, তবে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্র মনিন্দ্রনাথের—ঐ গ্রামেই সঞ্জীবচন্দ্র ঘোষের কন্যার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

হরিহরের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিন্দুবাসিনী বড় সুশীলা ও শান্তপ্রকৃতি; কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কয় না, বা কোন রূঢ় কথা বলিয়া কাহারও মনে কষ্ট দেয় না। কিন্তু কপালগুণে তাহার স্বামী-ভাগ্য বড় মন্দ হইয়াছিল। স্বামীর ভালবাসায় যে একেবারে বঞ্চিত ছিল, তাহা নয়, তবে শ্বশুর গৃহে বাস বিন্দুবাসিনীর অদৃষ্টে খুব কম ঘটিয়াছে। তাহার কারণ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ (বিন্দুবাসিনীর স্বামী) কিছু চঞ্চল ও অব্যবস্থিত-চিত্ত। অতি অল্পবয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দলে মিশিতে আরম্ভ করেন। একে সহুরে ছেলে, তা'তে আবার মায়ের আদুরে, হাতেও কিছু পয়সা পড়িয়াছিল, সুতরাং এ অবস্থায় পাড়ার অনেক 'নামকাটা সিপাই' তাঁ'র সহচর হইলেন। থিয়েটার, সখের যাত্রা, সখের পাঁচালি প্রভৃতি অনেক উপসর্গ জুটিতে লাগিল। ক্রমে তাহারও আনুসঙ্গিক ব্যাধি—মদ ও বেশ্যা পর্য্যন্ত

উঠিল। এমন কি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ এখন সকল দিন রাত্রে বাটী আসে না—আহারও করেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার পরকালের একজন শত্রু হইয়াছিলেন। তিনি সহরের একজন নামজাদা বাবু ও সৌখিন লোক। বিশেষ, ভাইয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া যদি তাঁর সমস্ত আমোদ ও সখ চরিতার্থ হয়,—আসরও জমাট থাকে, তবে মন্দ কি? দুই ভায়ে একত্রে থিয়েটার করিতেন, ভাল ভাল পার্ট নিতেন, আর কত রকম তোখড়্ ইয়ার্কি চলিত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরল বুদ্ধির লোক, মনে করিতেন, "তবে আর কি, দাদা ও আমি একসঙ্গে মদ খাই, থিয়েটার করি, একত্রে গার্ডেন্‌পার্টিতে যোগ দিই, আমার চেয়ে বাহাদুর আর কে?" বলা বাহুল্য, এ কুসংস্কার ও অমিতব্যয়িতা জ্ঞানেন্দ্রনাথের কালস্বরূপ হইল, এবং অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ চতুর ছেলে, সে দলে মিশিত বটে, সকল বিষয়েই আধিপত্য করিত সত্য, কিন্তু নিজে বড় একটা কিছু খরচপত্র করিতনা। বেশীর ভাগে, সুবিধামত, জ্ঞানেন্দ্রনাথের উপর বেশ একচাল চালিত। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, অধর্ম্মের পয়সা পাপকার্য্যেই নষ্ট হয়! দেবেন্দ্রনাথও কিছুদিনের মধ্যে থিয়েটারের কোন এক প্রসিদ্ধ অভিনেত্রর কুহকে পড়িয়া—তাহার হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া, একে একে বিপুল সম্পত্তি নষ্ট করিল। ইহাদের দুই ভাইয়ের পরিণাম এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, এক এক দিন আহারাভাবে উপবাস পর্য্যন্তও করিতে হইয়াছে। দুঃখের সময়ে পরস্পরের মনোভঙ্গ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং ইহাদেরও সেই রোগে ধরিল। কথায় কথায় একদিন উভয়ের মধ্যে গুরুতর বচসা ও কলহ বাঁধিল; এবং সেই কলহেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ সপরিবারে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উঠিলেন। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী কিছু বুদ্ধিমতী, তাই তিনি সময় বুঝিয়া তাঁহার পিতৃব্যের নিকট আপনার কয়েকখানি অলঙ্কার পাঠাইয়া দেন, এবং উপস্থিত দুঃসময়ে তাহার উপস্বত্ব হইতে অতি কষ্টেসৃষ্টে একরকমে দিন কাটাইতে থাকেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সপরিবার শ্বশুরালয়ে আসিলে, প্রথম প্রথম তিনি যথেষ্ট সম্মান ও আদর অভ্যর্থনা পাইলেন। বিশেষতঃ তখন হরিহর রায়ের অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার একটি মাত্র জামাতা—আবার মেয়েটী বড়

আদরের, সুতরাং তিনি জামতা ও কন্যাকে বুকে করিয়া রাখিলেন। দুঃখের সময়েও এক দিনের জন্যও তিনি তাহাদের প্রতি কোনরূপ অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ঘর জামাই হইলে তাহার সম্মান চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে থাকে না। হরিহর যদিও জামতা এবং কন্যার একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তথাপি বাটীর অন্যান্য পরিবারগণ দুঃখের অবস্থায় তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর আপ্যায়িত করিতে পারিল না। আরও, হরিহরের অবর্ত্তমানে তাঁহারা প্রায়ই সকলের নিকট লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে লাগিলেন।

মণীন্দ্রনাথের পত্নী মাতঙ্গিনী—কিছু প্রখরা বুদ্ধি ও মুখরা স্ত্রীলোক; নজরটাও নীচু, স্বার্থপরতাটা কিছু বেশী। একে তাঁর স্বামী উপার্জ্জন করেন, তা'তে সৎ-শ্বাশুড়ীর গণ্ডা গণ্ডা ছেলে পিলে, তা'র উপর আবার জামাই মেয়ে—তার মেয়ে;—এত গুলিকে তাঁর স্বামী অন্ন দিতেছেন, ইহা কি তাঁ'র সহ্য হইতে পারে?—না মাতঙ্গিনীর মত আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের তাহা সহ্য হইবার কথা? তোমরা বল কিগা! মাতঙ্গিনী নিজে, তাঁর স্বামী আর তাঁর একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে মাত্র। তা' এই ক'জনের জন্যে কি তাঁ'র স্বামীর অত টাকা খরচ হইতে পারে? কেবল পাঁচজনকে জড়িয়েই ত মাতঙ্গিনীর এত কষ্ট! না পান দু'খানা গহনা পরতে, না পান দু'খানা ভাল কাপড় পরতে, না পান হাতে দশ টাকা জমাতে! বা! তোমরা অমন মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছ কেন? বলি, তোমাদের গৃহিণীগুলি বুঝি মাতঙ্গিনী অপেক্ষা বেশী কর্ত্তব্যপরায়ণা! দেখ, আমাদের মাতঙ্গিনী অবলা, সরলা, কুলবালা, তাই আজও চুপ করে আছে,—কিছু বলেনি; কিন্তু যখন মুখ খুল্‌বে, গলা ছাড়্‌বে, কথা বেরুবে, তখন তুমি ত তুমি, তোমার মত ঢের ঢের পাঠককে একেবারে "হতভম্বা" ও' ভ্যাবাচ্যাকা' করে দিতে পারে,—মাতঙ্গিনীর এ ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে,—এ আমরা জোর ক'রে বল্‌তে পারি।

ফলেও তাহাই হইল। এক দিন যায়—দু' দিন যায়,—মাতঙ্গিনী যেন শিকারন্বেষী সর্পিণীর ন্যায় 'ফোঁস, ফোঁস' করিয়া মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। প্রতি দিন—প্রতি মুহূর্ত্তে অবসর খুঁজিতেছে, কলহের কারণ আর

ঘটিয়া উঠে না,—কিছুতেই ঝগড়া বাঁধিতেছে না। মনে মনে বড়ই তিক্ত বিরক্ত হইয়া মাতঙ্গিনী আজ 'পেট-ব্যথা' ছুলে আপন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিল।

হরিহরের বিধবা স্ত্রী—আনন্দময়ীর অন্তঃকরণ বড় সরল, তিনিও হরিহরের ন্যায় বড় দানশীলা ছিলেন; পরের দুঃখে গলিয়া যাইতেন এবং নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, প্রায়ই পাড়া-প্রতিবাসীবর্গকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেন। এমন কি, হরিহরের দুঃখের অবস্থায়ও তাঁহার সে উদারতার হ্রাস হয় নাই। ইহার জন্য সময়ে সময়ে তিনি অন্যান্য পরিবারবর্গের নিকট বিলক্ষণ তিরস্কৃত হইতেন। নিজের পুত্র কন্যা কাল কি খা'বে, তার কোন সংস্থান নাই, কিন্তু আজ বদিপাড়ার কোন গরীব ব্রাহ্মণের পরিবার আসিয়া নিজের দুরবস্থা জ্ঞাত করে, তিনি তখনই চাল, ডাল, তেল, নুন—ঘরে যা পান, তাই দিয়ে তা'কে বিদায় করেন। নিজের ছেলেদের কাপড় জামা সকল সময় জোটে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে তা থেকেও সরাইয়া গরিব দুঃখী লোকের ছেলেদের সাহায্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত দেব দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, নিত্য গঙ্গা-স্নান, উপবাস, ব্রত প্রভৃতি বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে আনন্দময়ীর যথেষ্ট আগ্রহ ও বিশ্বাস ছিল। এইরূপ অনেক গুলি সদ্গুণ প্রভাবে তিনি সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাই আজ এই দুঃখের দিনেও তিনি সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইতেছেন।

কিন্তু কমলেও কণ্টক আছে, চন্দ্রেও কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। একাধারে সর্ব্ব সৌন্দর্য্য বা নিরবচ্ছিন্ন কলুষতা জগতের কোন বস্তুতেই নাই। এরূপ হইলে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের নিগূঢ় সৃষ্টি-রহস্যের মায়া যবনিকাও এত প্রচ্ছন্নভাবে থাকিত না এবং তাহা হইলে তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যের ও অনেক হ্রাস হইত। সেই জন্যই অনন্তদেবের—অনন্ত সৃষ্টির—অনন্ত রহস্য—সুখের কোলে দুঃখ, আলোর কোলে আঁধার, ধর্ম্মের কোলে পাপ। সেই জন্যই কুসুমে কীট,—কমলে কণ্টক,—অমৃতে গরল। সেই গূঢ় কারণেই প্রণয়ে বিচ্ছেদ,—করুণায় কাঠিন্য, সারল্যে শঠতা। আর সেই অচিন্ত্য মহিমা হেতুই, ভোগে—রোগ, কুলে—চ্যুতি, বৃত্তে—পীড়নশীল রাজা, মানে—দারিদ্র্য,

বলে—রিপু, রূপে—তরণী, শাস্ত্রে—বাদী, আর গুণে—পরশ্রী-কাতর খলের ভয় বিদ্যমান। এই-ই বিধাতার সৃষ্টি-রহস্য! এই অলৌকিক লীলাই তাঁর অদ্বিতীয়ত্বের নিদর্শন! এই দুই পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব সৃজনই তাঁর মহিমা! এক বস্তু সকল সময়ে—সকল অবস্থায়—সকলকে সমান ফল দিতে পারে না। দেশ কাল পাত্র ভেদে কার্য্যের ফলাফল ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই পুণ্যই সময় বিশেষে পাপ, এবং পাপও অবস্থা ভেদে পুণ্য নামে অভিহিত হয়। এই-ই জগতের সার—এই-ই প্রকৃতির নিয়ম—এই-ই চরাচর বিশ্বের ধর্ম্ম! ভালর কোলে মন্দ, এবং মন্দের কোলে ভাল যদি না থাকিত, তা' হইলে জগৎ সৃষ্টিরও কোন প্রয়োজন হইত না। নিরবচ্ছিন্ন শীতল জল ও স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া কে কোন্ কালে সুখী হইয়াছে? কিন্তু সেই শীতল জল বায়ু যখন নিদাঘ-তপন-তাপ-পীড়িত, ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট কোন পথিকের ব্যবহারে আইসে, তখন তাহার পরিণাম কত শুভপ্রদ হয়। তাই বলিতেছিলাম, দুই পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন-গুণ-বিশিষ্ট কারণ-হীন বস্তু ভিন্ন, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয় না!

আনন্দময়ী অনেকগুলি অমূল্য-গুণে ভূষিতা হইলেও, তাঁহার দু'একটি দোষে তিনি সে গুণ গুলিকে সম্পূর্ণরূপে স্প্রস্ফুটিত হইতে দেন নাই। প্রথমতঃ, তিনি কিছু অধীরা; একটু কোন কিছুতে ত্রুটি হইলেই তিনি তাহা লইয়া একটা গুরুতর আন্দোলন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, স্বেচ্ছাচারিতা;—নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা যে কোন প্রকারেই হোক, সম্পন্ন করিবেন। তৃতীয়তঃ, ক্ষমা ঘৃণার অভাব, লৌকিকশিক্ষার অনভিজ্ঞতা—সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া কলহ করা;—তা' কে জানে বয়োজ্যেষ্ঠা গুরুজন, আর কে জানে কল্যাণ-ভাজন সন্তান সন্ততি বা আত্ম কুটম্ব। একটা অন্যায় কথা বলিয়া বা তাঁ'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা কাজ করিয়া কেহ যে পার পাইবেন, তাহার কোন উপায় ছিল না। তা' এতে আপন পর জ্ঞান নাই;—পেটের ছেলে-ই হোক, আর পাড়ার 'রামী স্বামীই' হোক। বেশী সরলতার সহিত যদি লৌকিক শিক্ষা বা সংসারিক অভিজ্ঞতার অভাব হয়, তাহাহইলে লৌকিক জগতে তাহার পরিণামও বড়ই অশুভপ্রদ হইয়া থাকে;—ইহা স্বভাব সিদ্ধ। সেই জন্যই আনন্দময়ী সময়ে সময়ে এক একটা এমনই

অবিবেচনার কায করিতেন, যাহাতে তাঁহার সকল গুণ বিলুপ্ত হইয়া তাঁহাকে অনেকেরই বিরাগভাজন হইতে হইত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মাতঙ্গিনী কলহ বাঁধাইবার কোন কারণ না পাইয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে আপন কক্ষে যাইয়া শয়ন করিয়াছে; এক্ষণে আহারাদির সময় হইয়াছে, অথচ রান্নাঘরে আসিতেছে না, তজ্জন্য আনন্দময়ী একটু রুক্ষস্বরে আপন মনে কহিলেন,—"আঃ ভাল আপদ হয়েছে,—দেখে শুনে আর বাঁচিনে, তবু যদি বাপের বাড়ী থেকে দু' পয়সা আসত রে!" কথাটি মুহূর্ত্ত মধ্যে টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় মাতঙ্গিনীর কর্ণে উঠিল; অমনি তিনি প্রমত্তা বন্যা মাতঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন; প্রাঙ্গণে আসিয়া শ্বাশুড়ীকে কহিলেন,—"কি, যত বড় মুখ তত বড় কথা, আমারই খেয়ে আমারই বদ্‌নাম।" এখন আর মাতঙ্গিনীর 'পেট-ব্যথা' নাই।

আনন্দময়ীও ছাড়িবার পাত্র নন্, তিনিও উত্তর করিলেন,—"কি লা, তোর যে বড় স্পর্দ্ধা বেড়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি; আসুক দেখি মণি ঘরে, কেমন এর বিহিত না হয়!"

"আসুক না ঘরে; সে গাড়লের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাক্‌ত, তা হ'লে কি আমার আর এই দশা হয়?—না তোমার মত গুণের শ্বাশুড়ীর সঙ্গে একত্রে ঘরকন্না কত্তে হত? আ মলো, আমারি খেয়ে—আবার আমায় শাঁপগাল! বাদুড় আর কারে বলে, যে মুখে খায়—সেই মুখে হাগে! মরণ আর কি!"

নিকটে জগদীশের দুইটি বিধবা কন্যা—সাক্ষাৎ অলক্ষ্মীর সহচরী বা মা রণচণ্ডীর সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনীদ্বয় দাঁড়াইয়া ছিল; আনন্দময়ী কোন উত্তর দিতে না দিতে তাহার মধ্যে কনিষ্ঠটি মাতঙ্গিনীর কথার পোষকতা করিয়া কহিল,—"তা সত্যি বটে, ভাল মন্দ বাপু বল্‌তে হয়! আহা, বউ ছুঁড়িটে যেন পিতিয়ে মচ্ছে;—না পারে ভাল করে দুটি খেতে—না পায় একটু জিরুতে! আহা রোগে রোগে বাছার অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে! কে বাপু ব'লে গাল খেতে যাবে!" জগদীশের এ কন্যাটির নাম ব্রজসুন্দরী।

আনন্দময়ী—"এই যে এসেছ! তাই ত বলি, দাও—ঝগড়াটা ভাল ক'রে বাঁধিয়ে দাও!"

"আ মলো, মাগীর মুখ দেখ! বলি, আমরা কার্ সর্ব্বনাশ করেছি রে, কার বুকে ভাতের হাঁড়ী উলিয়েছি রে!"

"নাও—ব'লে নাও, এই রকম বল্‌তে বল্‌তে যেন মুখ খ'সে যায়!"

জগদীশের জ্যেষ্ঠা কন্যাটি আর নিস্তব্ধভাবে থাকিতে পারিল না। তাহার বুকের ভিতর যেন 'চিড়ে কুটিতে' ছিল। সে অমনি চিবন্ চিবন্ স্বরে বলিয়া উঠিল,—

"তা' না ব'লেও থাক্‌তে পারিনে! বলি ছোটগিন্নি, তুমি কথায় কথায় যা' মুখে আসে, তাই যে আমাদের বল, ব্যাপারটা কি? তুমি মনে করেছ কি, বল দেখি? কেন আমাদের কি তিন কুলে কেউ নেই?" জগদীশের এ কন্যাটির নাম হরসুন্দরী।

আনন্দময়ী—"দু' কুল খেয়ে এখেনে এসে উঠেছ, এরও আর দেরি নেই!"

"কি মাগী, যত বড় মুখ—তত বড় কথা! হারামজাদী, বাঁদী, ছোট লোকের মেয়ে!" ক্রমে সুর বাড়িল,—গলার তেজ উঠিল,—মুখের পরদা খুলিল, দুই ভগিনী অগ্রসর হইয়া সমস্বরে আনন্দময়ীর প্রতি অজস্রধারে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন,—"ওরে মাগী, তবু যদি তোর ভাতের সংস্থান থাক্‌ত রে! ওরে, তবু যদি ম'ণের মাগ্ দু'বেলা ঝাঁটা না মেরে তোর ছেলে-গুলোকে দু'মুটো অন্ন দিত রে! ওরে, তবু যদি তোর জামাই মেয়েটার অদেষ্টে ছাই না পড়্‌ত রে! হে মধুসূদন! তুমি যদি সত্যি হও, তোমার দিন্ রাত্ চন্দর্ সূয্যি যদি সত্যি হয়, তবে এ মাগী আমাদের যেমন মনোকষ্ট দিলে, তেমনি যেন এর শতগুণ জ্বালা পায়; আত্ম বন্ধু পেটের পুত—যার মুখ চেয়ে আছে, হে নারায়ণ! যেন (ভূমে অঙ্গুলি মুচ্‌ড়াইয়া) ত্বরায় তাদের মাথা খায়?"

আনন্দময়ী—"আ মলো,—এত খেয়েও আশ্ মেটে না রে! হা নারায়ণ,—হা মধুসূদন!"

নিকটে বিন্দুবাসিনী তাহার ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল,—"মা, তুমি থামনা কেন বাপু! এক জন চুপ কর্‌লে ত আর ঝগড়া হয় না। কে কার্ শাঁপ গাল দিয়ে মন্দ কর্‌তে পারে

মা! বড় দিদী—মেজ দিদীর ত আজ আর এ নূতন নয়! ভগবান ওঁদের বল্‌তে দেছেন, বলুন!"

অ র পায় কে? অমনি সেই উগ্রামূর্ত্তি ডাকিনী যোগিনী বিন্দুবাসিনীর উপর পড়িল, তাহাকে আক্রমণ করিয়া কহিতে লাগিল,—

"আহা, এ নরুণমুখী এতক্ষণ কোথায় ছিলেন গা! কথায় কথায় ইনি আবার আমাদের হিতবাক্যি বোঝাতে আসেন্! বলি ওলো, ফি কথায় যে ভগবানকে ডাকিস, ভগবান তোরেই বা কি সুখে রেখেছেন! তবু যদি শ্বশুরকুলে মাথা গলাবার কোন উপায় থাক্‌ত রে! ত্বরায় ভাতারের মাথা খাও—আমাদের মত হও, তা'র পর এসে ঝগড়া ক'রো!"

বিন্দুবাসিনী অতি সুশীলা—অতি কোমল প্রকৃতি; সহজেই প্রাণ গলিয়া যায়। এই মর্ম্মভেদী উক্তিতে সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

"বড় দিদী—মেজ দিদী! কেন তোমরা আমাকে বিনাদোষে দুর্ব্বাক্য বল? আমি ত তোমাদের কিছু বলিনে,—আমি আমার মাকে থাম্‌তে বল্‌ছিলেম। দেখ, একে ওর রোগ ধ'রেছে, (জ্ঞানেন্দ্রনাথের মুখে একটু একটু রক্ত উঠিত) তায় হাতে পয়সা নেই, তার উপর তোমরা আবার কেন 'ঝালা পালা' দাও বল? দেখ, আমার এ দিন কিছু চিরদিন থাক্‌বে না! আঃ—বাবা গো, আমার কপালে শেষে এতও ছিল!"

বিন্দুবাসিনী আর কথা কহিতে পারিল না, মেয়েটিকে কোল হ'তে নামাইয়া সেইখানে বসিয়া বস্ত্রাবৃত হেঁট মুখে গুম্‌রিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবোধ কন্যাটিও জননীর ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া, মায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

আনন্দময়ীও রণে ভঙ্গ দিলেন। বুঝিলেন, প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের পরাজয় স্বভাব সিদ্ধ! তাই তিনিও বিন্দুবাসিনীর রোরুদ্যমানা কন্যাটিকে কোলে লইয়া দুর্ব্বলের এক মাত্র অবলম্বন—ভগবানের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। মায়ের ক্রন্দনে বিন্দুবাসিনীরও প্রাণের কপাট খুলিয়া গেল, তিনিও গলা ছাড়িয়া তাহাতে যোগ দিলেন। নিকটে কয়েকটি বালক বালিকা খেলা করিতেছিল, তাহারাও

খেলা ফেলিয়া—পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব সুন্দর নিয়ম! শিশু-প্রাণ যথার্থই দেবভাবে পূর্ণ!

দীনের বন্ধু—দরিদ্রের ধন্—দুর্ব্বলের অবলম্বন অশ্রু-বিন্দু! তোমার মহিমা কে বুঝিবে? তুমিই জগতের সার—তুমিই মানুষের ধর্ম্ম—তুমিই পাষণ্ডের উদ্ধারকারী! করুণা-নিধান ভগবান যদি তোমায় মানুষের হৃদয়-কন্দরে সৃষ্টি না করিতেন, তবে এ অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাশ্মশানে পরিণত হইত, এতদিন ইহার অস্তিত্বও থাকিত না। তুমি মহান্ হইতেও মহান্,—তুমি স্বর্গ হইতেও গরিয়ান্! তোমার আদর যে না বুঝিয়াছে, তোমার মহত্ত্ব যে না জানিয়াছে, তোমার উদারতা যে উপলব্ধি না করিয়াছে, সে মনুষ্যাবয়বে পশু! তাহার হৃদয় নাই—তাহার দূরদর্শিত্ব নাই—তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান নাই। ভীষণ সাহারা-মরুভূ সদৃশ তাহার পৈশাচিক মনোবৃত্তি। তাহাতে জগতের কোন বস্তুরই প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয় না,—সে নিয়ত আপন স্বার্থ সাধনেই তৎপর। তাহাকে জন্মাবচ্ছিন্নে বিশ্বাস করিও না। যে জীবনের মধ্যে কোন বিষয়ে—কোন কার্য্যে—কোন ঘটনায় অন্ততঃ একবারও না কাঁদিয়াছে, তাহাকে যদি মানুষ বলিব, তবে পশু কে? তাহাকে যদি সুখী বলিব, তবে চিরদুঃখী কে? তাই বলিতেছিলাম, হে সর্ব্ব-শোক-তাপ-হারী—সর্ব্ব-বিপদ ভয়-বারী—সর্ব্ব-হিতকারী অশ্রুবিন্দু! তুমিই মানুষের এক মাত্র সুহৃদ্—তুমিই মানুষের উন্নতি-পথের একমাত্র পরিচালক—তুমিই তাহার প্রধান সহায়!

বলা বহুল্য, মাতঙ্গিনীর এই সময়ে বড়ই আনন্দ হইল। গলগ্রহ শ্বাশুড়ী ননদ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর তাঁহার সুখ কি? যা'রা তাঁ'র কার্য্যক্ষেত্রে কণ্টক স্বরূপ ও অভীষ্ট সাধন পথের একমাত্র অন্তরায়, যেরূপেই হোক, তা'দের কোনরূপ দুর্গতি হইলেই হইল, এই মাতঙ্গিনীর আন্তরিক অভিপ্রায়। বিশেষতঃ, আজিকার যুদ্ধে তাঁহাকে বেশী লড়িতে হয় নাই, পরের উপর দিয়াই তাঁ'র অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে যদি কেহ মাতঙ্গিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, তাঁহার অধরে একটু হাসির চিহ্ন লাগিয়া আছে—চক্ষে সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রতিভাত পড়িয়াছে, এবং মুখখানিও বেশ প্রফুল্লভাবে ঢল ঢল করি-

তেছে। জগদীশের বিধবা কন্যা ওরফে ডাকিনীদ্বয়—হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীর প্রতি এই সময়ে তিনি একটু তীব্র-কটাক্ষ করিলেন; তাহাতে তিন জনেরই মুখে একটু ঘৃণাব্যঞ্জক চিহ্ন দেখা দিল, এবং পরস্পরের সেই চাওনিই ও ঈষৎ হাস্যে এই টুকু প্রকাশ পাইল যে, "যেম্নি কুকুর তেম্নি মুগুর" হয়েছে। অধিকন্তু, বিন্দুবাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে যে বলিয়াছিল, "দেখ, আমার এ দিন কিছু চিরদিন থাক্‌বে না"—এক্ষণে সেই কথাটির বিদ্রূপ জন্য চোকোচোকি ইঙ্গিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে,—"হ্যাঁ! ওঁর আবার সুদিন আস্‌বে—উনি আবার মানুষ হবেন!—বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি!" আমরাও ইঁহাদের এই অনুমান-সিদ্ধ উপেক্ষা ভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলি,—"আ মরি, যমেরি ভুল আর কি!"

(ক্রমশঃ)

"সন্তাপ্তানাং তমসি শরণং।"

আমার গৃহের পার্শ্বে একটি বৃক্ষ আছে। বৈশাখের শেষে তাহাতে ফুল ফুটিয়া থাকে। বৃক্ষে অসংখ্য ফুল ফুটিত। পূর্ণ-বিকশিত, অর্দ্ধ-বিকশিত, বিকাশোন্মুখ কাঞ্চন বর্ণের কত শত ফুল স্তবকে স্তবকে বৃক্ষটিকে স্বর্ণাভরণে সজ্জিত করিয়া রাখিত! ফুল ফুটিলেই ভ্রমরেরা দল বাঁধিয়া প্রাতঃকালে দেখা দিত; গুণ গুণ করিয়া ফুল গুণিত,—ঝঙ্কার তুলিয়া ফুলের সহিত সোহাগ করিত। একটু বেলা হইলে যখন ভ্রমরেরা বিশ্রাম লইত, সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িত, গ্রীষ্মাধিক্য হইত, আর আমার নির্জ্জন গৃহস্থালী একবারে নিস্তব্ধ হইত, তখন ফুলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া পাপিয়া করুণ স্বরে দিঙ্‌মণ্ডল মাতাইয়া বিলাপ করিত। বিনাইয়া বিনাইয়া—ঘুরিয়া ফিরিয়া—পঞ্চমে সপ্তমে কত প্রকারে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিত,—"চোওক্ গেলও"। মধ্যাহ্নে যখন সূর্য্যের উত্তাপ অসহ্য হইত, যখন গাছের ফুল গুলি বিমর্ষ হইত, তখন কোকিল আসিত। কোকিল প্রায় রাগ করিয়াই আসিত। রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিত,—"ঠিক-ঠিক-ঠিক"—ফুল গুলি সে রাগ বুঝিত। ফুল ত বৃক্ষের অধীন। কখন কখন বৃক্ষের কাছে বলিত, বৃক্ষ না শুনিলে অভিমানে ঝরিয়া পড়িত। কোকিলের রাগ ভাঙ্গিত, কিন্তু অভিমান

হইত। অভিমানে ধীরে—মিষ্ট বাক্যে বলিত,—"কু-উ।" বৃক্ষ, শাখা দুলাইয়া ঘাড় নাড়িত। কোকিল একটু উচ্চৈস্বরে আবার বলিত,—"কু—উ!" তখন কু—উ, কু—উ, কু—উ সমস্তই 'কু'—বৃক্ষে বহু 'কু'! কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া শেষে আর থাকিতে পারিত না,—'কু' বলিয়া উড়িয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে দোয়েল আসিয়া গাছে বসিয়া আব্‌দার করিত। সন্ধ্যাদেবী অন্ধকারের দৌরাত্ম্য হইতে বৃক্ষটিকে রক্ষা করিবার জন্য সুবর্ণের উপর শাদা কাপড় পরাইয়া দিতেন, অতি অন্ধকারেও বৃক্ষে কালি পড়িত না।

গাছটিকে সকলে ভাল বাসিত। ভ্রমর, পাপিয়া, কোকিল, আকাশ, ঊষা, সন্ধ্যা আরও কত লোক ভালবাসিত। রাস্তার লোকে অতি ব্যস্ত থাকিলেও যাইবার সময় একবার দাঁড়াইয়া চাহিত। কত পশু কত পাখী, গাছের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সকলে কেন ভালবাসিত, জানি না। আমি ভাল বাসিতাম—গাছ আমার সুখে দুঃখে—সুখী দুঃখী হইত বলিয়া। শোকে, দুঃখে, দুর্ভাবনায় যখন বড় অন্তর্দাহ হইত, তখন বৃক্ষের নিকট আসিতাম। মানুষ আমার দুঃখের কথায় কাণ দিত না, বরং দোষ দিত। বৃক্ষ স্থির হইয়া শুনিত। কখন শাখা দুলাইয়া, কখন ফুল ফেলিয়া সহানুভূতি জানাইত। আমার মনে শান্তি দিত। এজন্য আমি তাহাকে 'শান্তি' বলিয়া ডাকিতাম।

জৈষ্ঠ মাস পড়িল। চারি দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আরও দুদিন গেল, সম্মুখে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী। আজ ত্রয়োদশী। রাত্রি এক প্রহর হইল, নিদ্রা আসিল না। দুই প্রহর—আড়াই প্রহর, চিন্তাকে হৃদয় হইতে তাড়াইতে পারিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে রজনী প্রায় ফুরাইয়া আসিল। আমি ছাদের উপরে গেলাম, তখন ফিঙ্গা গান ধরিয়াছে। যাহা দেখিলাম, তাহাতে নিজের যাতনার লাঘব হইল। চক্ষে জল আসিল। দেখিলাম, সেই রাত্রি শেষে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠিতে প্রয়াস পাইতেছে। বড় বড় দুর্দ্দান্ত মেঘ আসিয়া পথ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ গিয়া চন্দ্রের উপর পড়িতেছে, কেহ বা গ্রাস করিতে যাইতেছে; কেহবা অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখিতেছে। চন্দ্রের এখন এক কলামাত্র অবশিষ্ট আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শীর্ণা কলেবরে—অতি দরিদ্রাভাবে চাঁদ কাঁদিতেছে, সঙ্গে কেহ

নাই। সেই তারাময়ী অসময়ে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। একটি নক্ষত্রও সঙ্গের সঙ্গীও হইল না। আর সম্মুখে সেই দুস্তর আকাশ-পথ। চাঁদের কান্না দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি আর সেই দুর্দ্দান্ত—নির্ম্মম—পাষাণ হৃদয় মেঘস্তরের সহিত নিরাভরণা—দীনা—শীর্ণা—একাকিনী চন্দ্রমার দুর্দ্দশা দেখিতে পারিলাম না। চক্ষু ফিরাইয়া কি ভাবিতেছিলাম। অকস্মাৎ দুই দিক হইতে চিৎকার শুনিয়া চক্ষু চাহিলাম। দেখিলাম, অতি কষ্টে দুঃখিনী পথ পাইয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী নারিকেল বৃক্ষ হইতে পেচক চীৎকার করিতেছে—গালি দিতেছে, এত বিলম্বে কেন আসিলে। অন্য দিকে নীচে দাঁড়াইয়া একটা কুকুর চাঁদ দেখিয়া অভদ্রোচিত তিরস্কার করিতেছে। আমি উহাদের স্বার্থপরতায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলাম,—মনে মনে সংসারের অসারত্ব অনুভব করিলাম। আর দেখিতে ইচ্ছা হইল না। চিন্তা-পীড়িত—শোক-জর্জ্জরিত হৃদয়ে উঠিলাম, বৃক্ষের নিকটে আসিলাম। তখন ভোর হইয়াছে। দলে দলে—ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরদল বৃক্ষ ঘেরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। নিবিড় শ্যাম ষট্‌পদাবলীর সহিত সুবর্ণ তনু পুষ্পরাজীর ক্রীড়া দেখিলাম। ঐরাবতের সহিত বিদ্যুতের খেলা মনে পড়িল। বিদ্যাপতির গোয়ালিনীর সহিত শ্যাম শ্যাম শ্যাম কানুর অপূর্ব্ব সম্মিলন মনে পড়িল। হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল, শান্তি একটু শান্তি দিয়াছে। আমি তাহার নিকটে বসিলাম। এখনও চক্ষে জল। শান্তি আমায় এক শিক্ষা দিল। আমি বসিয়া আছি, কিছুই ভাবিতেছিনা—কিছুই দেখিতেছি না, শুধু সেই নিশল সুবর্ণ-প্রস্রবণ সদৃশ পুষ্পস্তবকের উপর চক্ষু রহিয়াছে। এমন সময়ে একটা ভ্রমর অন্য একটার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গর্জ্জন করিতে করিতে আমার নিকট আসিল। সরোষে দুই জনেই একবার আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল। গুণ গুণ করিয়া কি বলিল। আমি বুঝিতে পারিলাম না—ঘাড় নাড়িলাম। ধাঁ করিয়া আমার কপালে একটা ভ্রমর আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ অতি বেগে অন্যটাকে আক্রমণ করিল। তাহার উপর বসিয়া ইচ্ছামত তাহাকে চালাইতে লাগিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাকে দেখাইতে দেখাইতে সুনীল অনন্ত আকাশ-পথে উড্ডীন হইল। বৃক্ষ ছাড়াইয়া—গৃহের ছাদ অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল;

ক্রমে আরও উপরে উঠিল। মসীবিন্দুবৎ নীল আকাশের গায়ে ভাসিতে ভাসিতে আর ভাসিল না, কোথায় লুকাইয়া গেল। আমি এ শিক্ষা বুঝিলাম। ছটা অবিদ্যা শক্তি-বলে আজ্ঞাকারী হইল, স্বচক্ষে দেখিলাম। অবিদ্যায় আজ্ঞাকারী করিয়া, অবিদ্যা-দুষ্ট ব্যক্তিকে বলে বশীভূত করিয়া, নিজের গন্তব্যস্থানে যাইতে হয়, বুঝিলাম। এ শিক্ষা পাইয়া কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক অবনত হইল। শক্তি বর্দ্ধনের প্রয়াসে সচেষ্ট হইলাম। সেই অবধি শক্তির আরাধনা করি। দুর্ব্বলের বল কালী—কাল কর্ত্তন করিতে কালী! মনে মনে ভক্তিভরে কাল-পত্নী—কাল-বিনাশ-কারিণী—কালিকা দেবীকে শত শত প্রণাম করিলাম।

শ্রী রামদয়াল মজুমদার।

ফুলের সাজি।

শক্তির ধ্যান।

জয়জয়ন্তি—একতালা।

কে রে রমনী নারী শিরোমণি, সুরা কি অসুরী নারি চিনিতে।
অপরূপ রূপ না হেরি স্বরূপ, ভুবন মোহিতে উদয় মহীতে।
পাদপদ্ম করে রবি ছবি ধরে লাজে ক্ষপাকরে পতিত নখরে
করী অরি বরে দর্প জয় করে অনুপম ক্ষীণ সুঠাম কটিতে।
নাভি-সরোবর অতি মনোহর সোপান তাহার ত্রিবলী সুন্দর
পীনোন্নত তর যুগ পয়োধর সুশোভিত তায় মুকুতাবলীতে।
জিনিয়া হরিণী সুচারু হেরিণী বারিধ বরণী সুধাংশু বদনী
জিনি' কাদম্বিনী কুণ্ডলেরি শ্রেণী শির বরাভীতি কৃপাণ পাণিতে।
কোটী চন্দ্রোদয় মুখ নিভালয় হাস্যের প্রভায় বিজলী খেলায়
খগ দর্প জয় করে নাসিকায় গৃধিনী গঞ্জিত যুগল শ্রুতিতে।
(বামা) ভীষণ সমরে হুহুঙ্কার করে সুধা পান ভরে কিবা নৃত্য করে
পাদপদ্ম ধ'রে বলে গঙ্গাধরে নাচ দেখি বামা আমার হৃদিতে।

৺গঙ্গাচরণ সরকার।

বিবাদ ভঞ্জন।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধা)

এ জগতে নহে কার্য্যে প্রশংসা অদৃষ্টে।
নহিলে কি দুষ্ট করে প্রাণপণ করি'
ক্ষুদ্র এক গিরিখণ্ড ক্ষণকাল ধরি'
"গিরিধারী" নাম পায় বালক শ্রীকৃষ্ণে ?
গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণেরে ধরি' হৃদোপরি
কুচাগ্রে কুসম-মাল্য সম জ্ঞান করি'
অনায়াসে রাখি আমি ; তবু হায় হায়
আমার বাহুর বল কেহই না গায় !

(রাধার প্রতি কৃষ্ণ)

জগতের কি যে রীতি নারিনু বুঝিতে,
দুর্ব্বলের দেখি মান বলবান্ হ'তে।
বায়ু হ'তে লঘু নাই গুরু শ্রেষ্ঠ গিরি
বায়ু হ'ল বিশ্ব-প্রাণ—বিন্ধ্য (রহে) ভূমে পড়ি !
আমি গোকুলের পতি রাধিকা বালিকা
তরু হ'তে মান পায় আশ্রিত-লতিকা !

(উভয়ের প্রতি বৃন্দার উক্তি)

এ ত দেখি বড়ই কৌতুক
দর্পণে নেহারি' নিজ মুখ,
ছায়া কায়া মাঝে এ যে হ'তেছে বিবাদ !
এ বিবাদ আমি ঘুচাইব,
দোঁহাকেই আমি বক্ষে নিব,
যুগল মূরতি পূজি' মিটাইব সাধ।
দোঁহে রাখি' হৃদাসনে
দেখাইব বিশ্ব জনে
ভক্ত কত শক্তি ধরে (পেয়ে) তোমারি প্রসাদ !

শ্রী শশীশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুর।

প্রেম-গীতি।

নং ১ ঝিঁঝিঁট—আড়াঠেকা।

বহুদিন পরে বঁধু এসেছ হেথায় !
এস এস ব'স ব'স দেখিলেও দুঃখ যায়।
কত কথা ছিল মনে, কহিব তোমার সনে,
ভুলিলাম দরশনে পাইয়ে তোমায়।
এই কথা জাগে মনে, সুধাই তোমারি স্থানে,
তোমা বিনা অন্য জনে কহিব কাহায় ;—
যে যাহারে ভাল বাসে যদি তার কাছে আসে
লোকে কেন উপহাসে বল হে আমায়॥

নং ২ বাঁরোয়া—ঠুংরি।

এ নহে প্রেমের বিধান।
সতত তোমারে হেরি অতি সন্দিহান।
তারা সবে আলোময়, সাধুলোকে সত্য কয়,
ইহাতে সন্দেহ হয় ক্ষতি নাই প্রাণ।
দিবাকরেরি ভ্রমণে, সন্দেহ করহ মনে,
ভালবাসি তোমা ধনে ইথে নাহি আন্॥*

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

---

*"Doubt thou the stars are fire,
Doubt that sun doth move,
Doubt truth to be a liar
Doubt not that I love !"

Shakespeare.

ভ্রান্ততারা বা খদ্যোতিকা।

গাছে একি মাণিক জ্বলেছে!
এত হীরা কোথায় পেয়েছে!
কিবা, আকাশের তারা বুঝি ভুলে,
দেখে কোন আশার স্বপন,
জোনাকির রূপ ধ'রে হেথা,
এসেছে করিতে বিচরণ!

শুন গো ভ্রমণ-শীলা তারা,
মরীচিকা কাছে যায় মারা।
পাওনিক বাসনার ধন
তাই বুঝি বিজনে এমন,
মন-ব্যথা তরু লতা কাণে
কহিয়া বেড়াও বনে বনে।

ধরণীর অধিবাসী ব'লে
ভেবনাক আমারে পাষাণ,
ব্যথিত-হৃদয় তরে মোর
অবারিত আছে এই প্রাণ।

তবে দূরে রেখে বন্ধনের ভয়,
চাহ যদি এস এ আলয়।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

দাদা ও আমি।*

ধীরেন্দ্রকুমার ও অনন্তকুমার দুই সহোদর; অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃ-মাতৃহীন হন। উভয়ের মধ্যে অতিশয় প্রণয়,—এমন কি ভায়ে ভায়ে ইয়ার্কি পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। উভয়েই অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া, কেবলই বিদ্যানুশীলন করিতেন। রূপে গুণে, ধনে মানে দুই ভায়েই সমান ছিলেন। কল্যাণী নাম্নী জনৈক ঘটকী, ধীরেন্দ্রকুমারের এক সম্বন্ধ আনিল। ধীরেন্দ্রকুমারের বিবাহে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার একটি দৃঢ় ধারণা ছিল যে, স্ত্রী-ই অনর্থের মূল। পাছে তাহার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, পরিণামে প্রাণতুল্য সহোদরের সহিত মনোভঙ্গ ঘটে, পাছে শান্তিময় সংসার-আশ্রমে অশান্তি-বিষ প্রবেশ করিয়া বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করে, এই আশঙ্কায় এবং কতকটা নিজের প্রবৃত্তি ও রুচির অধীন হইয়া, তিনি কিছুতেই বিবাহে সম্মত হন নাই। অবশেষে বংশ রক্ষার জন্য, তিনি কনিষ্ঠ সহোদর-অনন্ত কুমারের বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন। যথা সময়ে দুই ভায়ে পাত্রী দেখিতে গেলেন। নবীনকৃষ্ণ আপন কন্যা চারুবাহিনীকে অনন্ত-কুমারের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হন। ধীরেন্দ্র ও অনন্ত উভয়েই অতি লাজুক; স্ত্রীলোক দেখিলেই ভয় পান, তাহার সহিত কথা কহিতে গলদ্ঘর্ম্ম হয়—হাঁপ ছাড়িতে থাকেন। তাঁহারা অনুরুদ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্য কন্যাকর্ত্তার বাটীতে বাসা লইলেন।

তরঙ্গিনী, চারুবাহিনীর বাল্য-সখী; উভয়ের মধ্যে বড় ভাব। উভয়েই দেখিতে অতি সুশ্রী। উভয়েই শিক্ষিতা, চতুরা ও সুরসিকা। ঘটনাক্রমে তরঙ্গিনীর প্রতি ধীরেন্দ্রকুমারের প্রণয়-তৃষ্ণা জন্মিল। "বুক-ফাটে ত মুখ ফুটে না"—ধীরেন্দ্রকুমার বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন। অনন্তকুমার শীঘ্রই এ বিষয় জানিতে পারিলেন, ছলে কলে তাহার বিহিতও করিলেন। বলা বাহুল্য, এখন আর ইঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় সেই অসাধারণ লজ্জাশীলতা

---

*নাটিকা। কলিকাতা, বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের গলি, ১৭ নং ভবনে, "সময়" কার্য্যালয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা, দুই আনা।

কিছুই নাই, বরং তাহার সীমা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া, কয়েক ডিগ্রী পরিমাণে মাত্রা চড়িয়াছে। কত রকম নূতন আমোদ, হাস্ তামাসা, রঙ্গরস প্রভৃতির সহিত উভয়ের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

গল্পটির সারাংশ এই। এই সামান্য ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া উপেন্দ্র বাবু (টাইটেল পেজে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও আমরা বিশেষ জানি, উপেন্দ্র-বাবু ইহার রচয়িতা) উপস্থিত নাটিকাখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নাটক বা নাটিকা জিনিসটা কি, অগ্রে দেখা উচিত। কোন বিশেষ ঘটনা—বা কোন বিশেষ চিত্র অবলম্বন ভিন্ন, নাটক জন্মিতে পারে না। তা সামাজিক হ'ক, ঐতিহাসিক হ'ক, রাজ-নৈতিক হ'ক আর ধর্ম্মমূলকই হ'ক। এ কয়েকটি মূল-ভিত্তি অবলম্বনের মধ্যে, আমাদের বিবেচনায়, সামাজিক নাটক লেখাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষীভূত, আশু ফলপ্রদ ও অধিক মর্ম্মস্পর্শী! যে ঘটনা প্রতিনিয়ত চক্ষের উপর ঘটিতেছে, যাহার আসুরিক সংগ্রামে সমাজ ক্ষত বিক্ষত, ধর্ম্মরাজ্য বিপর্য্যস্ত, মানুষ "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ"—বিবেক হীন পাশবা-চারে অনুরক্ত, তাহার চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারিলে যত হিতকর ও ফলপ্রদ হয়, আর কোন কাল্পনিক চিত্রে কি তত শীঘ্র মানুষের মন আক-র্ষণ করিতে পারে?—তাহার ফল কি তত কার্য্যকারী হয়? ঘটনা-স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাত ও উপর্য্যুপরি নৈরাশ্য, সারল্যে শঠতা, প্রণয়ে বিচ্ছেদ, পাষণ্ডের আপাতমধুর-অট্টহাস, পাপীর আত্মগ্লানি, ভক্তের প্রভাব, পরোপকারীর আত্মত্যাগ, লোভীর পরিণাম, কুলটার ছলনা, দুর্জ্জনের ভ্রুকুটী, কামুকের উন্মত্ততা, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়—এ সকল চিত্রে যেমন মানুষের প্রাণে অতি সহজে তাড়িত-প্রবাহ আনয়ন করে, এমন আর কি কিছুতে হইতে পারে? দুইটি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের দুইটি চিত্র আঁকিয়া—দুয়েরই দুর্দ্দমনীয় কার্য্য-স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাত বিভিন্ন-ভাবে—উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট করিতে পারিলে, যে কত সুন্দর—কত মধুর—কত মর্ম্মস্পর্শী হইয়া থাকে, তাহা বর্ণানাতীত! ঈদৃশ মহার্ঘ নাট্য-চিত্র অঙ্কিত করাই প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির কায; আর এ শ্রেণীর নাটক ও নাটককার 'কালে ভদ্রে' দুই চারি জন জন্মিয়া থাকে। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও

ধর্ম্মমূলক নাটকের মতামত প্রকাশ করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বারান্তরে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে নাটকের সৃষ্টি। এখন কথা হইতেছে, আমা-দের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে দিনান্তে, মাসান্তে—বৎসরান্তে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না,—এমন কি বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইতেছে, যাহা অব-লম্বন করিয়া নাটক লিখিত হইবে! কঠোর দারিদ্র্য-পেষিত, হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, বিজেতা, পীড়িত, পরাধীন জাতির অশ্রু-বিন্দু, দীর্ঘশ্বাস ও 'হা-হুতাশ' ব্যতীত চিত্ত প্রফুল্লকর আনন্দোৎসবময় বিষয় কি কিছু আছে? কেবলই ত আর বিষাদময় ঘটনার এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াই নাট্য চিত্র হইতে পারে না! হাসি-কান্না দুই-ই চাই। বিশেষতঃ আমাদের এ 'মিলন' প্রাণ দেশ কেবলই মারামারি, কাঁটাকাটি, বিচ্ছেদ, নিরাশপূর্ণ বিয়োগান্ত-দৃশ্য কাব্যের পক্ষপাতী নহে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আজও আমাদের দেশের জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি-গণ, আপন বাটীতে, এ শ্রেণীর—কোন পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইলেও, "মিলন" এর অনুরোধে তাহার ক্রোড়াঙ্ক সৃষ্টি করাইয়া স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে তাহার মিলন দেখিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে এ দেশোপযোগী নাটক লিখিতে গেলে Tragedyর ভাগ কমাইয়া Comedy—একান্ত পক্ষে Tragi-Comedy করাই যুক্তি সঙ্গত। আমাদের কোন পূজ্যপাদ এবং মান্যবর সুহৃদও এক দিন কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন যে, নাটক বল, উপন্যাস বল, কাব্য বল আর সাহিত্য-ই বল, আমাদের দেশে চিন্তাপূর্ণ সরস গ্রন্থ অতি অল্পই বাহির হই-তেছে এবং ভবিষ্যতে হইবেও। তাহার প্রধান কারণ, পরাধীন জাতির সাহিত্য বিষয়ে উন্নতি লাভ করা অতীব কঠিন। বিশেষতঃ উপস্থিত কাল-মাহাত্ম্যে, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। রাজ-নৈতিক-গগণ ঘোর-ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন! এ অবস্থায় মানুষের চিন্তা-স্রোত ঠিক লক্ষ্য পথে চলিতে পারে না—চলিলেও তাহার কোন না কোন দিকস্থ গতির বক্রতা ভাব প্রাপ্ত হইবে। তা' ছাড়া, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলতা—"চারিদিকেই বিজাতীয় চিহ্ন দেদীপ্যমান!" অনুকরণ দোষে ও জল হাওয়ার গুণে সকলই যেন কেমন এক 'কিম্ভূত কিমাকার' ভাবে পর্য্যবসিত; সুতরাং এরূপ সমস্যা-স্থলে লিখিবার যে কিছু মাত্রও পুঁজি মিলিয়া থাকে, তাহা অতি অল্প;—দুই

কিছুই নাই, বরং তাহার সীমা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া, কয়েক ডিগ্রী পরিমাণে মাত্রা চড়িয়াছে। কত রকম নূতন আমোদ, হাস্ তামাসা, রঙ্গরস প্রভৃতির সহিত উভয়ের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

গল্পটির সারাংশ এই। এই সামান্য ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া উপেন্দ্র বাবু (টাইটেল পেজে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও আমরা বিশেষ জানি, উপেন্দ্র-বাবু ইহার রচয়িতা) উপস্থিত নাটিকাখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নাটক বা নাটিকা জিনিসটা কি, অগ্রে দেখা উচিত। কোন বিশেষ ঘটনা—বা কোন বিশেষ চিত্র অবলম্বন ভিন্ন, নাটক জন্মিতে পারে না। তা সামাজিক হ'ক, ঐতিহাসিক হ'ক, রাজ-নৈতিক হ'ক আর ধর্ম্মমূলকই হ'ক। এ কয়েকটি মূল-ভিত্তি অবলম্বনের মধ্যে, আমাদের বিবেচনায় সামাজিক নাটক লেখাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষীভূত, আশু ফলপ্রদ ও অধিক মর্ম্মস্পর্শী! যে ঘটনা প্রতিনিয়ত চক্ষের উপর ঘটিতেছে, যাহার আসুরিক সংগ্রামে সমাজ ক্ষত বিক্ষত, ধর্ম্মরাজ্য বিপর্য্যস্ত, মানুষ "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ"—বিবেক হীন পাশবা-চারে অনুরক্ত, তাহার চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারিলে যত হিতকর ও ফলপ্রদ হয়, আর কোন কাল্পনিক চিত্রে কি তত শীঘ্র মানুষের মন আক-র্ষণ করিতে পারে?—তাহার ফল কি তত কার্য্যকারী হয়? ঘটনা-স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাত ও উপর্য্যুপরি নৈরাশ্য, সারল্যে শঠতা, প্রণয়ে বিচ্ছেদ, পাষণ্ডের আপাতমধুর-অট্টহাস, পাপীর আত্মগ্লানি, ভক্তের প্রভাব, পরোপকারীর আত্মত্যাগ, লোভীর পরিণাম, কুলটার ছলনা, দুর্জ্জনের ভ্রুকুটী, কামুকের উন্মত্ততা, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয়—এ সকল চিত্রে যেমন মানুষের প্রাণে অতি সহজে তাড়িত-প্রবাহ আনয়ন করে, এমন আর কি কিছুতে হইতে পারে? দুইটি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের দুইটি চিত্র আঁকিয়া—দুয়েরই দুর্দ্দমনীয় কার্য্য-স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাত বিভিন্ন-ভাবে—উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট করিতে পারিলে, যে কত সুন্দর—কত মধুর—কত মর্ম্মস্পর্শী হইয়া থাকে, তাহা বর্ণানাতীত! ঈদৃশ মহার্ঘ নাট্য-চিত্র অঙ্কিত করাই প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির কায; আর এ শ্রেণীর নাটক ও নাটককার 'কালে ভদ্রে' দুই চারি জন জন্মিয়া থাকে। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও

ধর্ম্মমূলক নাটকের মতামত প্রকাশ করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। দ্বারান্তরে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে নাটকের সৃষ্টি। এখন কথা হইতেছে, আমা-দের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে দিনান্তে, মাসান্তে—বৎসরান্তে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না,—এমন কি বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইতেছে, যাহা অব-লম্বন করিয়া নাটক লিখিত হইবে! কঠোর দারিদ্র্য-পেষিত, হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, বিজেতা, পীড়িত, পরাধীন জাতির অশ্রু-বিন্দু, দীর্ঘশ্বাস ও 'হা-হুতাশ' ব্যতীত চিত্ত প্রফুল্লকর আনন্দোৎসবময় বিষয় কি কিছু আছে? কেবলই ত আর বিষাদময় ঘটনার এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াই নাট্য চিত্র হইতে পারে না! হাসি-কান্না দুই-ই চাই। বিশেষতঃ আমাদের এ 'মিলন' প্রাণ দেশ কেবলই মারামারি, কাঁটাকাটি, বিচ্ছেদ, নিরাশপূর্ণ বিয়োগান্ত-দৃশ্য কাব্যের পক্ষপাতী নহে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আজও আমাদের দেশের জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি-গণ, আপন বাটীতে, এ শ্রেণীর—কোন পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইলেও, "মিলন" এর অনুরোধে তাহার ক্রোড়াঙ্ক সৃষ্টি করাইয়া স্বর্গে বা বৈকুণ্ঠে তাহার মিলন দেখিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে এ দেশোপযোগী নাটক লিখিতে গেলে Tragedyর ভাগ কমাইয়া Comedy—একান্ত পক্ষে Tragi-Comedy করাই যুক্তি সঙ্গত। আমাদের কোন পূজ্যপাদ এবং মান্যবর সুহৃদও এক দিন কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন যে, নাটক বল, উপন্যাস বল, কাব্য বল আর সাহিত্য-ই বল, আমাদের দেশে চিন্তাপূর্ণ সরস গ্রন্থ অতি অল্পই বাহির হই-তেছে এবং ভবিষ্যতে হইবেও। তাহার প্রধান কারণ, পরাধীন জাতির সাহিত্য বিষয়ে উন্নতি লাভ করা অতীব কঠিন। বিশেষতঃ উপস্থিত কাল-মাহাত্ম্যে, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। রাজ-নৈতিক-গগণ ঘোর-ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন! এ অবস্থায় মানুষের চিন্তা-স্রোত ঠিক লক্ষ্য পথে চলিতে পারে না—চলিলেও তাহার কোন না কোন দিকস্থ গতির বক্রতা ভাব প্রাপ্ত হইবে। তা' ছাড়া, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলতা—"চারিদিকেই বিজাতীয় চিহ্ন দেদীপ্যমান!" অনুকরণ দোষে ও জল হাওয়ার গুণে সকলই যেন কেমন এক 'কিম্ভূত কিমাকার' ভাবে পর্য্যবসিত; সুতরাং এরূপ সমস্যা-স্থলে লিখিবার যে কিছু মাত্রও পুঁজি মিলিয়া থাকে, তাহা অতি অল্প;—দুই

চারি জন উৎকৃষ্ট বোদ্ধার অতি অল্প পুস্তকেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। তবে যে মুদ্রাযন্ত্র দিন দিন এত গ্রন্থ উদ্গীরণ করিতেছে, তাহা কেবলই চর্চ্চিত চর্ব্বণ—অসার মাত্র! কথাটি হঠাৎ শুনিতে তিক্ত বোধ হইলেও একটু তলাইয়া বুঝিলে ইহার মূলকত্ব-বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সামাজিক নাটক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। শুধু তাহা নয়—ইহার অংশ বড়ই নীরস—বড়ই বিশৃঙ্খলতা-পূর্ণ এবং দুঃখময় কাষ্ঠ-হাসির বিকৃতি মাত্র। বস্তুতঃ, সমাজের দুর্দ্দশার চিত্র দেখিয়া আমাদের হাসির পরিবর্ত্তে কান্না আইসে। প্রসিদ্ধ সাধারণী সম্পাদক অক্ষয় বাবুর "সধবার একাদশী" অবলম্বনে একটি গানের দু'টি পুক্তি আমাদের মনে সতত জাগরূক রহিয়াছে। * * * "হাসিতে এসেছ ভাই, হাস তাতে ক্ষতি নাই, হাসিতে হাসিতে কিন্তু কেঁদ একবার!" বস্তুতঃ, কবির মর্ম্মোক্তির সহিত আমরাও সহানুভূতি করিয়া থাকি। এ শ্রেণীর নাটক সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র উপাদান পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই—Farceএরই উপযুক্ত। সেই জন্যই আমাদের দেশে কাব্য বা নাটক তুলনায় প্রহসনের বড় একটা অভাব নাই। কিন্তু সংখ্যায় অনেক গুলি হইলেও চর্চ্চিত চর্ব্বণ ও অনুকরণ দোষে কয়েক খানি ছাড়া আর সকল গুলিই অপাঠ্য ও অসার। "সুরুচি" সম্পন্ন পাঠকের পক্ষে নাসিকা কুঞ্চিতের সামগ্রী হইলেও, আমাদের বিবেচনায়, "সধবার একাদশী" ও "বিবাহ-বিভ্রাট" প্রথম শ্রেণীর প্রহসন। নাটক বা নাটিকার অপকৃষ্ট অংশ লইয়াই প্রহসন রচিত হয়; কিন্তু আজ কাল যে সকল নাটক ওরফে 'ন্যাট্ট' প্রকাশিত হইয়া নাট্য-সমাজের আদ্য শ্রাদ্ধ করিতেছে, তাহার সহিত তুলনায় উপরিলিখিত প্রহসন দু'খানি অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানি এক খানি নূতন নাটিকা; শুধু নূতন নহে—সম্পূর্ণ নূতন। লেখক বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইঁহার বিরচিত "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" পাঠ করিয়া—স্থান বিশেষে মত পার্থক্য হইলেও—মোহিত হইয়াছিলাম। ফলতঃ, দুই একটি ত্রুটী সত্ত্বেও এ নাটক দু' খানি বঙ্গ সাহিত্যের শীর্ষ-স্থানীয়ের মধ্যে। যেমন চরিত্র অঙ্কন, তেমনই স্বাভাবিক উত্তর প্রত্যুত্তর। দুই

একটি চিত্র স্থানে স্থানে এতই মর্ম্মস্পর্শী যে, সে কথা স্মরণ করিলেও, আজও আমাদের হৃদয় মাতিয়া উঠে। কিন্তু বড়ই দুঃখিত হইয়া আজ আমরা "দাদা ও আমি" সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছি। কারণ এ পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত ইংরাজী গন্ধে পূর্ণ। শুধু গন্ধই বা বলি কেন—ইহার হাব ভাব, উদ্দেশ্য সমস্তই ইংরাজী ছাঁচে ঢালা—ইংরাজী কায়দায় গঠিত। দুই এক স্থল ছাড়া ইহার এমন একটি কথা নাই, যাহা আমাদের হিন্দু পরিবারের অনুমোদিত হইতে পারে। অতি রঞ্জিত চিত্র এ গ্রন্থের আর একটি প্রধান দোষ।

এ কথা বলিবার হেতু এই, এখানি নাকি গার্হস্থ নাটিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ফলাফল দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ 'কোর্টসিপ্', 'ভাশুর ভাদ্রবধূর' নির্লজ্জভাবে হাস্য তামাসা, 'স্বাধীন প্রেম,' এ সকল অহিতকর বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া আমরা ভাল বোধ করি না,—হিন্দুর চক্ষেও ইহা 'কেমন-কেমন' দেখায়! তাই বলিতেছিলাম, উপেন্দ্র বাবুর ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির এ পুস্তিকা খানি না লিখিলেই ভাল হইত। আর এক কথা,—নাটিকা খানি উপেন্দ্র বাবুর প্রবাসে অবস্থিতি কালীন লিখিত। তিনি সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বসতি করিয়াছিলেন;—তদ্দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতিও সুতরাং তাহার হাড়ে হাড়ে—মজ্জায় মজ্জায় মিশ্রিত হইয়াছিল। মৃত্তিকা, জল ও বাতাসের গুণে ত বৃক্ষের ফল ফলিবে! সুতরাং ইহা যে ইংরাজী অনুকরণে লিখিত হইবে, ইহার স্তরে স্তরে যে পাশ্চাত্য ভাব সন্নিবিষ্ট থাকিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি! সেই জন্যই আবার বলি, গ্রন্থখানি ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া এ দেশীয় কোন English Theatreএ অভিনীত হইলেই ভাল হইত। প্রকৃত-পক্ষে সাহেব বিবিদের চক্ষে ইহা বড়ই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইবে, বাঙ্গালী—বিশেষতঃ হিন্দুর নিকট ইহা সমাদৃত হইবে না। ত'ার পর লিখন প্রণালী:——অত অলঙ্কার ও শব্দ বিন্যাসের আড়ম্বর কিছু নয়; ইহা যেন সংস্কৃত "কাদম্বরী" বা "উত্তর চরিত" এর টীকা টীপ্পনি! ইহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট করে—চরিত্রের পূর্ণ বিকাশও সম্ভবে না। গান গুলিও কেমন কট মট হইয়াছে। মোটের উপর আমরা এ চিত্রটি দেখিয়া সুখী হইতে পারি নাই।

গল্পটির নাটক অংশ খুব কম, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। ইহা প্রহসনেরই উপযুক্ত চিত্র; তবে উপেন্দ্র বাবু রচনা পারিপাট্যে ও রং ফলাইবার নৈপুণ্যে ইহা 'নাটিকা' আকারে আনিয়াছেন মাত্র। ফলে, অতি অল্পস্থলেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এখানি Goldsmith এর "She stoops to conquer" নামক গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে লিখিত; "নববিভাকর সাধারণী"তেও এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে তাঁহার রচনা নৈপুণ্য ও বুদ্ধিচাতুর্য্য স্থানে স্থানে অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ৩০এর পৃষ্ঠা * "তরঙ্গিনী—মিথ্যাবাদিনী, গর্ব্বিতা, অহঙ্কারিণী তরঙ্গিনী।" এবং ৯৫এর পৃষ্ঠায় * * * "ধীরেন্দ্র কুমার, তুমি কি? * * * আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, ধীরেন্দ্রকুমার, তুমি কি? * * * ধীরেন্দ্রকুমার, আমি কখন দেবতা দেখি নি, যদি দেখে থাকি, সে তুমি!" উক্তি বড়ই স্বাভাবিক—বড়ই মর্ম্ম স্পর্শী—বড়ই মধুর! যেন "উজ্জ্বল মধুরে" মিশিয়াছে,—ইহা অতীব সুন্দর!

এক্ষণে অভিনয় সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। এই নাটিকার প্রধান চিত্র 'অনন্ত' এর অংশ উপেন্দ্র বাবু স্বয়ং অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয় বিষয়ে উৎকর্ষতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। তাঁহার কথা কিছু দ্রুত; এ ত্রুটী স্বত্বেও তাঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক অভিনেতা জাতীয় ন্যাট্য-মঞ্চে অতি বিরল। আমাদের দেশে যে দুই চারি জন মাত্র প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা আছেন, অপক্ষপাতে তুলনায় সমালোচনা করিলে, উপেন্দ্র বাবু তাঁহাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ত কিছুতেই হইবেন না, দু'এক বিষয়ে বরং তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন। আর ঘট্‌কীর অভিনয় অতি স্বাভাবিক ও আদর্শভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, উপেন্দ্র বাবু সুহৃৎভাবে আমাদের এই প্রস্তাবটি পাঠ করিবেন এবং ভরসা করি, অতি সত্বরই তিনি আর এক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সামাজিক নাটক রচনা করিয়া নাট্যামোদী বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার দিবেন।

সাহিত্য-সংবাদ।

সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য এক টাকা চারি আনা। পুস্তকের নামটি শুনিলে হঠাৎ জগৎপুজ্যা আদর্শ সতী, আর্য্যরমণী, সাধ্বী সাবিত্রীদেবীর কথা মনে পড়ে; কিন্তু এ গ্রন্থখানি সে সতী-জীবনী নহে,—এখানি বহুবাজারস্থ বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের প্রতিষ্ঠিত 'সাবিত্রী' লাইব্রেরীর "অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত নারী-রচনা।" আমরা সর্ব্বপ্রথমেই এই লাইব্রেরীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। কারণ, তাঁহারই যত্নে দরিদ্র-বঙ্গভাষায় ঈদৃশ একখানি প্রথমশ্রেণীর প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বঙ্গে যাঁহারা কৃতবিদ্য ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ, বাঙ্গালীর যাঁহারা গৌরব ও বঙ্গভাষায় যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, দু' চারিজন ছাড়া আর সকল সাহিত্যবিৎ পণ্ডিতেরই রসময়ী-লেখনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পক্ষান্তরে আবার বিষয়গুলিও বেশ সময়োপযোগী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এখানি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর গৃহে, গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় থাকা কর্ত্তব্য। যেমন ভাবের গভীরত্ব, তেমনই ভাষার পরিপুষ্টি,—যেন 'উজ্জ্বলে মধুরে' মিশিয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ তেরটি প্রবন্ধ; এ গুলি মোটামুটী চারিশ্রেণীতে বিভক্ত;—সামাজিক রাজনৈতিক, জাতীয় ও সাহিত্যিক। দুই একটি প্রবন্ধের দুই এক স্থানের মতামতের সহিত আমাদের সহানুভূতি হইল না, কিন্তু তাহাতে বড় একটা আসে যায় না। ফলতঃ, এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, আমরা সত্য সত্য বড়ই ব্যথিত হইব এবং বুঝিব, বঙ্গভাষার উন্নতি এখনও সুদূর পরাহত!

হিমালয়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি এক খানি পদ্য-গ্রন্থ। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই; গ্রন্থকার "কোন কারণবশতঃ কিছুকালের জন্য হিমালয় পর্ব্বতের কোন এক শিখরদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; হিমালয়ে অবস্থিতি সময়ে ইহার অধিকাংশ রচিত" বলিয়া পুস্তিকাখানির নাম 'হিমালয়' দিয়াছেন। এখানি বেশ সরস, কবিত্ব ব্যঞ্জক ও ভাবপূর্ণ। গ্রন্থের নামটি যেমন মধুর, বিষয়গুলিও

তেমনি সুনির্ব্বাচিত। বিনা আড়ম্বরে—শ্রবণ-শ্রুতিকর মৃদু-কোমল ও গম্ভীর ধ্বনিতে পর পর বেশ সামঞ্জস্য আছে। গ্রন্থকার একজন প্রকৃতি সেবক, চিন্তাশীল, ভাবুক ও প্রেমিক। স্থানে স্থানে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে এবং গ্রন্থের স্তরে স্তরে তাঁহার ধর্ম্মভাব বিদ্যমান। পুস্তিকা খানির ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট।

বিগত স্বপন। এখানিও উক্ত গ্রন্থকার বিরচিত,—কয়েকটি গীতি-কবিতার একত্র সমাবেশে ইহার কলেবর পূর্ণ। ফুলগুলির আঘ্রাণ বেশ মিষ্ট ও চিত্ত-স্নিগ্ধকর। দুই এক স্থলে গ্রন্থকারের মনোভাব স্বাভাবিকবর্ণে কবিত্ব-তুলিকায় অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি ভাষার অপরিস্ফুটন ও অলঙ্কার হীনতায় প্রথমশ্রেণীর গীতি-কাব্য না হইলেও, আজকালের আধুনিক উড্ডীয়মান-কবিদের 'কি-জানি-কি', 'জ্যোছনা', 'মুখানি', 'ফুল', 'গান' প্রভৃতি কয়েকটি বাঁধা গৎ বাক্যাবলী-সন্নিবিষ্ট 'কাব্যি' অপেক্ষা অনেকগুণে ভাল। বিশেষতঃ, ইহা বিদেশী ফুলের তীব্র আঘ্রাণ নহে, সমস্তই দেশীয় কোমল মধু-মালতীর সুস্নিগ্ধ সৌরভ।

মালঞ্চ। মাসিক পত্র। প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এখানি একখানি নূতন ধরণের মাসিক পত্র। নূতন রঙে—নূতন ঢঙে—নূতন সাজে সম্পাদক পাঁচ ফুলে সাজি সাজাইয়াছেন। ফুলে সুগন্ধ আছে। এ সংখ্যায় 'অঙ্কুর'—শীর্ষক প্রবন্ধটি আমাদের নিকট বড়ই মধুর বোধ হইল; আর 'তৃণ-গুচ্ছ,' নামে তৃণ-গুচ্ছ হইলেও ইহা সুবর্ণ-খণ্ড অপেক্ষাও মহার্ঘ, শতাধিক মূল্যবান। বিলাতের "Truth" নামক পত্রিকার অনুকরণে ইহা সম্পাদিত হইতেছে। এ সংখ্যায় কবি নবীনচন্দ্রের 'তিনখানি ছবি' নামক কবিতা ও প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তারক বাবুর 'অদৃষ্ট' শীর্ষক ক্রমশঃ প্রকাশ্য একটি উপন্যাস আছে। অনেক গুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি ইহার নিয়মিত লেখক আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি। পত্রিকার ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। ভরসা করি, সাধারণ পাঠক ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

মহিলা। "গাব গীত খুলি হৃদি-দ্বার, মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।" বারান্তরে সমালোচ্য।

দ্বিতীয় বৎসর, দ্বিতীয় খণ্ড। ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ১২৯৫।

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১। সংসার-আশ্রম (উপন্যাস) ... সম্পাদক ... ৪৯
২। ফুলের সাজি (কবিতা) ৬১
ভগ্ন-হৃদয় ... শ্রীযুক্ত হেমনাথ দত্ত ...
নিশীথে বংশী-ধ্বনি ... শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ...
৩। সাধন ও সাধক ... সম্পাদক ৬৫

জনৈক মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ভূপতি মহোদয়ের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান শাখা তত্ত্ব প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শেষ অনুরোধ রক্ষা। 'বীণ'র গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত বীণা নাম্নী মাসিক পত্রিকা এখন বন্দ আছে। যাঁহারা ইহার পূর্ণমূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট কর্ণধার ৩য় সংখ্যাও পাঠান গেল। এই শেষ বার; অতঃপর পাঠক, ক্ষমা করিবেন আমরা আর কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। এ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতকারীদিগের মধ্যে কেহ যেন দ্বিতীয় পত্র না লিখিয়া একেবারে মূল্য পাঠান, এই প্রার্থনা। এই শেষবার; আমরা বীণার সকল গ্রাহককেই সাদরে সসম্মানে আহ্বান করিতেছি। শীঘ্রই ফাল্গুনের চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইবে। ইহার মধ্যে যাঁহারা মূল্য পাঠাইবেন তাঁহারাই কর্ণধারের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন। মূল্য না পাঠাইলে ৪র্থ সংখ্যা নিশ্চয়ই কাহারও নিকট প্রেরিত হইবে না। ১ম বর্ষের কর্ণধার ১৲ টাকা।

কর্ণধারের গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা গত বৎসর ইহার মূল্য দেন নাই, তাঁহাদের নাম কাটা গেল, এ বৎসরের পত্রিকাও একেবারে বন্দ করিলাম। তবে যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গত বৎসর নিয়মিত মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন, যেন এ বৎসরও আমাদের প্রতি সেইরূপ কৃপাদৃষ্টি করেন। কেবল তাঁহাদেরই উৎসাহ ও আগ্রহে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি। সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য—কর্ণধারের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন; এ সম্বন্ধে আর বেশী বলা বাহুল্য মাত্র। মূল্য না পাঠাইলে ৪র্থ সংখ্যা নিশ্চয়ই কাহারও নিকট প্রেরিত হইবে না। কিমধিক নিবেদন মিতি।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত, কর্ণধার কার্য্যালয়,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত শারদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত মহাপ্রস্থান বা পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ (দৃশ্যকাব্য) মূল্য ॥০ আনা, সরলা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ৸০, নিরাশ-প্রণয় (সামাজিক উপন্যাস) ১॥০ স্থলে ১৲ টাকা, তিনখানি একত্র লইলে দুই টাকাতেই পাওয়া যায়। জ্যোতিপ্রকাশ। নূতন প্রবন্ধ পুস্তক ।০ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রেম-প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা ১৲ প্রণয় পরিণাম ১৲ সরলা ৸০ প্রেমময়ী ৸০ দুই বন্ধু ৸০ ভণ্ড দলপতি দণ্ড (প্রহসন) ৸০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান সমিতির পাক্ষিক পত্র।

১ম বর্ষের একত্র বাঁধাই, মূল্য ২৲, ২য় বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক ১॥০ টাকা মাত্র। নমুনার সংখ্যা ৸০ আনা। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, ৫৮নং কলেজষ্ট্রীট।

সংসার আশ্রম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিও না,—তাহাকে উপেক্ষা করিও না। ক্ষুদ্রের ভিত্তির উপরেই মহতের আসন, অতি ক্ষুদ্র হইতেই মহৎ বস্তুর সূত্রপাত হয়, এবং পরে সেই সূচনাই তাহার উচ্চতর উন্নতি পথের এক মাত্র কারণ হইয়া থাকে। বিন্দু বিন্দু জল কণাতেই মহাসাগরের সৃষ্টি,—অতি ক্ষুদ্রতর সরিষা প্রমাণ বীজ হইতেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রতি দিন—প্রতি দণ্ডে—প্রতি মুহূর্ত্তে কোন সর্ব্বত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া সংসারের মোহিনী প্রলোভন-জাল বিস্তার কর, কমনীয় কামিনীর বিলোল কটাক্ষ—মধুর হাব ভাব—মর্ম্মস্পর্শী প্রাণ-ভুলান-ভালবাসা স্মৃতিপথে উদয় করিয়া দাও, পার্থিব জগতের আরাধ্য বস্তু—আত্ম বন্ধু দারা পুত্র পরিবারের অকৃত্রিম মমতা, লৌকিক মান—যশ—বিদ্যা—বুদ্ধি—আত্ম—প্রাধান্যের ভূয়সী প্রশংসা কাহিনী অহোরাত্র তাহার কর্ণমূলে ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় জপ করিতে থাক,—দেখিবে, অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই সর্ব্বত্যাগী—আত্ম-চিন্তা-নিরত যোগী পুরুষেরও মন টলিয়াছে,—গৃহী হইবার জন্য তাঁহার বাসনা বলবতী হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, জগতে অতি সামান্য বস্তুই দেখা যায়, যাহা একাগ্রতা—যত্ন—অধ্যবসায় ও তীব্র উত্তেজনায় সংসাধিত হইয়া না থাকে।

মণীন্দ্রনাথের হৃদয় অতি উন্নত ছিল। কিন্তু কাল-স্রোত ঘটনা তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সেই উন্নত হৃদয়কে অতি অধোগামী করিয়াছিল। হরি-হরের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই মণীন্দ্রনাথের স্বগ্রামেই কোন জমীদারের সরকারে একটি ভাল কর্ম্মের সংস্থান হয়; এবং ইহার উপসত্ত্ব হইতেই তাঁহার সংসারে মোটা ভাত কাপড় বেশ এক রকম চলিতে থাকে। কিছু দিন এইরূপ নির্ব্বিঘ্নে—শান্তিভাবে কাটিয়া যায়, সহসা সংসার-সাগরের নভোদেশে এক খানি করাল মেঘের আবির্ভাব হইল, বাতাসের গতি ফিরিল, স্রোতের বিপর্য্যয় ঘটিল; প্রকৃতি দেবী যেন সংহার মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন! বলা বাহুল্য, মাতঙ্গিনীই এই সমস্ত ঘটনার মূল কারণ। তাঁহারই তীব্র উত্তেজনায় মণীন্দ্র-নাথ আত্মহারা হইলেন, তাঁহারই কুহকে অন্ধ হইয়া মণীন্দ্রনাথ স্বীয় পৌরু-ষত্ব নষ্ট করিলেন, এবং তাঁহারই প্ররোচনায় মণীন্দ্রনাথ জীবনের মহত্ত্ব ভুলিয়া

অপদার্থ তৃণের ন্যায় ঘোর নীরয়-স্রোতে ভাসিয়া গেলেন। রমণি! তোমার মাহাত্ম্য জগতে কে বুঝিবে? তুমি সময়ে দেবীরূপে জগতের কত মঙ্গল সাধন কর, অবস্থাভেদে মানবীরূপেই বা কিরূপ সংসার আশ্রমকে শান্তির স্নিগ্ধকর ছায়ায় চির সঞ্জীবিত করিতে যত্নবতী হও, আবার প্রবল হিংস্রকতার দুর্দ্দমনীয় মোহে আত্মহারা হইয়া ভীষণ দানবীরূপেই বা তুমি কি বিষম হলাহল আনিয়া সংসারকে বিপর্য্যস্ত করিতে থাক! অতএব হে ত্রিগুণধারিণী, সর্ব্বকর্ম্ম বিধায়িনী,—সর্ব্বশক্তি স্বরূপা রমণি,—তোমার এই তিন রূপের তিনরূপ মহিমা বর্ণন করিতে কে সক্ষম হইবে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতি ক্ষুদ্র হইতেই বৃহৎ বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে!—মণীন্দ্রনাথ উপার্জ্জনক্ষম হইলে, মাতঙ্গিনী একটু একটু করিয়া, তাঁহার মন কষিতে লাগিলেন। মণীন্দ্রনাথ কর্ম্মস্থল হইতে আসিলে দুটা সোহাগের কথা পাড়িয়া তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা করেন—অর্থাৎ তিনি "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া"—কত পরিশ্রম করিয়া তবে পয়সা আনিতেছেন;—ঈশ্বর না করুন, কিন্তু শরীরের ভদ্রাভদ্র ত আছে; মনে কর না কেন, তিনি যদি দু' মাস কর্ম্ম করিতে না পারেন—এমন কি চিকিৎসা করাইতে হয়, তাহা হইলে তখন তিনি কি করিবেন?—কা'র কাছে দাঁড়াইবেন?—কে ঔষধ ও পথ্য দিবে! আর পরিবারেরা বা কি খেয়ে বাঁচ্‌বে? তার পর একটু উপর উঠিল,—আর এও বড় অন্যায় ও অবিচারের কথা! একজন খেটে মর্‌বে, আর দশজন পায়ের উপর পা দিয়ে মজা ক'রে খাবেন! আবার তা'র উপর উপসর্গ কত! আজ বৈ দাও, আজ স্কুলের মাহিনা দাও, আজ কাপড় দাও, আজ জুতো দাও, আজ 'অমুক' দাও, কাল 'তমুক' দাও;—কেবলি দাও—দাও—দাও! আরে বাপুরে, টাকা আর কি খোলার কুচি, যে, খুঁজ্‌লেই মিলে! কেন, বড় যে সব্‌ লম্বা চৌড়া হাম্‌ বড়াই কথা, যে যার খেটে খাও না! আর এক জনের উপর এত চাপ্‌ কেন রে বাপু! তাই কি আবার ছাই খাইয়ে যশ আছে! ওর চেয়ে গরীব দুঃখীদের দু' পয়সা দিলে তা'রা নাম করে।

তা'র পর আবার একটু চাপ্‌ পড়িল,—"আমাদের ক জনই বা খেতে, আর কতই বা খরচ! তা এতে কি তোমার অত টাকা খরচ হয়ে যায়? না পাও

নিজে খেতে পর্‌তে ভাল ক'রে, আর না দাও মাগ্‌ ছেলেকে দু' খানা সোণা দানা বা এল্‌বাব পোষাক! চাক্‌রির আয় থেকে যদি অর্দ্ধেক ক'রেও জমাতে, তা' হ'লেও—এত দিনে ৪।৫ খানা কোম্পানীর কাগজ হ'ত। তা' যা' হ'বার হ'য়ে গেছে,—আমার বিবেচনায়, এখন থেকে যে যা'র এনে নিয়ে খা'ক। কেউ ত আজও খোকাটি নেই। আর, এক জনই যে চির-কালটা মাথায় মোট ক'রে এনে খাওয়াবে, তারই বা মানেটা কি! কেউ ত আর কারো গোলার মাস্‌ কলাই খেয়ে ব'সে থাকে নি!" এইরূপ আরও কত শত ঘর ভাঙ্গানি কথা পাড়িয়া মাতঙ্গিনী মণীন্দ্রনাথের মন কষিতে লাগিল। তবে মণীন্দ্রনাথ খুব হুঁসিয়ার ছেলে, তাই মাতঙ্গিনী সহজে তা'কে দানবী সুলভ বশীকরণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে সমর্থা হয় নাই।

বরং প্রত্যহ এইরূপ নীতি-বিরুদ্ধ ও ঘোর পৈশাচিক প্ররোচনায় বিরক্ত হইয়া, মণীন্দ্রনাথ মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া এক দিন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্মস্থল হইতে বাটী আসিলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া আপন কক্ষে গিয়া গম্ভীরভাবে শয়ন করিলেন। মাতঙ্গিনী অতি ব্যস্ততার সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অসময়ে কর্ম্মস্থল হইতে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মণীন্দ্রনাথ কিছু উত্তর না দিয়া কেবল একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠিতা হৃদয়ে—ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"অমন কচ্ছ কেন, তোমার কি কিছু অসুখ করেছে?—না, তোমার চাকৃরির কোন কু-সংবাদ?"

"না—আমার অসুখও করেনি—চাকৃরিরও কোন কু-সংবাদ নয়।" (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ)

"তবে কি, ভাল করে খুলেই বল না কেন ছাই! ওমা, তোমার ভাব গতিক দেখে যে আমার পেটের ভিতর হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে!"

মণীন্দ্রনাথ নিরুত্তর, ক্ষণপরে পুনর্ব্বার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"চুপ ক'রে রইলে যে!—ব্যাপারটা কি, সব ভেঙ্গে বল। আমার বুকের ভেতর যে 'ধড়াস্‌ ধড়াস্‌' ক'চ্ছে। কোন অমঙ্গল খবর নয় ত? ঠিক্‌ ক'রে বল, আমার মাথা খাও! অনেক দিন অবিনাশের (মাতঙ্গিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা,

কলিকাতায় সওদাগরি আফিসে কর্ম্ম করিত) কোন খবর পাইনে, সে ত ভাল আছে?"

এবার মণীন্দ্রনাথ একটু অধিক উৎকণ্ঠার সহিত দীর্ঘ শ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, "আর————!"

মণীন্দ্রনাথ ঢোক গিলিলেন; মাতঙ্গিনীও ততধিক ব্যাকুলান্তকরণে—সজল নয়নে—জড়িত স্বরে কহিল,—"'আর' কি? তোমার পায়ে পড়ি, শীঘ্র বল।—দেখ, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে।"

"আর—বল্‌ব কি,—সর্ব্বনাশ—হয়েছে, এই মাত্র—পত্র পেলুম যে,—"

মণীন্দ্রনাথ আবার—ঢোক গিলিলেন, আবার জড়িত স্বরে বলিলেন,—"যে গত পরশু—রাত্রি ৯ টার সময়—ভে-ভেদ বমিতে—অ—বি—না—শে—এ————"

"কি! ত'বে আমায় ছোট ভাই প্রাণের অবিনাশ আর নেই?" 'ও মা গো, কি হ'লো গো' বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন স্বরে মাতঙ্গিনী ছিন্ন কদলীবৎ যেমন ভূমে পতিত হইবেন, অমনি মণীন্দ্রনাথ 'খিল্ খিল্' শব্দে হাস্কিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"ভয় নেই—ভয় নেই, অবিনাশ ভাল আছে—তার কিছু হয় নেই। তোমায় পরীক্ষা করে দেখ্‌লেম; কেমন,—ভ্রাতৃস্নেহ কি রকম, এখন জান্‌তে পার্‌লে?—সকলেরই এই রকম বু'ঝ।"

মাতঙ্গিনী মণীন্দ্রনাথের কার্‌সাজি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। কিছু না বলিয়া খাটের এক ধারে উপবেশন পূর্ব্বক গম্ হইয়া অভিমানে গর্জ্জিতে লাগিলেন! তা'র সঙ্গে কিছু লজ্জারও আবির্ভাব হওয়ায় সুন্দর মুখ খানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। মণীন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,—"কেমন, যত বারণ করি, আমায় ও সব কথা আর ব'লনা—ওতে আমার বড় কষ্ট হয়, ততই তুমি দিন নেই—রাত নেই—সারাদিন আমার কাণের কাছে এসে 'ঘ্যানর—ঘ্যানর' কর। এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে, তোমার আপনার ভাইটির উপর যেমি মায়া,—আর একজনেরও তার ভায়ের উপর ঠিক তেমি ভালবাসা আছে। যদি তোমার একটুও ঘৃণা বা লজ্জা থাকে, তা' হলে আর কখনও আমার মা ভাইকে পৃথক ক'রে দেবার জন্যে অনুরোধ ক'র না।"

কিন্তু হ'লে কি হয়, একে কলির শেষ—তায় সর্ব্ব শক্তির আধার স্বরূপা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর তীব্র উত্তেজনা! মণীন্দ্রনাথ আর কতক্ষণ আপন কর্ত্তব্য ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে? এই সময়ে জগদীশের ডাকিনী কন্যা দুটিও মাতঙ্গিনীর সহকারিণী হইলেন। এঁরা দুটি ভগ্নীতেও যা'তে মণীন্দ্রনাথের—সংসারটি ছার খার যায়, বিধিমতে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে মাতঙ্গিনীকে ত হাত ক'রেইছে, তারপর আজ একটু ভাল মন্দ খাবার জিনিস দিয়া, আজ মণীন্দ্রনাথের ছেলে মেয়েকে কোলে পিটে লইয়া, আজ তাহাদের 'জ্বর জাড়ীর' সময় সেবা শুশ্রূষা করিয়া, আজ তাহাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহারা মণীন্দ্রনাথের মন সম্পূর্ণরূপ আকর্ষণ করিল। যে মণীন্দ্রনাথ এক সময়ে এই হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীর ছায়াও স্পর্শ করিতেন না, যাহাদের নামে জ্বলিয়া যাইতেন, উপহাস ও ঘৃণা করিয়া যাহাদিগের পরোক্ষে "জেঠা ম'শায়ের এ দুটি 'লাল ঘোঁড়া' যত দিন না মরে, তত দিন আর এ ভিটের ভদ্রস্থ নাই" প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিতেন, আজ সেই মণীন্দ্রনাথই—অনিবার্য্য ঘটনা স্রোতের ঘাঁত প্রতিঘাতে তাহাদেরই যন্ত্র পুত্তল হইয়াছেন। ধীরে—ধীরে—ধীরে—অতি ধীরে, একটির পর একটি—অতি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর কথার প্ররোচনায়, তীব্র অধ্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী কৃতকার্য্যতার ফল এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। মণীন্দ্রনাথের মতিচ্ছন্নের সূত্রপাত দেখা দিল, তাঁহার বিবেক-চক্ষু উত্তরোত্তর অন্ধ হইয়া আসিল, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা-জ্ঞান সুদূরে প্রস্থান করিল। তিনি অধঃপতনের চরম-সীমায় দাঁড়াইয়া কাল-ভূজঙ্গিনীর আপাত মনোরম দৃশ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন, দুষ্ট গ্রহের করাল ভ্রুকুটী বিচিত্র কাল চক্রের তীব্র ঘূর্ণায়মানে অদৃশ্য রহিল,—তিনি জানিতে পারিলেন না যে, অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই এ ভীষণ সর্পিনীর প্রাণঘাতী তীব্র-দংশনে—সেই তীব্র হলাহলের বিজাতীয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাঁহাকে জ্বলিয়া মরিতে হইবে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতঙ্গিনী একটু একটু করিয়া মণীন্দ্রনাথের মন হরণ করিতে লাগিলেন; সময় বিশেষে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেও পুনর্ব্বার চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। তা'র উপর আবার হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরী আসিয়া যোগ দিত। সুতরাং তাহাদের অভীষ্ট খুব শীঘ্র না হোক, কিছু বিলম্বে ফলবতী

হইল। স্থির প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্য পরায়ণ, উদার হৃদয় মণীন্দ্রনাথ স্বীয় লক্ষ্য স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন, উদ্দেশ্য-পথ হারাইয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অতি ক্ষুদ্র হইতেই অতি বৃহতের উৎপত্তি, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? অদম্য একাগ্রতা—যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফল কোন্ কালে বিফল হইয়া থাকে? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বিন্দু বিন্দু জল কণাতেই মহাসাগরের সৃষ্টি, আর প্রতি দিন—প্রতি দণ্ডে—প্রতি মুহূর্ত্তে কোন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকেও সংসারের মোহিনী প্রলোভনের কথা স্মৃতি পথে উদয় করিয়া দিলে, সে যোগী পুরুষেরও মন টলে,—তাঁ'রও সংসারে পুনরাসক্তি হয়। তবে মণীন্দ্রনাথ কোন্ ছার্!—মণীন্দ্রনাথের বিশেষ দোষই বা কি! যদি বল, যে স্ত্রীর কথায় 'উঠ্ বস করে, স্ত্রীর গোলাম হয়, স্ত্রীর অনুরোধে মা ভাইকে ত্যাগ করে, তা'র আবার মনুষ্যত্ব কি?—তার আবার পৌরুষত্ব কি? স্বীকার করি এ কথা; কিন্তু ভাই পাঠক! ঈশ্বর না করুন, তুমি যদি কখন তোমার কুরঙ্গ-নয়নার ঈদৃশ গভীর প্ররোচনায় অহোরহ ব্যতিব্যস্ত হও, আহারে—বিহারে—শয়নে—স্বপনে তোমার কর্ণমূলে যদি সেই অর্দ্ধাঙ্গিনী ঈদৃশ ইষ্ট-মন্ত্র অবিরাম জপ করিতে থাকেন, তবে তোমারও কি—পূর্ণ মাত্রায় না হ'ক—অন্ততঃ কিছু পরিণামেও লক্ষ্যচ্যুতি হয় না?—ক্ষণকালের জন্য ও কি মনটা উদাস হইয়া যায় না? মণীন্দ্রনাথের এ কাপুরুষতার পোষকতা করিতেছি না, কিন্তু উপস্থিত কাল মাহাত্ম্যে অনেক মণীন্দ্রনাথকেই এই পথের পথিক হইতে দেখা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্বাশুড়ী বউ-এর যে কলহের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল, সেই কলহ-ই পরিণামে হরিহরের পরিবার ও না-বালক ছেলে গুলির সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, আনন্দময়ী যখন বিরক্তভাবে আপন মনে রন্ধন গৃহে বউ-এর সম্বন্ধে একটি মাত্র রূঢ় কথা "তবু যদি বাপের বাড়ী থেকে দু' পয়সা অস্‌ত রে" বলিয়াছিলেন,—সে সময়ে জগদীশের জ্যেষ্ঠা অপেক্ষা অধিক গুণবতী কনিষ্ঠা কন্যাটি তাহাদের ঘরের দাওয়া হইতে সেই কথাটি শুনিতে পায়। জগদীশ ও হরিহর দুইজনে পৃথক

হইলেও বাটী পার্টিসন বা স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া লন নাই। এজন্য উভয়ের পরিবারবর্গই পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিত; আর গৃহগুলিও পরস্পর খুব সংলগ্ন ছিল। ব্রজসুন্দরীর কাণে কথাটি সমস্ত প্রবেশ করিতে না করিতে, তিনি একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে মাতঙ্গিনীর কক্ষে পৌঁছিলেন, এবং 'তিলটী'কে "তালটী"তে পরিণত করিয়া মাতঙ্গিনীর মনের ভিতর একটা তুমুল আন্দোলন আনিয়া দিলেন। কথাটি এইরূপঃ—আনন্দময়ী যেন কাহার সহিত বলিতেছিলেন, "আঃ; এমন ত আপদ দেখিনে গা! নিত্যই কি এ রকম আড়া আড়ি সওয়া যায়? ভাল ছোট লোকের মেয়েকে ঘরে এনেছে যা হ'ক। কাছে বাপের বাড়ী হয়েছে, তেল নুনটী থেকে সমস্ত জিনিস সরিয়ে সরিয়ে পাঠাবেন; আবার সেখানকার বড়াই বা কত! এত লোক মরে, আর এ বেটিকে পোড়া যম কি দেখ্‌তে পায় না রে? হে নারায়ণ—হে মধুসূদন, ত্বরায় এ হতভাগিনীকে নিপাত কর; আমি পাঁচ সিকে পয়সা 'মুদো বেঁধে' রাখ্‌ছি, ষোড়শোপচারে তোমার পূজো দেবো—" ইত্যাদি। মাতঙ্গিনী একে সহজেই কলহের অবসর খুঁজিতেছিলেন, তাহাতে একেবারে এরূপ সুযোগ মিলিল দেখিয়া, তিনি মনের সাধে বুক ফুলাইয়া পূরা এক দম বলিয়া লইলেন। হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীর প্রসাদে তাঁহাকে অধিক লড়িতে না হইলেও তিনি দু' চার্‌টি কথার ভিতর তাঁহার অন্তরের আসল দরকারি কথা গুলি প্রকাশ করিয়া মনের ভার লাঘব করিলেন।

কলহের অব্যবহিত পরেই মণীন্দ্রনাথ কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে আসিলেন। আসিবার কালীন বহির্বাটীতেই ব্রজসুন্দরী তাঁহাকে উপস্থিত ঝগড়ার বিষয় বেশ অলঙ্কার ও রূপক দিয়া সাজাইয়া বলিলেন। পাছে মণীন্দ্রনাথ বাটীর ভিতর গিয়া সমুদয় সত্যাসত্য নির্ণয় করেন, পাছে তিনি ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আনন্দময়ীর নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, পাছে মাতঙ্গিনীর প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাবের উদয় হইয়া উপস্থিত গৃহ-বিবাদ মিটিয়া যায়,—আবার পুনর্মিলন ঘটে,—চিরবিচ্ছেদ স্থগিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই বহির্বাটীতে কোন কার্য্যের অছিলায় মণীন্দ্রনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতঃপর মণীন্দ্রনাথের সাক্ষাতে তিনি যে কতদূর সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা

পাঠক, ইঁহার প্রথম পরিচয়েই—অর্থাৎ মাতঙ্গিনীর নিকট তাঁহার শ্বাশুড়ীর কথা জল জীবন্ত ভাবে হলপ করিয়া ঝগড়া বাঁধাইবার সময়েই বুঝিতে পারিয়াছেন আমাদের তাহা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মণীন্দ্রনাথের এখন গ্রহ বৈগুণ্য ধরিয়াছে; তিনি সহজেই ব্রজসুন্দরীর কথা বিশ্বাস করিলেন এবং গম্ভীরভাবে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক করলগ্ন-কপোলে কি ভাবিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী অবসর বুঝিয়া ঈষৎ ক্রন্দন মিশ্রিত নাকি সুরে অভিমান ভরে কহিলেন,—"দেখ, দিন দিন আমি আর এ রকম সহ্য কর্‌তে পারি না। তোমায় বল্লেও ত তুমি কোন বিহিত কর্‌বে না!—তবে আর কেন আমাকে এখানে রেখে পাঁচ জনের জুতো ঝাঁটা খাওয়াও! আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, মা যখন পেটে ধরেছেন, তখন তিনি আমার জন্যে যে রকমে হোক্—ভাতের হাঁড়ীতেও দু' মুটো চাল দিতে পার্‌বেন! তা'দের যদি দু' মুঠো জুটে, তবে আমারও জুট্‌বে। তুমি এখানে তোমার্ ছেলে পিলে—মা ভাই বোন্‌দের নিয়ে সুখে 'ঘরকন্না' কর, আমায় কেন বল নিত্যি যার্ তার্ কাছে জুতো পয়জার খাওয়াও! আমি কিছু বল্‌তে চাইনে, সত্যি মিথ্যে যদি জান্‌তে চাও, তা' হ'লে বড ঠাকুজ্জি—মেজ্ ঠাকুজ্জি—দত্তদের বাড়ীর মেজ বউ 'টেজ বউ' সকলকে জিজ্ঞাসা কর। আমি নিজের অসুখেই নিজে মরি,—আজ সকাল থেকে পোড়া পেটের ব্যথার জ্বালায় ছট্ ফট্ ক'রে এই কতক্ষণ একটু এসে বিছানায় শুয়ে ছিলেম,—এই আমার অপরাধ!" মাতঙ্গিনীর নাকি সুর একটু চড়িল,—"এঁ্যা! এই অপরাধে আমায় যে সে কেন পাঁচ কথা বল্‌বে? কেন, আমি কি কারো খাই—না পরি?—না—আমার জন্যে কারো দশ টাকা খরচ হয়?" মাতঙ্গিনী একটু অভিমান সূচক—নারী সুলভ—'নাকী' কান্নার সুরে এই কথা গুলি এমন ভাবে সাজাইয়া বলিল, যে, মণীন্দ্রনাথের মস্তক একেবারে ঘুরিয়া যাইল। মনে যে একটু মাত্রও 'ইতস্তত' ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহাও লোপ পাইল। তিনি কহিলেন,——

"আমি সব শুনেছি, আজই এর বিহিত কর্‌ব।" তা'র পর অপেক্ষাকৃত একটু গম্ভীরভাবে, স্থির ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, 'ও ঘরে ধীরেন্ শৈলেন্ আছিস্ রে?"

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে উত্তর হইল,—"হাঁ, আমরা আছি।"

"আজ্‌কের ঘটনা সব শুনেছ ত? মাতাঠাকুরাণীর কিছু বেশী বাড়াবাড়ী হয়েছে। প্রত্যহ আর এ রকম কেলেঙ্কারী বরদাস্ত হয় না। তা' দেখ, তোমরা এখন আর কিছু ছেলে মানুষটি নেই। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমি প্রাণপণে খেটে খুটে তোমাদের খাইয়ে পরিয়ে আস্‌ছি, এক দিনের জন্যেও তোমাদের কোন কথা বলিনে। এখন আর স্পষ্ট বল্‌তে কি, আমা দ্বারা আর কিছু হ'বে না। যে যা'র উপার্জ্জন ক'রে এনে খাও; তা' হ'লে সকল দিকেই মঙ্গল হয়; দিন রাত্ আর এ রকম 'কিচিমিচি' ভাল লাগে না!"

শৈলেন্দ্রনাথ উত্তর করিল,—"কা'র দ্বারা এ রকম চব্বিশ ঘণ্টা বকা-বকি হয়,—আসল ঝগ্‌ড়ার মূল কে, সেটা জেনে বলা ভাল ছিল।"

"জানা জানি আর কি? এত দিন পরে আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। সে কথা যা'ক্—আমার অদৃষ্টে যা' ভোগ ছিল, ত'া হয়েছে; এখন যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি, আর না!"

"দাদা, তুমি ভুল বুঝছ! যা'দের কথায় বিশ্বাস ক'রে এখন আমাদের উপর রাগ কচ্ছ, তারাই তোমার পরিণামের শত্রু,—তাদের পরামর্শে তোমার মন্দ বই ভাল হ'বেনা।"

"আমি কারো পরামর্শ নিয়ে কাজ করি না,—আমার ভাল মন্দ আমি নিজেই বেশ বুঝ্‌তে পারি। তোমাদের উপর রাগ ক'রে যে আমি এত গুলি কথা বল্‌লেম, তা' মনে ক'র না। এখন সে কথা যা'ক,—মা ঠাক্‌রণকে বল, আজ থেকে পৃথক পৃথক আহারাদি হোক।"

"তবে কি দাদা আমাদের পৃথক ক'রে দিলে?" ধীরেন্দ্রনাথ এ উত্তর করিল। মণীন্দ্রনাথ ক্ষণকাল নীরব; ধীরেন্দ্র আবার কহিল,—

"দাদা! তবে আমাদের অকূল সাগরে ভাসা'লে?"

"আমার কি ক্ষমতা বল ভাই! দেখ, আমারও অনেক গুলি 'কাচ্ছা বাচ্ছা' হয়েছে, এদেরও ত মানুষ কত্তে হ'বে। ঈশ্বর করুন, চাকরি বাকরি ক'রে সুখে সংসার-ধর্ম্ম পালন কর। আর আমার যদি ক্ষমতা হয়, তবে না হয় সময় বিশেষে কিছু কিছু সাহায্য কর্‌ব। পৃথক হ'লেই যে পর-

স্পরের ভালবাসা একেবারে লোপ পায়, এর কোন অর্থ নাই। একত্র থেকে প্রত্যহ বিবাদ বিসম্বাদ অপেক্ষা 'ঠাঁই ঠাঁই' হওয়াই ভাল।"

"যাক মেজ্‌দাদা, কিছু ভেবনা। "এসা দিন্ কা নাহি রহে গা", খোদা রক্ষা কর্‌বেন, ঈশ্বরের মনে যা' আছে—তাই হ'বে। তা'র জন্যে আর ভেবে কি কর্‌বে বল?" শৈলেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে—ভগ্ন-স্বরে এই কথা গুলি বলিল, অথচ ওষ্ঠ প্রান্তে ঈষৎ কাষ্ঠ-হাসি দেখা দিল। শৈলেন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি; সুখে—দুঃখে, তাহার মুখে সদাই হাসি লাগিয়া রহিত।

মণীন্দ্রনাথ কহিলেন,—"হাঁ, সেই কথাই ঠিক শৈলেন! দুনিয়ায় কে কার্ দিয়ে উপকার কত্তে পারে?"

ধীরেন্দ্রনাথ, কি জানি—আবার কহিল,—"তবে দাদা, আমাদের চির দিনের মত ত্যাগ কর্‌লে?"

এই সময়ে আনন্দময়ীর পূর্ব্ব-স্মৃতি গুলি একে একে সমুদয় জাগিয়া উঠিল। গভীর শোক-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া সবেগে একবারে প্রাণের কপাট খুলিয়া দিল। তিনি কতক্ষণ—কত কথার প্রসঙ্গ তুলিয়া বিহ্বল-চিত্তে—মুক্তকণ্ঠে রোদন করিলেন। পার্শ্বে বিন্দুবাসিনীও রুদ্ধ কণ্ঠে আপন মনে অশ্রুজল ফেলিতেছিলেন। মায়ের উচ্চ ক্রন্দন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ী অপেক্ষাকৃত কান্নার বেগ একটু কমাইয়া মণীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন,—"কালের মাহাত্ম্য কোথায় যাবে? সতীন-পুত্র আবার কবে আপ্‌নার হ'য়ে থাকে? কিন্তু মণি, তোর বিবেচনা-শক্তিকে বলিহারি! মাগের কথায় বিশ্বাস ক'রে সচ্ছন্দে আমাদের পৃথক ক'রে দিলি! কর্ত্তা না মর্‌বার সময়ে তোর্ হাতে হাতে আমার ছেলে মেয়ে গুলিকে স'পে দিয়ে বলে গে'ছিলেন, যে,—'মণি, এদের দেখিস্, আমি কিছুই রেখে যেতে পাল্লেম না; দেখিস্, যেন দু' মুঠো অন্নের জন্যে এরা লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে না বেড়ায়!" আজ বছর পূর্‌ল না, তুই কেমন ক'রে সে কথা গুলো ভুলে গেলি! পৃথক ক'রে দে—ক্ষতি নেই, নারায়ণ—যিনি জীব দিয়েছেন, তিনি যেমন ক'রে হোক—দু' মুঠো আহারও দেবেন, দিন থাক্‌বে না; কিন্তু এই কথাটা চিরকাল থেকে যাবে।

আর আমিও যদি সতী-কন্যা হই, তবে বাছা তোমায় এও ব'লে যাচ্ছি, তুমি কখন সুখী হ'তে পার্‌বে না। যে মাগের কথা বেদ-জ্ঞান ক'রে আমাদের পৃথক ক'রে দিলে, সেই মাগ হ'তেই তুমি চির-জীবন জ্বলে পুড়ে মর্‌বে।"

পার্শ্বের ঘর হইতে অমনি চিবন চিবন ব্যঙ্গস্বরে মাতঙ্গিনী উত্তর করিল,—"আচ্ছা—আচ্ছা, তোমায় আর লেক্‌চার দিতে হ'বে না। হ্যাঁ, ওঁর সাঁপে ত একেবারে সবই হ'বে! হোঃ! অমন ঢের লোক গায়ের জ্বালায় সাঁপ গাল দেয়।"

মণীন্দ্রনাথের এক স্বভাব ছিল, তিনি প্রায় সকল কথাতেই একটু একটু হাসিতেন; এক্ষণেও একটু হাসিতে হাসিতে সোহাগভরে মাতঙ্গিনীর প্রতি কহিলেন,—"আ পাগ্‌লি, থাম্ থাম্! উনি যত ব'লে নিতে পারেন, নিন।"

শৈলেন্দ্রনাথের চক্ষে অগ্নি ঝলসিতে ছিল। ক্রোধে—দুঃখে—অভিমানে এক একবার তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া আসিতেছিল; তিনি দন্তে দন্তে কর্ষণ করিয়া—মুষ্টিবদ্ধ হস্তে এক এক বার চেয়ার হইতে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এবং পরক্ষণেই মনে মনে কি ভাবিয়া গভীর দীর্ঘ শ্বাসে আপন মস্তকে আপনি করাঘাত করত প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। আহা, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়-পরায়ণ, অভিমানীর হৃদয়, কার্য্যক্ষেত্রে বিফল মনোরথ হইলে কি দুর্ব্বিসহ বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে!

ক্ষণকাল সকলেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে আনন্দময়ী কহিলেন,—"তা এখন 'রান্না বান্না' সমস্ত তৈয়েরি, এ বেলা ত একত্র খাওয়া দাওয়া হোক, ও বেলা থেকে না হয় পৃথক হাঁড়ী কাড়া হ'বে; আর সে ত হয়েই আছে।"

হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরী ওরফে দুই ডাকিনী যোগিনী উদ্‌গ্রীব ভাবে যেন শবের অপেক্ষা করিতেছিল। এতক্ষণে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া, তাহারা দুই জনেই সমস্বরে মণীন্দ্রনাথকে বলিয়া উঠিল,—"তা'—না হয়—এ বেলা আমাদের ঘরে খাওয়া দাওয়া কর, আমাদেরও সমস্ত তৈয়ের হয়েছে।"

"তবে সেই কথাই ভাল" বলিয়া মণীন্দ্রনাথ স্নান করিবার জন্য একটু তেল চাহিলেন। হরসুন্দরীও অমনি "এই আনি" বলিয়া দ্রুতপদে একটি

কাচের বাটীতে তেল আনিয়া দিল, এবং মণীন্দ্রনাথকে সত্বরই স্নান করিয়া আসিতে কহিল। খল, তোমাপেক্ষা জগতে আর আত্ম বঞ্চক কে আছে?'

এত দিনে মাতঙ্গিনীর দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল,—এত দিনে জগদীশের পাষণ্ড পরিবারদিগের মনোবাঞ্ছার কুটিল-পথ সম্পূর্ণরূপে প্রশস্ত হইয়া আসিল। হরিহরের নাবালক সন্তান সন্ততিগণ অকালে সংসারের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া, কঠোর দারিদ্র্যের করাল হস্তে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। মণীন্দ্রনাথের অধঃপতনের এই প্রথম সূত্রপাত হইল; কালে ইহার পরিণাম কোথায় গড়াইবে, পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

ধন্য মণীন্দ্রনাথ,—ধন্য তোমার উদার হৃদয়ের পরিচয়—ধন্য তোমার সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা! মণীন্দ্রনাথ! তুমি না এক দিন মাতঙ্গিনীর তীব্র উত্তেজনায় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার ভ্রাতার অমূলক মৃত্যুর কথা উত্থাপন করিয়া তাহাকে ভ্রাতৃস্নেহের গভীর উদাত্ত-ভাব শিক্ষা দিয়াছিলে?—তাহার ঘৃণিত স্বার্থ-প্রনষ্ট অজ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করিবার অভিলাষে, তুমি না একদিন উদার সাম্য বাদীত্বের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলে,—আর, তুমি না একদিন তাহার সর্ব্ববিধ্বংসী হিংস্রকতার মূলদেশে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে বদ্ধ পরিকর হইয়া স্বীয় পৌরুষত্বের আদর্শ দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলে? কিন্তু মণীন্দ্রনাথ! এখন তোমার মনের সে প্রতিজ্ঞা—সে তেজ—সে বল কোথায়? এখন তোমার সে মনুষ্যত্ব কিরূপে লোপ পাইল? হায়, এখন তুমি দানবীস্ত্রীর আপাতঃ মধুর-মোহে অন্ধ হইয়া কি ভীষণ কালকুট-ই সেবন করিলে! কাল মায়াবিনীর মোহিনী কুহকে মুগ্ধ হইয়া শান্তিময়ী জননী ও স্নেহ-বৎসল ভ্রাতাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে তুমি কি অশান্তির উত্তেজক বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া দিলে। মণীন্দ্রনাথ! তোমার ন্যায় অব্যবস্থ-চিত্ত—অদূরদর্শী—স্ত্রী-বাধ্য—অসার যুবকের হস্তে গার্হস্থ্য-ভার পড়িয়া আজ বঙ্গের নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে—গৃহে গৃহে—সংসার আশ্রম কি ভীষণ শোচনীয় দৃশ্যে পরিণত হইতেছে! আর মাতঙ্গিনী, তোমার ন্যায় হিংসাবৃত্তি পরায়ণা দানবী শ্রেষ্ঠাকে গৃহে আনিয়া,—আজ এই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী আলোক প্রাপ্ত বঙ্গীয় যুবকদল ঘরে ঘরে কি অশান্তি ও হাহাকারপূর্ণ শোচনীয় দৃশ্যের প্রশ্রয় দিতেছে!

তোমার ন্যায় কাল সর্পিনীর তীব্র দংশনে আজ কত শত সংসার-আশ্রম জীয়ন্তে মৃতপ্রায় হইয়া ভীষণ শ্মশানাকার ধারণ করিয়াছে! তোমার কূট-মন্ত্রণায় বঙ্গ গৃহ ছারখার, তোমার কুটীলতাময় দীর্ঘ নিশ্বাসে পারিবারিক অমঙ্গল, আর তোমার কঠোর হিংস্রকতা—বিষাক্ত শরের ন্যায় জীবন হন্তারক! সে সুতীক্ষ্ণ শরের অব্যর্থ-লক্ষ্যে কাহারও নিস্তার নাই! শ্বশুর শাশুড়ী, ভাসুর দেবর, ননদ 'জা'—যে তাহার সম্মুখে পতিত হইবে, সেই-ই তাহাতে সাংঘাতিকরূপে বিদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণঘাতী বিজাতীয় যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে থাকিবে! হা বঙ্গ সমাজ! কতদিনে তোমার চৈতন্য হইবে!—কত দিনে তুমি এ মহারোগের প্রতিকার করিবে! হা বঙ্গ-গৃহ-ধ্বংসকারিণী অশান্তিময়ী অলক্ষ্মি! কত দিনে তোমরা এ ভীমা দানবী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া—আবার স্বাভাবিক স্ত্রী-ধর্ম্ম অনুসারে দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া বঙ্গগৃহ উজ্জ্বল করিবে!—শান্তিময়ী গৃহ-লক্ষ্মীরূপে দর্শন দিয়া নারী-জগতের আদর্শ স্থানীয়া হইবে!—আবার কত দিনে তোমাদের মাঙ্গলিক-ক্রিয়া কলাপে বঙ্গের ঘরে ঘরে আনন্দের রোল পড়িয়া যাইবে!

(ক্রমশঃ)

ফুলের সাজি।

ভগ্ন-হৃদয়।

আশা হীন মন যথা উষার প্রান্তর,
কিছু নাই শূন্যাকার ধু ধু করে নিরাধার
মুগ্ধ পথিকের পক্ষে কিবা ভয়ঙ্কর!
মরুভূমি যত আছে কোথা লাগে তার কাছে
বুঝেও বুঝে না তবু মানব-অন্তর,
তবু হায়! এ পথের পথিক বিস্তর।

নিরাশার বায়ু শুধু চারিদিকে বয়,
'নাহি নাহি' শব্দ তার গরজিছে অনিবার

নিরাশার নভোদেশ অন্ধকার ময়।
নাহি চাঁদ—নাহি রবি নাহি তারকার ছবি
নিশার স্বপন সম মিথ্যা সমুদয়,
এমন ভোজের বাজী জগতে কি হয় ?

পোড়া মানবের যদি হইত চেতন,
তা' হ'লে কি ক'রে সাধ বাঁধিত বালির বাঁধ
পথের ভিকারী কভু হত কি কখন ?
আশার হাসিতে ভুলে তা হ'লে কি যেত গুলে
তা' হ'লে কি বিনা মূলে বেচিত জীবন,
পথে পথে নাচিত কি উন্মাদ মতন ?

সব দেশে দুঃখ-নিশি হয় অবসান,
সুখ-তারা ধীরে ধীরে আকাশেতে উঠি' ফিরে
আবার উষায় সব হয় হাস্যময়।
সব দেশে শশী উঠে কুমদ হাসিয়া ফুটে
কিন্তু নিরাশার রাজ্যে বিচিত্র বিধান,
অমানিশা কখন কি করে না প্রয়াণ !

তিক্ত জীবনের বল থাকে কোন্ আশ,
মায়ার কুলাল-চক্রে ঘোরে বার মাস।
আশা বলে আয় দেখি কিন্তু সে সকলি ফাঁকি
কুহকে আপনি বাঁধে আপনার পাশ।
স্বার্থময় ধরাতল কপট মানব দল
পরাধীন ক্ষুদ্র প্রাণে দলিতে উল্লাস,
ধরা কি মানুষ-বাস ?—রাক্ষস-নিবাস !

বরষার অমানিশা যথা অন্ধকার,
ভয়ে বেলাবেলি ধেয়ে, ধাতার আদুরে মেয়ে

কোথা যে লুকায় ধরা চিহ্ন নাহি তার।
শব্দ খালি 'সাঁই সাঁই' বলে যেন 'কিছু নাই'
মাঝে মাঝে জলদের অট্টহাস সার,
নরের (ও) পরাণে হয় ভয়ের সঞ্চার।

নিরাশ-অন্তর যথা ভূতের ভবন,
হু হু করে রাবণের চিতার মতন।
সব থেকে কিছু নাই পুড়িয়ে হ'য়েছে ছাই
সকলি উদাস তার জীয়ন্তে মরণ।
কষ্টে বহে প্রাণ তার ভুলে সেই এ সংসার
অপার সাগর মাঝে ভাসায়ে জীবন,
অবিরাম—দিবানিশি করে সন্তরণ॥

শ্রীহেমনাথ দত্ত, সাং মজিলপুর।

নিশীথে বংশী-ধ্বনি।

সংসারের কোলাহল—জয়, পরাজয়,
অসত্য; হুজুগ, প্রবঞ্চন,—
সুখীর আনন্দ ধ্বনি—দুঃখীর রোদন
নিস্তবধ নীরব এখন।
নিদ্রিত জগতে শুধু জাগিয়া শশাঙ্ক
জগতেরে দিতেছে কিরণ ;
শান্তির সাগরে যেন অশান্তির রাজ্য
রহিয়াছে ডুবিয়া এখন।
জগত ঘুমা'ল তবু ঘুমা'ল না মন
সারা রাত জাগিয়া কাটালে,
'নিদ্রাও কি ডরে' হায় নশ্বর মানবে
স্থান দিতে আপনারে কোলে !

চিন্তা বিষে মন যা'র জর্জ্জরিত সদা
নিরুপায়—শান্তি নাই তা'র ;
সঙ্কীর্ণ মানব-মনে এত কোলাহল
কেমনে বিহরে অনিবার ?
বড়ই ভীষণ এই মানব-জীবন
কিনা সয় অবস্থায় প'ড়ে,
এই আছে—এই নাই অস্থির জীবন
হায়, তবু মত্ত অহঙ্কারে !
এইরূপ চিন্তামগ্ন ছিলাম যখন
মায়া মুগ্ধ জগতের কোলে,—
সহসা বংশীর ধ্বনি পশিল শ্রবণে
প্রাণে যেন সুধা বরষিলে।
নীরব নিশীথে হেন শুনি' বংশী-ধ্বনি
জাগিল ঘুমন্ত প্রাণ মোর,
আঁধার হৃদয়ে যেন বিদ্যুৎ চ'কিল,
ভাবে প্রাণ হইল বিভোর !
এ রুদ্ধ জগৎ ছাড়ি' কোন্ সে জগতে
প্রাণ যেন যাইতে চাহিল,
সঙ্কীর্ণ হৃদয় মোর হলো প্রসারিত,
চঞ্চলতা—দুর্ব্বলতা গেল।
সে ক্ষুদ্র বংশীর ধ্বনি অনন্ত নিস্তব্ধে—
অনন্ত বিমানে মিশাইল,
শেষ তান তা'র—প্রতিধ্বনি রূপে
এ পরাণে ধ্বনিত হইল।
জীবন্ত—জাগ্রত যেন বাঁশীর সে ধ্বনি—
সুধামাখা শ্রুতি-মধুকর,
সে ধ্বনিতে কোন শোক, তাপ, জ্বালা নাই—
স্নিগ্ধ হয় বিদগ্ধ-অন্তর !

প্রাণের কথক যেন জগত মাতাল—
প্রাণারাম বাঁশরীর স্বরে,
সে মধুর ধ্বনি শুনি' পাষাণের (ও) চিতে
ক্ষণতরে কোমলতা ধরে।
আহা, সংসারের কোলাহলে যাহার শ্রবণ
জর্জ্জরিত দিবস রজনী,
সে যেন আকুল প্রাণে—নীরব নিশীথে
একবার শুনে 'বংশী-ধ্বনি'।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

সাধন ও সাধক।

পৃথিবীতে সকল বস্তুরই আধার ও আধেয় আছে ;—কম আর বেশী। অগ্রে আধার, পরে আধেয়। আধার না থাকিলে আধেয় টিকিতে পারে না,—কিন্তু আধেয়ের অভাবে আধারের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তৈল, প্রদীপে রাখ—থাকিবে, শূন্যে রাখিবার চেষ্টা কর—ভূমে পড়িয়া যাইবে। আর প্রদীপে তৈল না রাখিলেও, প্রদীপ প্রদীপ-ই থাকিবে—তাহার কিছুই ইষ্ট অনিষ্ট হইবে না। তৈল আধেয়—প্রদীপ আধার।

একটু কথা আসিতেছে, মূলে টান্ পড়িতেছে। এ টান বড় সহজ টান নয়—অতি বিষম টান।—শুধু 'অতি বিষম' টান্ নয়,—এ টানে ব্রহ্মাণ্ড টানে—চরাচর অনন্ত বিশ্ব আকর্ষিত হয়। আধার সূক্ষ্ম অর্থে ধরিতে গেলে, এক অনন্ত মূলাধার ভগবানেরই অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং এ হেন বিষম সমস্যা-স্থলে 'আধার' অর্থে আমরা মোটামুটী প্রত্যক্ষীভূত বাহ্য বস্তুরই সত্বা উপলব্ধি করিয়া থাকি।

যাহার জন্য যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট, কখন না কখন তাহার সেই বস্তু আবশ্যক হইবেই ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ—ইহা প্রকৃতির নিয়ম,—সুতরাং অবশ্যম্ভাবী। যিনি প্রতিভাবান, যাঁহার লক্ষ্য প্রতিনিয়ত ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত, সংসারের

শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি সত্বেও, তিনি কোন দিন না কোন দিন তাঁহার চির অভীপ্সিত কার্য্য সাধনে সফলকাম না হ'ন—অন্ততঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। পক্ষান্তরে আবার যে নর পাষণ্ড অবিরাম তাহার দুর্দ্দমনীয় পাপেচ্ছার প্রশ্রয় দানে একান্ত তৎপর, মহা অন্তরায় সত্বেও, সে কখন না কখন তাহার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবেই,—পূর্ণ মাত্রায় সফল না হ'ক—অন্ততঃ কিছু পরিমাণে হইবেই। ইহা কবি-কল্পনা নয়—ইহা প্রত্যক্ষীভূত, সুনিশ্চিত, ধ্রুব-সত্য। যাহার জন্য যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট, কোন না কোন সময়ে—তাহার অনিবার্য্য আকর্ষণে তাহাকে টানিবেই।

"রত্নকে সকলে অন্বেষণ করে,—রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না।" কথাটির মূল্য অনেক। আরও একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা যা'ক। 'রত্নকে সকলে অন্বেষণ করে' তাহার কারণ, রত্নে সকলের প্রচুর উপকার হয়; আর 'রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না' তাহার অর্থ, রত্নের প্রয়োজন অপ্রয়োজন কিছুই নাই। অসম্পূর্ণ বস্তুই সম্পূর্ণত্বের অংশ লাভে তৎপর; সম্পূর্ণত্বের কোন অভাব নাই, সুতরাং সে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করেও না—কিম্বা আপন ভাণ্ডার হইতে কাহাকে কিছু দিবার জন্য ইচ্ছুকও নয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিই সংসারে আদান প্রদানের মুখাপেক্ষী, কিন্তু প্রকৃত অন্তসারবান্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কোন্ কালে অন্যের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে? রত্নে সম্পূর্ণত্ব ভাব বিদ্যমান, আর মানুষে অসম্পূর্ণত্ব—অভাব-অংশ সন্নিবিষ্ট। রত্ন সম্পূর্ণ—মানুষ অসম্পূর্ণ। বলা বাহুল্য, উপমার অনুরোধে এখানে জড় পদার্থ রত্নের সহিত, চেতন পদার্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের তুলনা উল্লিখিত হইল।

আমাদের আলোচ্য প্রস্তাবটি ক্রমে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অগ্রে আধার—পরে আধেয়। কথাও ঠিক তাই। এক্ষণে এই আধার ও আধেয় কি, বিবেচনা করা যাউক।

আধার, সহজ কথায়—আশ্রয়-পাত্র;—আধেয় অর্থে—আশ্রিত-বস্তু। তা' যাহা হ'ক না কেন,—সকল বস্তুতে বা সকল বিষয়েই খাটে। জগতের প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের 'আধার আধেয়' দু'টি পদার্থ বা ভাব আছে। যেমন

তৈলের আধার—প্রদীপ, আর অন্নের আধার—পাত্র। (পাত্র অর্থে এখানে মৃণ্ময়, কাংসময় বা পিত্তল, যাহা ইচ্ছা করিতে পারা যায়।) আবার অন্যপক্ষে প্রদীপের আধেয়—তৈল, আর পাত্রের আধেয় অন্ন। তবেই বুঝা গেল, দুইটির সম্বন্ধ বিভিন্ন হইলেও, যখন কার্য্যে আইসে, তখন তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা এক হইয়া যায়;—এ যেন ওকে টানে,—সে যেন তা'কে টানে। এই যে দুইটি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন—অথচ কার্য্য কালে অতি ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট-ভাব, ইহাই অবলম্বন করিয়া আজ আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের যথাসাধ্য বিচার-মীমাংসা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

সাধন ও সাধক, সহজ কথায়—ঈপ্সিত বস্তুর আরাধনা ও তাহার উপাসক। সংসারে সকল শ্রেণীর—সকল লোকই ইহার অন্তর্বিষ্ট। শুধু 'অন্তর্বিষ্ট' নয়—ইহার জন্য সকলেই সতত ব্যতিব্যস্ত। অভীপ্সিত বস্তুর আরাধনায় কে তৎপর নয়? মানুষ, মানুষ ত বটে, তাই বলিতেছিলাম, যতক্ষণ তাহার মনুষ্যত্বের কিছু না কিছু চিহ্ন থাকিবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই ইহাতে উদাসীন থাকিবে না; যদি থাকে, তবে সে—হয় জড়-ভাবাপন্ন, অকর্ম্মণ্য, মনুষ্যাবয়বে পশু-বিশেষ,—না হয় তিনি—সেই মহাত্মা জিতেন্দ্রিয়, চিত্ত সংযম-শীল, 'জড় ভরত' সদৃশ নির্ব্বাণাবস্থাপন্ন দেবতা-বিশেষ। কিন্তু ইহাতেও হইল না,—দেবতাদিগের মধ্যেও কামনা আছে—অভীপ্সিত বস্তু-লাভে সাধনা—ধ্যান ধারণা আছে। সুতরাং কামনা বিহীন সম্পূর্ণ নিষ্কাম মানুষ জগতীতলে থাকিতে পারে না। যখনই কামনার শেষ হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার দেহেরও অবসান হইবে,—ইহ জগতে তাঁহার আর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। তবে এ স্থলে বলা আবশ্যক, 'নিষ্কাম' অর্থে আমরা আজি কালের নিষ্কাম ভাব উপলব্ধি করিতেছি না। যাহা প্রকৃত নিষ্কাম, যাহা বস্তুতই নির্ব্বাণাবস্থা, তাহা আজ আমরা আমাদের প্রস্তাবিত চারিটি মহাপুরুষের জীবনী ও সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

তবে দেখা গেল, সংসারের মানুষ মাত্রেই আপন অভীষ্ট বিষয়ের সাধনায় অল্লাধিক পরিমাণে অনুরক্ত। যিনি যে বিষয় লাভে—যে পরিমাণে

সাধনা করিয়া থাকেন, তিনি সেই বিষয়ে—সেই পরিমাণে সফল মনোরথ হন। "সাধিলেই সিদ্ধি" ইহা শাস্ত্র-মত-সঙ্গত—মহাজনের যোগ-সিদ্ধ ধ্রুব-বাক্য। যিনি পরমার্থ-পদ-অভিলাষী, তাঁহার সাধনানুসারে—তিনি তাহাতে সিদ্ধি লাভ করেন; যিনি সরস্বতীর বরপুত্র হইতে তৎপর, তিনিও সাধক,—আর যিনি সাংসারিক ভোগ-সুখ, বিলাসিতা, অর্থোপার্জ্জন, আত্ম-প্রাধান্য, মান মর্য্যাদা লাভ করিতে বদ্ধ পরিকর, তিনিও সাধক—তাঁহারও সাধন-প্রণালী স্বতন্ত্ররূপে বিধিবদ্ধ আছে,—তিনিও সাধনার তারতম্যে অল্লাধিক ফল ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সাধন-প্রণালী ও সাধক-চতুষ্টয় সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন।—আমাদের এ 'আধার আধেয়' ভাব পূর্ব্বোল্লিখিত 'প্রদীপ তৈলের' সম্বন্ধ নহে। এ আধার কিছু উচ্চ,—এ আধেয়ের ধার বড়ই তীক্ষ্ণ;—সংসারে এ রত্ন 'কালে ভদ্রে' মিলিয়া থাকে;—শত সহস্র—লক্ষাধিক 'রামা শ্যামার' মধ্যে 'এক আধ' জনও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ!

চারিটি অতি বেগবতী নদী; চারিটির-ই গতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে,—কিন্তু লক্ষ্য এক;—চারিটি-ই এক মহাসমুদ্রে মিশিতে—শত বিঘ্ন-বিপত্তি ভেদ করিয়া অবিরাম ছুটিতেছে,—মুহূর্ত্তকালের জন্যও অবসর নাই। কাহার সাধ্য, তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়? কে তাহার গতি নিবারণ করিতে সক্ষম? সে যথা সময়ে তাহার গন্তব্য পথে উপনীত হইবেই,—তাহার ক্ষুদ্র-প্রাণ এক মহাপ্রাণের সহিত সম্মিলিত করিবেই। কি অপূর্ব্ব শক্তি!

আমাদের আলোচ্য সাধক-জীবনী চতুষ্টয়ও উল্লিখিত বেগবতী নদীর ন্যায়। এই চারি জন মহাপুরুষের নশ্বর জীবন-লীলা এক সময়ে এ বিশ্ব-রঙ্গ ভূমে অভিনীত না হইলেও, ঘটনার পর ঘটনায়—কার্য্যের পর কার্য্যে—দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে কি অনির্ব্বচনীয় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে কি এক অলৌকিক অভিনব তাড়িতপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে প্রাণ চমকিত হয়—হৃদয় মাতিয়া উঠে—মন বিস্ময় ও ভক্তি-রসে পরিপ্লুত হয়!

বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ও রামপ্রসাদ এই চারি জন সাধক-জীবনী এবং ইঁহাদের সাধন-প্রণালী আলোচনা করাই আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কি এক মহান্ গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া—তাহার কার্য্য সাধনার্থ, এই মহাপুরুষ চতুষ্টয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! ফলে, কাহার গতি কতদূর অগ্রসর হইয়া ধর্ম্ম রাজ্যের পথ নিষ্কণ্টক ও পরিস্কৃত করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে প্রবন্ধটি অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আমরা সংক্ষেপে ইঁহাদের জীবনের মহৎ মহৎ কার্য্য ও তাহার উপকারিতা দেখাইতে চেষ্টা করিব মাত্র। ফলতঃ, ঈদৃশ অসাধারণ যোগশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষদিগের জীবন-বৃত্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না করিলে, বিশেষ কার্য্যকারী হয় না।

বুদ্ধ রাজকুমার। রাজা শুদ্ধোধন জ্যোতিষীদিগের গণনামতে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সংসারে অনুরক্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। নন্দন কানন সদৃশ মনোহর বিলাস-উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া, অপ্সরী সদৃশ নর্ত্তকীগণকে নিযুক্ত করিলেন। পরম লাবণ্যবতী দেবকন্যা সদৃশ গোপার সহিত শুভ পরিণয়-জালে আবদ্ধ করিলেন। যাহাতে পুত্রের মনে কোন রূপ সাংসারিক নির্য্যাতন দর্শনে বিরাগ উপস্থিত না হয়, বিধি মতে সে চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু বিধি-লিপি নাকি অলঙ্ঘনীয়, তাই তাঁহার কোন চেষ্টা ও ফলবতী হইল না। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বুদ্ধের মনে সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া ধর্ম্মভাবের অঙ্কুর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আর, ভগবানের প্রতি যাহার প্রাণ প্রকৃত টানিয়াছে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে সাধ্য কার? ঘটনাক্রমে এক দিন মাত্র তিনি জীবের দুর্গতি দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। প্রাণে বৈরাগ্যের ছায়া পড়িল, মন উদাস হইয়া গেল। তিনি আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কিছুতেই থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার পক্ষে রাজ-প্রাসাদ কারাগার এবং ভোগ বিলাস দ্রব্য বিষ তুল্য বোধ হইতে লাগিল।

তিনি সুযোগ ক্রমে সেই দিনই গভীর রজনী যোগে চির জীবনের মত সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিলেন। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই গভীর মন্ত্রের উপাসক হইয়া তিনি বহু সংখ্যক শিষ্য সমভিব্যাহারে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বজনীন গভীর উদাত্ত ভাব সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিল। জীবের দুর্গতি বিমোচন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাই তিনি ঘোর তন্ত্র-মন্ত্র-দীক্ষিত ও

শক্তি-উপাসক রাজা বিম্বাসার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জীব হিংসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অধিক কি, যখন শত শত নিরীহ ছাগ বলি-দানার্থ যূপ কাষ্ঠের নিকট আনীত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি বিম্বাসারকে যে গভীর উদাত্তভাব দেখাইয়াছিলেন, তাহা মানুষের সাধ্যাতীত!—তাহা স্মরণ করিলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। "ছাগের পরিবর্ত্তে আমাকে বলিদান দাও" বলিয়া যিনি যূপকাষ্ঠে নিপতিত হইতে পারেন, তাঁহার হৃদয় কত উদার—কত মহান, তাহা কে প্রকাশ করিতে সক্ষম? মহাপুরুষের জীবন-বৃত্ত লিখিতে গেলে, লেখককে—সেই পরিমাণে না হ'ক—অন্ততঃ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত হৃদয় হওয়া চাই; সুতরাং মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধি সদৃশ জনগণ পক্ষে ঈদৃশ মহান্ জীবনী সেই জন্যই সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। কি জ্বলন্ত ত্যাগ স্বীকার—কি অলৌকিক দৃশ্য—কি অপূর্ব্ব হৃদয়! বুদ্ধদেব মানুষ বেশে দেবতা! দেব-অংশে না জন্মিলে এ গভীর উদাত্ত-ভাব কোথায় মিলিয়া থাকে?

অনেকের বিশ্বাস, বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। আমরা ঈদৃশ কূট তর্কের পক্ষপাতী নহি;—সাদা প্রাণে—সরল মনে যখন তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ-স্বীকার ও জীবনের মহত্ত্ব আলোচনা করি, তখন যে তিনি নাস্তিক ছিলেন, এ কথা লেখা ত দূরের কথা—কল্পনায়ও আনিতে কষ্ট হয়। আমরা তার্কিক নহি, মোটামুটি এই বুঝি যে, যাহাতে 'সত্য' নাই, সে মত কখন তিষ্ঠিতে পারে না। বুদ্ধদেব নাস্তিক হইলে, তাঁহার মত অদ্যাপিও পৃথিবীর প্রায় বার আনা স্থান অধিকৃত করিত না। মিথ্যা বস্তু কয় দিন জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে? তাই বলিতেছিলাম যে, বুঝিবার দোষে ও তাঁহার 'শিষ্য শাখা' দিগের প্রচার প্রণালীর অপব্যবহারে বৌদ্ধ-মত সমাজ বিশেষে নাস্তিকতাভাবে গৃহীত হইতেছে। তবে তিনি মুখে বড় একটা ঈশ্বরের নাম লইতেন না, একথা সত্য। কিন্তু যাঁহারা কার্য্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দর্শাইয়া থাকেন, তাঁহাদের লৌকিক ঈশ্বরোপসনার আবশ্যক কি? ভিত্তিহীন—অট্টালিকা যেমন ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না, বৌদ্ধমত নাস্তিকতাপূর্ণ হইলে, তাহারও সেইমত গতি হইত, এত দিন ইহার অস্তিত্বও থাকিত না।

বুদ্ধ জ্ঞানমার্গের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি যে জ্ঞান-যোগের অচিন্ত্য-প্রতিভা বলে ধর্ম্মরাজ্যের শীর্ষ স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঈশ্বর পূর্ণ পুরুষ—অনন্ত বিশ্বের আধার-স্বরূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অসম্পূর্ণত্ব বা অভাব থাকিলেই আদান প্রদানের আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সম্পূর্ণত্বের চরমাধিকারী, তাঁহাকে কে ডাকিল আর না ডাকিল, তাহাতে আর তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? চিকিৎসকের পরামর্শমত হাতের পাতায় ঘৃতের প্রলেপ দাও, কিম্বা ইচ্ছা না হয়, তুমি অনবরত দুই হস্তে ঘৃত ছড়াইতে থাক, ফল ফলিবে কিন্তু এক-ই। সেইরূপ ভগবানকে না ডাকিয়া—তাঁহার স্তব স্তুতি না করিয়া, যদি তাঁহার কার্য্যই সমাধা করা যায়, তবে না হ'লেম বা ঈশ্বর পরায়ণ! তাই আবার বলিতেছি, বুদ্ধ জ্ঞানযোগে ও অলৌকিক কার্য্য কলাপে যথার্থ পৌরুষত্বেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অবিরাম ঈশ্বরের স্তুতিবাদে মত্ত হইয়া অন্ধ-ভক্ত ছিলেন না সত্য, কিন্তু তিনি এক জন প্রকৃত পরম জ্ঞানী, যোগী ও সাধক শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

দ্বিতীয়—অদ্বৈত গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য। মালবর রাজ্যের অন্তর্গত কেরল দেশে 'চিদম্বর' নামক স্থানে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। অস্মদ্দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের ততদূর আলোচনা নাই, সেই জন্য সাধারণে এ মহাত্মার জীবনী বিশেষ রূপ অবগত ন'ন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে অদ্যাপিও ইনি আদিদেব ভগবান্ শম্ভু শঙ্কর ভাবে পূজিত হন। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ—***"। * যে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একাধিপত্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ শিথিল হইয়া বেদ বেদান্তের হতাদর, জাতিভেদের বিশৃঙ্খলতা ও বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের বিলোপ হইবার সূত্রপাত হইতেছিল, সেই বিষম সমস্যাপূর্ণ সময়ে এই মহাপুরুষ সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত "শিবোহং—শিবোহং" শব্দে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া সমগ্র ধর্ম্ম রাজ্যে ঘোর বিপ্লব আনয়ন করেন। গভীর উদাত্তভাব—অদ্বৈত

* মৎ প্রণীত "শঙ্কর-বিজয়" নামক গ্রন্থে আমরা এ মহাপুরুষের জীবন-চরিত একবার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে সে সমুদয়ের পুরুল্লেখ নিষ্প্রোজন বোধে অতি সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিব।

বাদের পূর্ণ অধিকারী হইয়া তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অভিনব পরিবর্ত্তন-স্রোত আনিয়া দেন। যাঁহার প্রসাদ বলে এই পাশ্চাত্য সভ্যতালোকপূর্ণ ভারতে অদ্যাপিও হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষিত হইতেছে, যিনি অভিনব সঞ্জীবনী-মন্ত্র বলে হিন্দু ধর্ম্মের স্তরে স্তরে একটি গভীর শিক্ষার-বীজ নিহিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই মহাপুরুর—শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার রসময়ী লেখনী বহু সংখ্যক গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। তদ্বিরচিত "বেদান্ত সার"ও "শাঙ্কর-ভাষ্য" পৃথিবীর মহাপ্রলয় কালেও বিলীন হইবে না। তাঁহার সাধনা—তাঁহার প্রক্রিয়া—তাঁহার অলৌকিক কার্য্য কলাপ, পৃথিবীর সকল শ্রেণী লোকেরই শিক্ষার স্থানীয়। অতি শৈশবাবস্থাতেই তিনি নশ্বর জীবনের অসারতা উপলব্ধি করেন। পাঠ্য দশাতেই তাঁহার মনে সংসারের অনিত্যতা ও পরমার্থ-পদের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয়। মহাপুরুষদিলের জীবন প্রায়ই বিপদ সঙ্কুলময় হইয়া থাকে। ইনিও তাহার হস্তে নিষ্কৃতি পান নাই। বাল্যাবস্থাতেই কঠোর দারিদ্র্যের করাল হস্তে নিষ্পেষিত হইয়া, অতি অল্প দিন মাত্র হইলেও—ইনি যেরূপ অমানুষী প্রতিভার সহিত সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন, তাহা বড়ই আদর্শনীয়। দুঃখিনী মাতা বিষিষ্টাদেবীকে যখন কৌশলে পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত-গুরু-সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী,—সে দৃশ্য দর্শনে পাষাণও বিগলিত হয়। তিনি গুরু গোবিন্দপাদের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার জীবনের উৎকট সমস্যার দিন—যে দিন তিনি কোন দুষ্ট-বুদ্ধি কাপালিকের ছলনায় ভুলিয়া ভৈরবী চণ্ডিকার উদ্দেশে আপন মস্তক অম্লান বদনে দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, সে দিন গ্রহপূর্ণ হইলেও তাঁহার নিকট কত মূল্যবান! দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে এই মহাপুরুষ মহানির্ব্বাণাবস্থায় "ওঁ মনোবুদ্ধহঙ্কার চিত্তাদিনাহং * শিবোহং শিবোহং" স্তবকরিতে করিতে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে লীন হইলেন। তাঁহার নশ্বর দেহের পতন হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস অক্ষয়-অক্ষরে তাঁহার নাম অনন্তকাল ঘোষিত করিবে!

(ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় বৎসর, দ্বিতীয় খণ্ড। ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১২৯৫।

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১।	সংসার-আশ্রম (উপন্যাস) ...	সম্পাদক ...	৭৩
২।	ধর্ম্ম কল্পন ...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী ...	৮৩
৩।	সঙ্গীত ...	সম্পাদক	৮৭
৪।	সাধন ও সাধক ...	সম্পাদক ...	৯১
৫।	আধ্যাত্মিক কৌতুক (পদ্য)	শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর	৯৫
৬।	সাহিত্য-সংবাদ ...	সম্পাদক	৯৫

জনৈক মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ভূপতি মহোদয়ের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান শাখা তত্ত্ব প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

নূতন সালসা, নূতন সালসা।

১০ খানা দেশীয় ও ৬ খানা বিলাতী মশলায় বিলাতী উপায়ে প্রস্তুত। সেবনে পারাঘটিত সকল পীড়া, নালী ঘা, শোষ, উপদংশ, কাণে পুঁজ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণতা, খোস, চুলকণা, বাত, শরীরে ব্যথা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, কাশী, স্ত্রীলোকের পীড়া, পিত্তাধিক্য, গলার ও নাকের ভিতরের ঘা শীঘ্র আরাম হয়। প্রতি বোতল ২০ ঔন্স ১৲ প্যাকিং।০ আনা ডজন ১০৷৷০ টাকা।

নীমের তৈল।

বিলাতী কলে নীম হইতে প্রস্তুত তৈল। ডাক্তারী শাস্ত্রে অদ্যাবধি যতগুলি ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা প্রধান। নীমের যে কত গুণ তাহার ভূয়োভূয়ঃ বর্ণনা হিন্দু ও মুসলমান আয়ুর্ব্বেদে আছে। এই তৈল সুগন্ধ, এবং ইহাতে আঠা নাই; ইহা ব্যবহারে ধবল কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ, দাদ, পদ্মদাদ, কাটরদাদ, মেচেতা, মরামাস, আমবাত, পারার ঘা, শোষ ঘা, ঘামাচি, ছুলি, চুলকনা, ব্রণ, হাতের ও পায়ের চেটো ফাটা ক্যানসর, (দুষ্য ঘা,) পৃষ্ঠব্রণ, আরাম হয়।

প্রতিশিশি বড় ৪৲ টাকা, ছোট ২৲ টাকা প্যাকিং ।০ আনা।

নীমের আরক।

ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্তদিগের পক্ষে মহৌষধি। বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন, নীমের কত গুণ। এই ঔষধ দেশীয় নীমের আরক মাত্র। ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত রোগ, নেবা, উদরি, অরুচি, পেটের অসুখ, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে মহোপকারী।

যে স্থলে কুইনাইন ও হারি মানে, নীমের আরক দ্বারা সেখানে উপকার দর্শে। প্রতি শিশি বড় ১ টাকা ছোট ১ টাকা প্যাকিং।০ আনা।

বিনামূল্যে বিতরণীয়! বিনামূল্যে বিতরণীয়!

হাঁপানি রোগের মহৌষধ।

হাঁপানি রোগের এতাদৃশ আশ্চর্য্য ঔষধ আছে কি না সন্দেহ। গত ১০ বৎসর ধরিয়া আমরা কলিকাতা এবং মফঃসলে এই ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতেছি এবং ইহার উপকারিতা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। শত শত লোক আরোগ্য হইয়াছেন। রোগ যতই পুরাতন হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

এঃ ঘোষ কেমিষ্ট, ঠনঠনিয়া কালিতলার পূর্ব্বে বেচুচাটুর্জ্জীর ষ্ট্রীটে ৪৭ নং ভবন কলিকাতা।

সংসার-আশ্রম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যাহা হইবার—তাহা হইবে,—যাহা ঘটিবার—তাহাতে কাহারও হাত নাই। কাল-স্রোত কাহারও স্বকীয় আয়ত্বাধীন নহে; তাহার গতি অনিবার্য্য,—তাহার লক্ষ্য অপ্রতিহত,—তাহার পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। সে কোন বিঘ্ন বাধা মানে না,—মানুষের কুটীল ভ্রুকুটী বা উপেক্ষায়ও দৃক্‌পাত করে না,—সংসারের কোন নশ্বর বস্তু বা পার্থিব বিষয়ের মুখ চাহে না। অবাধে—আপন ভাবে—আপন গতিতে সে প্রতিনিয়ত—অবিশ্রান্ত চলিতেছে,—তাহার বিরাম নাই। মানুষের সাধ্য কি যে, এই অপ্রতিহত কাল-স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়!

মণীন্দ্রনাথ, তাঁহার বিমাতা ও ভ্রাতাদিগের সহিত পৃথক হইয়াছেন কিছু ইহা পাড়া প্রতিবাসী প্রায় সকলেরই অসুখের কারণ হইল। সকলেই মণীন্দ্রনাথকে বিস্তর অনুরোধ করিল,—ভৎর্সনা করিল,—উপদেশও দিল! কিন্তু কিছুতেই শুভ-ফল দর্শিল না। শেষে একান্ত আন্দোলনে যদি কিছু মণীন্দ্রনাথের মন একটু ইতস্তত হইল, কিন্তু আনন্দময়ী তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"দেখ, কেন তোমরা বৃথা অনুরোধ ক'চ্ছ? 'ভাঙা হাঁড়ী কি আর কখন জোড়া লাগে?'—না 'ছেঁড়া চুল মিশ খায়?' যখন একবার পরস্পরের মন ভেঙেছে, তখন কি সে মন আবার কখন এক হয়ে থাকে? তোমাদের বৃথা চেষ্টা!"

ফলেও তাহাই লইল, মণীন্দ্রনাথ ও তদীয় ভ্রাতাদিগের পরস্পরের মধ্যে আর কোন বিষয়ে সংস্রব রহিল না, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্তও এক প্রকার বন্দ হইয়া আসিল। হায়, দুর্দ্দান্ত কালের কুটীল গতি উল্লঙ্ঘন করিতে কে সক্ষম!

বলা বাহুল্য, আনন্দময়ী আপন অভিমান-জালে আপনি আবদ্ধা হইলেন। কিন্তু এ অভিমান নিন্দার জিনিস নয়। ঘোর সাংসারিক ও বিষয়ী লোকের

নিকট এ আত্ম-মর্য্যাদা ও ন্যায়পরতার মহত্ত্ব অকিঞ্চিৎকর ও হীন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের সূক্ষ্মতর বিচার-মীমাংসায় ইহার গৌরব প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। আনন্দময়ী আজীবনকাল বরাবর এক ভাবে বেশ তেজের উপর কাটাইয়া ছিলেন। তিনি যদি মণীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নীর মন একটু নরম করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কঠোর দারিদ্র্য ও সাংসারিক-বিপদের চরম সীমায় উপনীত হইতে হইত না। একটু মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া—'হয়' কে 'নয়' করিতে পারিলে, মানুষের সংসার যাত্রা ও পার্থিব সুখোপভোগ বড় মন্দ হয় না। কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া,—প্রতিপদে সত্য ও ন্যায়ের পানে তাকাইয়া, এ সংসারে কয়জন ঐহিক-সুখ-সম্ভোগে সক্ষম হন?

মণীন্দ্রনাথ পৃথক হইলে পর, আনন্দময়ীর পুত্রদিগের কষ্টের আর অবধি রহিল না। দু' এক খানা সামান্য সোণা দানা, তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল, দুই একে সে গুলিও নিঃশেষ প্রায় হইয়া আসিল। ধীরেন্দ্রনাথ ত পিতার লোক গমনের পূর্ব্বেই স্কুল ছাড়িয়াছে; শৈলেন্দ্রও এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। সময়ে না পায় আহার, না পায় কাপড় চাদর, না পায় পুস্তকাদি; কিছু দিয়া তত্ত্বাবধান করে, এমনও কেহ নাই; সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও লেখা পড়া ছাড়িতে হইল। একে দুঃখের অবধি নাই, তার উপর আবার জ্ঞাতি-বিরোধ, দুর্জ্জনের উপহাস, সরিকানী-বিবাদ ও তাহাদিগের টিট্‌কারী, পাষণ্ডের ভ্রুকুটী, খলের অট্টহাস—এই সকল দুঃসহ-যন্ত্রণা ও অনিবার্য্য কারণে শৈলেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া উঠিল। পড়িতে বসিয়াছে, ছোট ভগ্নীটি কাছে আসিয়া ক্ষুধায় কাঁদিতে লাগিল,—নয়—জননী আসিয়া দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে—ব্যথিত-হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত অস্ফুট-ভাষায় গুমরিতে লাগিলেন। ফলতঃ, ঈদৃশ অনেকগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধকতায় শৈলেন্দ্রের পাঠে বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে তাহাকে অনন্যোপায় হইয়া—নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চির দিনের মত তাহার ছাত্র-জীবন হারাইতে হইল। শৈলেন্দ্রের এইরূপ অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগের জন্য সকলেই দুঃখিত হইল। অধিক কি, স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকগণ পর্য্যন্তও এ বিষয়ের নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া, একটি ভাল ছেলের মায়া চির

দিনের মত ত্যাগ করিতে হইল ভাবিয়া, অনেক দিন অবধি বিষণ্ণ ছিলেন।

অভাবের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা একবার মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিলে, সহজে তাহাকে পরিত্যাগ করে না; বরং উত্তরোত্তর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আনন্দময়ীর পুত্রগণ ক্রমে ক্রমে এই অনিবার্য্য অভাবের চরম-সীমায় উপনীত হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহাতে আবার নিতান্ত 'গো-বেচারী' ধরণের লোক, সুতরাং এত ভাল মানুষের এ ঘোর কলিতে অন্ন মিলিবে কেন? তাহার কোন স্থানেই একটি কর্ম্ম জুটিল না। প্রকৃতির নিয়ম-ই কেমন, যখন ভাল হ'বার, তখন যে কোথা থেকে—কি রকমে ভাল হয়, তা' কেউ-ই বলিতে পারে না; আর যখন মন্দ হবার, তখনও যে কোথা থেকে—কি রকমে মন্দ হবে, তা'ও কা'র ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। বস্তুতঃ, "যা' হ'বার তাই হ'বে" এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, ঊর্দ্ধলক্ষ্যে ভগবানের প্রতি—সম্পূর্ণ না হোক—অন্তত কিছু পরিমাণেও যাহারা নির্ভর করে, তাহারা সংসারে এক রকম মন্দ কাটাইয়া যায় না। 'কর্ম্ম' আর 'অদৃষ্ট' যে কি, তাহার নিগূঢ় রহস্য-ভেদ, তাহার এক-মাত্র কারণ নির্ণয়—বুঝি বা মানুষের বুদ্ধি ও বিচার শক্তির একেবারে অতীত! ধীরেন্দ্র একটি যৎসামান্য কর্ম্মের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটিই করিলেন না,—উমেদারী বা স্তুতিবাদেরও কোন শৈথিল্য হইল না,—আলাপ, পরিচয়, আত্মীয়তা—এ সকলেরও নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না, তথাপিও কি জানি কেন, কোন স্থানেই তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না। বলিহারী, গভীর সমস্যা-পূর্ণ অদৃষ্ট-চক্রের কি বিচিত্র গতি!

উপস্থিত অতি কঠোর দুঃসময়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর শ্বশুর-গৃহে অবস্থিতি করা যুক্তি-সিদ্ধ বোধ করিলেন না। তিনি, তাঁহার পত্নী—বিন্দুবাসিনী ও কন্যা দুইটিকে লইয়া স্থানান্তরিত হইবার মানস করিলেন; কিন্তু কলিকাতার বাটীতে যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। একে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের সহিত মনোভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত বিলাসী ও অলস হইয়াছিলেন, লেখা পড়াও বেশী হয় নাই যে, কোন স্থানে একটি চাকরি সংগ্রহ করিয়া লইবেন—আর তাহার উপসত্ত্ব

হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; এই পাঁচ সাত ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কলিকাতায় যাওয়া কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ বোধ করিলেন না। বিন্দুবাসিনীরও তাহা ইচ্ছা নয়; কারণ, এখন তাঁহাদের পয়সা নাই, এখন আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র থাকিতে গেলেই একটা না একটা কলহ বাঁধিবে, ও অন্তর্ভেদী লোক-গঞ্জনায়, দিন দিন তাঁহাদের হৃদয়ের রক্ত মাংস অবধি শুষ্ক হইয়া আসিবে। উভয়েই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"অন্যত্র থাকিয়া আহারাভাবে মরিয়া যাইব—সেও ভাল, তথাপি এ অবস্থায় কলিকাতার বাটীতে কখনই যাইব না।"

পূর্ব্ববঙ্গ—ঢাকা জেলায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের এক মাতামহী ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান তাঁহার বিষয়ের অন্য কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তদীয় দৌহিত্রগণ পাইবেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ অনন্যোপায় হইয়া এখন সেই খানেই যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, বিন্দুবাসিনীরও তাহাই মত হইল। আনন্দময়ী ইহা শুনিলেন, এবং একটু কাঁদিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি বিষাদপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিন্দুবাসিনীকে কহিলেন,—"মা, তোমরা যাবে—যাও, তবে আর কিছু দিন—আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে ভাল হইত!"

বিন্দুবাসিনী কহিল,—"মা, কাঁদ কেন, ভগবান আছেন, তিনিই আমাদের এ বিপদে রক্ষা করিবেন! দেখ, একে এরা ছেলে মানুষ—নাবালক; আমার উচিত, এদের কিছু কিছু দিয়ে সাহায্য করা; তা দূরের কথা, উল্‌টে আমিই এদের গলগ্রহ হয়েছি। আবার যদি জগদীশ্বর দিন দেন,—আবার যদি কখন মানুষের মত হ'তে পারি, তবে মা, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে, নহিলে এই অবধি!"

মা ও মেয়ে উভয়েই ক্রন্দন করিলেন, উভয়ের প্রাণে তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, উভয়েরই শোকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আনন্দময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা বিন্দু, বুঝ্‌লেম, এক দিনের জন্যেও তোর অদৃষ্টে সুখ নেই! কি করব্ মা বল! যেমন পোড়া কপালীর গর্ভে জন্মেছিলি। আঃ! আজ যদি তিনি বেঁচে থাক্‌তেন, তা' হ'লে কি আর তোদের এই সাত সমুদ্র—তের নদী (?) পদ্মা-পারে যেতে হ'ত? আমি ধীরেনের মুখে শুনেছি,

সে ত গাঁও নয়—যেন সাক্ষাৎ যমের পুরী! তবে মা, আমি কোন প্রাণে তোদের সেখানে যেতে দেব বল্?"

আনন্দময়ী আবার অধীরা হইলেন, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রুজলে প্রজ্বলিত শোক-বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিলেন। বিন্দু কহিল,—"মা, কাঁদ কেন, কত লোকে ত কত দূর দেশে যায়! পয়সার জন্যে লোকে কি না করে?—আহার না জুট্‌লে লোকে বাঘের মুখে—সাপের মুখে যেতেও ডরায় না। আমরা ত বেশ নির্ব্বিঘ্নেই যা'ব। এখন শীতকাল, এখন ত আর ঝড় তুফানের ভয় নেই; তবে মা, তুমি বার বার চোখের জল ফেলে আমাদের অকল্যাণ কর কেন? আমরা সেখানে পৌঁছেই তোমাকে খবর দিব।"

মা ও মেয়ের আরও কত কথা হইল, আশার কুহকে ভুলিয়া, মনে মনে কত বাসনার তরঙ্গ উঠিল, ক্রমে ক্রমে উপস্থিত দুঃখের কথা বিস্মৃত হইয়া উভয়েই ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন মায়া-যবনিকার ভিতর হইতে সুখের বিমল-জ্যোতি দেখিতে পাইলেন, প্রাণ অনেকটা সুস্থ হইল। ধন্য কুহকিনী আশা—ধন্য মায়া-প্রলোভন!

দিন স্থির হইল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সকলের নিকট বিনয় নম্র-বচনে বিদায় লইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত দ্রব্যাদি নৌকায় উঠিল, পাড়া প্রতিবাসিনী রমণীগণ প্রায় সকলেই বিন্দুবাসিনীকে যানে তুলিয়া দিতে চলিল। পল্লীগ্রামে স্বভাবতঃই স্ত্রীলোকগণ পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয় যাইবার সময় ক্রন্দন করিয়া থাকে, সহরে এ প্রথা বড় একটা দেখা যায় না। শোক তাপ, আধি ব্যাধি, সকল রকম যন্ত্রণাই বিন্দুবাসিনীর সহচর; তদুপরি দুঃখের জ্বালায়—লোক গঞ্জনায় তাহাকে পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া অতি দূর দেশে—ভয়াবহ স্থানে যাইতে হইতেছে, সুতরাং বিন্দুবাসিনী যে পাষাণভেদী ক্রন্দন করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি! ক্ষণপরে বিন্দুবাসিনী ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া যানে উঠিলেন, মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল, সমাগত প্রতিবাসিনীগণ সকলেই সজল নয়নে—এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ নৌকাপানে তাকাইয়া ক্ষুণ্ণ-মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

মুহূর্ত্তকালের জন্য রায়েদের সুবৃহৎ পুরী মধ্যে করাল দারিদ্র্য ও

চাহিয়া—আবার চক্ষু নিমিলিত করিলেন। কাহার উদ্দেশে কাহাকে যেন কি বলিলেন, মুখে তাহার কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন—কতই অনুনয়-বিনয়-ভাব প্রকাশ পাইল। সে বাক্তিও যেন তাহা স্বীকার করিল, আনন্দময়ীও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু আশ্বস্ত হইলেন। সার্ব্বমাঙ্গল্যে পূর্ণ বিশ্বাসী পাঠক এ গভীর উদাত্ত-ভাব ও ভক্তি-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"ও বিজয়া, এই আয় না ভাই—এ দিকে।"

"মা, শৈল আমায় ডাক্‌ছে, যা'ব কি মা?"

আনন্দময়ী কহিলেন,—"কেন ডাক্‌ছে?"

"মা, তুই কিছু বল্‌বিনে বল্? দেখ্ মা, দাদার মেয়ে শৈল আমায় বড় ভাল বাসে। আমাদের সকল দিন খাওয়া হয় না,—কিন্তু মা, সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ ভাঙা পাঁচীলের আড়াল থেকে আমায় কত খাবার দিয়ে যায়। এত দিন মা তোকে বলিনে, তুই মার্‌বি ব'লে; কিন্তু মা, ক্ষিদেয় আর থাক্‌তে না পেরে ওদের খাবার খেয়েছি, তাতে কি কিছু দোষ হয়েছে মা?"

'দোষ হয়েছে মা?' আবাগী, তুই কেন চুরি ক'রে ওদের খাবার খেয়েছিস্ বল্? আসুন দাদা ঘরে।" অষ্টম বর্ষীয় দুগ্ধপোষ্য বালক সুবোধ—তাহার ষষ্ঠ বর্ষীয় ভগ্নী বিজয়াকে এইরূপ ভৎর্সনা করিল।

"বাঃ! আমি চুরি কর্‌লেম কি ক'রে? আমায় ডেকে দেছে, তাই আমি খেয়েছি।"

"দাদা কি বউ দিদী তা' জান্‌তেন?"

"না,—তা' জান্‌তেন না।"

"তবে এ রকম লুকিয়ে খাওয়া কি চুরি করা নয়?" তৎপরে মায়ের প্রতি কহিল,—"হাঁ মা! আমি কি কখন কা'র কাছ থেকে চেয়ে খেয়েছি?"

"না বাবা, তুমি আমার সোণার চাঁদ,—তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে!" এই বলিয়া আনন্দময়ী পুত্রের মধুমাখা-কপোলে একটি চুম্বন করিলেন।

বিজয়া কিছুক্ষণ জননীর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ছল ছল চক্ষে কহিল,—"মা, আমার ঘাট হয়েছে, আমি এমন কাজ আর কখন কর্‌ব না।"

সুবোধ—"কেমন, ঠিক্ বল্‌ছিস ত? নইলে দাদার সঙ্গে ব'লে দিয়ে, আবাগী তোমায় আচ্ছা ক'রে মার্ খাওয়াব?"

"হ্যাঁ ভাই, আমি আর কখন এমন কাজ কর্‌ব না। তোর পায়ে পড়ি, তুই সেজ-দাদার সঙ্গে এ কথা বলিস নি!" তৎপরে শৈলের উদ্দেশে বলিল,—"না ভাই, আজ আমি আর যাব না।" বলা বাহুল্য, ইহাদের কথোপকথন শুনিয়া বালিকা শৈল পূর্ব্ব হইতেই সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

পাঠক, ধনীর আলয়ে কি কখন এরূপ জ্ঞান-বৃদ্ধ শিশু সন্ততি দেখিয়াছ? ধর্ম্মভিত্তি গঠিত দরিদ্রের কুটীর ভিন্ন এ রত্ন সাধারণতঃ আর কোথায় মিলিয়া থাকে? উপর্য্যুপরি বিপদ ভোগ, কঠোর দারিদ্র্য ও দুঃসহ অভাবের হস্তে পেষিত হৃদয় ভিন্ন, অধিক বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দারিদ্র্য ও সাংসারিক বিপদ, বোধহীনকে প্রবীণ করে, শিশুর অন্তরেও বহুদর্শী, সুপ্রবীণ ধর্ম্মশীল বৃদ্ধের ধর্ম্মবুদ্ধি আনিয়া দেয়। তাই বলিতেছিলাম, এই দুইটি দরিদ্র শিশুর মুখে পূর্ব্বোক্ত নীতিপূর্ণ কথা শুনিয়া কেহ 'উপন্যাস' বোধ করিও না।

এবার মণীন্দ্রনাথ নিজে বিজয়ার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন শুনিয়া, আনন্দময়ী তাহার গমনে কোন আপত্তি করিলেন না। সেও "এই যাই" বলিয়া দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইল, এবং মণীন্দ্রনাথের উচ্ছিষ্ট ভোজন-পাত্রে আহার করিতে বসিল।

সুবোধ বয়সে শিশু বটে, কিন্তু সে শিশু হৃদয়ের ভাব অতীব গভীর—অতীব বিস্ময়কর। এই অষ্টম বর্ষীয় দরিদ্র শিশুর হৃদয়-উদ্যানে যে সকল অমূল্য গুণ-রত্ন-সম্পন্ন-বৃক্ষরাজী বিভূষিত আছে, অনেক পলিত-কেশ ধনী বৃদ্ধের জীবন-মরুভূমে তাহার একাংশও পাওয়া যায় না। এতক্ষণ পর্য্যন্ত বালকটি উপবাসী—ক্ষুধায় জর্জ্জরিত, তথাপি অনেক কষ্টে সে ভাব গোপন করিতেছে; তবে নিতান্ত অসহ্যকর প্রযুক্ত এক এক বার সে ভাব আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, সোণারচাঁদ শিশু অমনি তখনি আবার তাহা ঢাকিতে প্রয়াস পাইতেছে। পাছে, তাহার দুঃখে জননী ব্যথিতা হন, তাহার অস্থিরতায় তিনি ক্রন্দন করেন, এই আশঙ্কায় সেই আদর্শ দরিদ্র-শিশু অতি কষ্টে আপন মনোভাব গোপন করিয়া অন্য কথা পাড়িতে আরম্ভ করিল। স্নেহময়ী মা ইহা বুঝিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন, চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সে মুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। ক্রমশঃ বেলা যত

অধিক হইতে লাগিল, বালকটিও ক্ষুধায় ততই নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া পড়িল। কণ্ঠস্বর ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিল; আর কোন ক্রমে স্থির থাকিতে না পারিয়া, এইবার কঠোর যন্ত্রণা সহকারে—ক্ষীণ কণ্ঠে অভাগিনী জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"ও মা, মা,—ও মা, আর যে পারি না মা!"

"বাবা, কি কর্‌ব বল্‌,—আর একটু দেরি কর্‌!"

"ক্ষিদেয় যে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে গেল মা! বাবা গো তুমি এখন কোথায়!"

সহৃদয় পাঠক! প্রথম পরিচ্ছেদের সে মর্ম্মভেদী দুঃখ-কাহিনী স্মরণ আছে কি? সেই ক্ষুৎপিপাসা-ক্লিষ্ট অষ্টম বর্ষীয় বালক ও তাহার অভাগিনী জননীর কথা মনে হয় কি? এক দয়ার শরীর বৃদ্ধা একখানি ছোট থালায় করিয়া তাহার জন্য কিছু অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়াছিল, অনাথিনী জননী সকরুণ-কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে কতই অনুনয় বিনয় করিল,—পাঠক, এ সব তোমার মনে আছে বৈ কি! সে অভাগিনী রমণী আর সেই ক্ষুৎ পিপাসা-ক্লিষ্ট শিশুটি কে বল দেখি? বোধ হয় তোমাকে আর অধিক পরিচয় দিতে হইবে না যে, সেই অনাথিনী আমাদের আনন্দময়ী, আর সেই বালকটি তাঁহার সোণারচাঁদ শিশু সুবোধ! হা পরোপকারী সত্যব্রত হরিহর! এ সময় তুমি কোথায়? এখন একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার অবর্ত্তমানে তোমার শান্তিময় সোণার সংসার কি বিসদৃশ ভাবে পরিণত হইয়াছে! হা মণীন্দ্রনাথ, তুমি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইলে! একবার গভীর মোহ-আঁধারাচ্ছন্ন নীরয়-কূপ হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান রূপান্তরিত ভাবে কি বিভীষণ করাল বেশে আবির্ভূত হইয়া—তোমার বিনাশার্থ শাণিত-খড়্গ উত্তোলন করিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছেন!

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম কম্পন।

(১ম প্রস্তাব)

আজ কাল বঙ্গদেশে বিশেষতঃ সহর কলিকাতার মধ্যে সন্নিকটে একটা বিষম ধর্ম্ম-কম্পন উত্থিত হইয়াছে। কাল প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের গলিতাবশিষ্ট শরীরে অভিনব বৈজ্ঞানিক তাড়িত সঞ্চার দ্বারা এই মহাব্যাপী ধর্ম্ম কম্পনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কম্পনে বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিতের মস্তিষ্কের সহিত ধমনী কাঁপিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধের কম্পন কিছু আশ্চর্য্য নয়, মরণকালে হরিনাম প্রায়ই দেখা যায়; স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয় বদ্ধমূল সংস্কার (কু-ই হৌক আর সু-ই হৌক) সহসা ত্যাগ করিতে পারে নাই বলিতে গেলে, এই দারুণ ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় কেবল তাহারাই হিন্দুধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছিল। বালক ত তোতা পাখী,—মা বাপকে যা করিতে দেখে, তাহাই করে। আশ্চর্য্য এই যে, "প্রদোষে স্ফুট চন্দ্র তারকা বিভাবরী যদ্যরূণাড় কম্পতে" পূর্ণিমার প্রদোষের রাত্রি পূর্ণ শশধর ও সমুজ্জ্বল তারকা মণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। যুবা প্রণয় সঙ্গীত ত্যাগ করিয়া কবির সুরে কালী কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল নানাবিধ চোষ্য চোষ্য লেহ্য পেয় পরিত্যাগ করিয়া হবিষ্যান্ন আশ্রয় করিতেছে। কুক্কুটাণ্ডের পরিবর্ত্তে গোল আলু, রোষ্টেড রুটির পরিবর্ত্তে আতপ তণ্ডুলের অন্ন, ফাউল কারির পরিবর্ত্তে লাউ ডাঁটার চড়্‌চড়ি এবং খোদাবক্সের পরিবর্ত্তে স্বপাক আরম্ভ হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যিনি সেরি স্যাম্পেন দিয়া জল পিপাসা নিবারণ করিতেন, বাসি মুখে—বাসি কাপড়ে যথেচ্ছা ভোজন করিতেন, সন্ধ্যাহ্নিকের স্বপ্ন দেখিতেন কিনা সন্দেহ, আজ তিনি গঙ্গাজল ভিন্ন পান করেন না, মস্তকে শিখা রাখিয়াছেন, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না, যেন একটি মহর্ষি সাজিয়া বসিয়াছেন, চেনা ভার।

চেনা ভার, অনেককেই। যিনি হিন্দু শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া,

জাতিভেদকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া এবং শিষ্টাচার সকল ভাগীরথী জল-কল্লোলে বিসর্জ্জন দিয়া সমুদ্রপথে বিলাত গমনান্তর তিন চারি বৎসর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক এখানে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তিনিও সূর্য্যোপস্থান আরম্ভ করিয়াছেন,—প্রত্যহ স্বহস্তে নূতন হাঁড়িতে পাক করিয়া ভোজন করিতেছেন। এই কালে যাঁহাকে ঘোর নাস্তিক বলিয়া সকলে জানিত, আজ তিনি কেবল সার্দ্ধ ত্রিশকোটি দেবতা নয়—তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপদেবতা গুলিরও উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। আর যাঁহারা বাণের জলের ময়লার মত আজ খৃষ্টান, কাল ব্রহ্মজ্ঞানী—এই রূপ নানা ধর্ম্মের আশ্রয় করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা আজ ঘোর হিন্দুর বেশ ধারণ করিয়াছেন! তাই বলিতেছি, এ ধর্ম্ম কম্পনে অনেককে চেনা ভার হইয়া উঠিয়াছে।

এই ধর্ম্ম কম্পন ফ্যাসন শূন্য নয়, ইহার সহিত কতকগুলি ফ্যাসন আসিয়া জুটিয়াছে।—যথা (১ম) শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা পাঠ। এ গীতা পাঠের স্থান নাই, ক্ষণ নাই এবং শাস্ত্র সঙ্গত অধিকারী অনধিকারীর বিচার নাই; পণ্ডিত, মূর্খ, চাষা, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, পাঠের সময় নাই; সকাল, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন, সায়ং, রাত্রি—যাঁহার যখন ইচ্ছা, তিনি তখনই গীতা পাঠ করিতেছেন; আবার ডেলি প্যাসেঞ্জারেরা রেলের গাড়ীতে যাতায়াতের সময়ও গীতা পাঠ করেন। এই ত গেল পাঠের ব্যবস্থা। তার উপর লেখকগণ গীতায় একচেটে করিয়াছেন। কি সামাজিক প্রবন্ধ, কি রাজনৈতিক প্রবন্ধ, কি প্রণয় প্রবন্ধ, কি পারিবারিক প্রবন্ধ,—দার্শনিক প্রবন্ধের ত কথাই নাই, সকল প্রকার প্রবন্ধেই গীতার বচন মিলুক না মিলুক—উদাহৃত অথবা কেবল উদাহৃত কেন ক্ষত বিক্ষতরূপে ব্যাখাতও হইতেছে; নাটক, নভেলের অধ্যায়কে অধ্যায়ে গীতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে গীতার যে কত প্রকার এডিসন্ হইল, তাহার স্থিরতা নাই। (২য়) একাদশীর দিন ভাত না খাওয়া। অল্প দিন পূর্ব্বে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর বিধবারা একাদশীর সম্পূর্ণ আদর করিতেন, তদ্ভিন্ন মাথাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও অনুকল্প দ্বারা একাদশীর সম্মান রক্ষা করিতেন, আর কোন কোন স্থানের নূতন উপনীত ব্রাহ্মণরা ও মেরে কেটে এক বৎসর পর্য্যন্ত একাদশীর অভ্যর্থনা করিতেন; কিন্তু আজ কাল একাদশীর পোয়া বার! তিনি এখন ফ্যাসনে

উঠিয়াছেন, ভগবদ্গীতার নিম্নেই তাঁহার আধিপত্য। ফ্যাসন (৩য়) আর্য্য শব্দের ব্যবহার। আর্য্য বিদ্যালয়, আর্য্য ঔষধালয়, আর্য্য পুস্তকালয়, আর্য্য-নাট্যালয়,—এই রূপ দোকান, পসার, ছাপাখানা, কারখানা, হোটেল অবধি আর্য্য নামে অঙ্কিত হইতেছে,—এদিকে সাহিত্য, সমাজেও আর্য্য পাঠ, আর্য্য-চরিত, আর্য্য সংঙ্গীত, আর্য্য পত্রিকা, আর্য্য বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ পুস্তক পত্রিকা 'আর্য্য' নামাঙ্কিত হইয়া বহির্গত হইতেছে।

উপরিউক্ত তিনটি ফ্যাসনই প্রধান এবং ব্যাপক; এতদ্ভিন্ন আর কতকগুলি ফ্যাসন আছে, তাহারা অব্যাপক—প্রাদেশিক মাত্র; উহাদের মধ্যে কবিরাজী চিকিৎসা এ স্থলে উল্লেখের যোগ্য বটে। আজ কাল কলিকাতায় এমন একটা রাস্তা দৃষ্ট হয় না, যাহার পার্শ্বে একটিও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় নাই; এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না—বরং অনেক গলি ঘুঁজিতেও আয়ুর্ব্বেদাঙ্কিত সাইন পট্ট লক্ষিত হয়।

এরূপ ধর্ম্ম কম্পনের ভাবী ফল ভাল কি মন্দ হইবে, সে বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি, আর সেরূপ ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি মনুষ্যের হইতে পারে কি না, বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের তাহা নাই। এই সঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, এই সুযোগে কতকগুলি লোক ধর্ম্ম-কঞ্চুকে অঙ্গ আবরণ পূর্ব্বক কেহ বা কলমবাজী করিয়া আর কেহ বা গলাবাজী করিয়া বিলক্ষণ ভাগ্য বর্দ্ধন করিয়া লইতেছেন। রঙ্গভূমিও এ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই, ফাঁকে পড়িয়াছেন কেবল গুরু পুরোহিত, যাদের লয়ে ধর্ম্ম,—তাঁদের ভাগ্যে যে জেলে কাছা, সেই জেলে কাছাই পূর্ব্বাপর সমান বরাদ্দ। তাঁহাদের কিবা রাত্রি কিবা দিন,—ধর্ম্মের উন্নতি অবনতি সমানই।

আমরা ত কম্পনের প্রভাবে বিলুপ্ত প্রায় হিন্দু ধর্ম্মের মলিতাবশিষ্ট শরীরে তাড়িত যোগে কম্পন বলিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ধর্ম্ম কি? তাহার প্রসর কত টুকু? আর যদি এ কম্পন স্থায়ী হইয়া প্রাণপ্রদ রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে কোন্ ধর্ম্মেরই বা পুনরুজ্জীবন, এ কথা জিজ্ঞাস্যায় আমাদের মস্তক অবনত করিয়া নীরবে অবস্থান ভিন্ন আর ত কোন উপায় দেখি না! কারণ হিন্দু ধর্ম্ম বলিতে যদি মনুর ধর্ম্ম ধরা যায়, তাহা হইলে কি তাহার পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব? আর যদিও সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি আর

তাহা অভীপ্সিত? কখনই নয়। মনুর ধর্ম্ম এক্ষণে আর প্রচলিত হইতে পারে না, হইলেও তাহা আর পুনর্ব্বার সমাজে গৃহীত হয় না।

মনু চতুর্ব্বর্ণের যেরূপ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহাদের যেরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সে সকল নিয়ম কি প্রত্যক্ষরে প্রতিপালিত হইতে পারে? মনু সমাজ মধ্যে শূদ্রের যে অবস্থা বলিয়া গিয়াছেন, এখনকার শূদ্রেরা কি সে অবস্থা গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন? অবশ্য এ স্থলে আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে, যদিও অপর তিন জাতি মনুর নিয়ম ঠিক ঠিক প্রতিপালন করিতেছে এরূপ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কি শূদ্রগণ মনুর মত ঠিক প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হয়েন? না বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া যাওয়া উচিত হয়? মনু বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ ইচ্ছামত একবার মাত্র সুরাপান করিলে সে জন্মের মত পতিত হয়, ইহ জন্মে কোন রূপেই আর ব্রাহ্মণত্বে তার দাবী থাকে না, তুষানলে অথবা অগ্নির মত সুতপ্ত সুরাপান করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। এক্ষণে ত ঠক্ বাছিতে গাঁ ওজড়! সুরাপান করেন না এরূপ ব্রাহ্মণ কয়জন আছেন? যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের থাকা না থাকা সমান; কারণ বর্ত্তমান সমাজের ইষ্টানিষ্টের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অতি অল্প নাই বলিলেও চলে; আর তাঁহারা নিজে সুরাপান না করুন, সুরাপায়ীর সহিত তাঁহাদের যে অজস্র সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, সুতরাং তাঁহারাও ঐরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের পাত্র। কাযেই এক্ষণে মনুর মত চালাইতে হইলে প্রথমে ব্রাহ্মণ জাতিরই লোপ করিতে হয়। আজন্ম মদ্যপান, যবনের পক্কান্ন কুক্কুট পলাণ্ডু আদি ভোজন করিয়া তাহার পর ঐ সকল দ্রব্যে অরুচি হওয়ায় উহা পরিত্যাগে আমি ব্রাহ্মণ হইলাম, শিক্ষা রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম বলিলে মনুর মতে আর ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। প্রণিধান পূর্ব্বক সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মনুর ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের সম্ভাবনা নাই এবং সে ধর্ম্ম গ্রহণেরও আমাদের অধিকার নাই। আমাদের সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে মনুর ধর্ম্ম বলিব। তবে অদ্য এই মাত্র বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি যে, আমরা পুরুষানুক্রমে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রোক্ত

ধর্ম্ম আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, তাহার স্থায়িতায় আমাদের যত আনন্দ বোধ হয়, অতি অল্পমাত্র লোকের সেরূপ আনন্দ হইয়া থাকে। অতএব আমার বক্তব্য যত দিন শেষ না হয়, তত দিন আমাকে কেহ যেন ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া নিন্দা না করেন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,— "অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ" অপ্রিয় হিত কথা কেহ বলিতে পারে না, এবং বলিলেও তাহা কেহ গ্রহণ করেন না। আজ ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অনেকেই নাকি শত শত নিরীহ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত এবং সেই সকল বঞ্চকের মোহ-জাল ছেদ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, কাজেই আমার বক্তব্য শেষ না হইতে অনেকে অযথা নিন্দাবাদ করিয়া আমাকে লোকের বিদ্বেষ-ভাজন করিতে পারেন। এই নিমিত্তই আমি প্রার্থনা করি, কেহ যেন মধ্যে কোন ব্যাঘাত না করেন।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

সঙ্গীত।

"ন বিদ্যা সঙ্গীতঃ পর" কবি যথার্থই প্রাণের সহিত এ কথা বলিয়াছেন। আমরাও বলি, পৃথিবীতে যদি কোন শ্রেষ্ঠ বিদ্যা থাকে, তবে সে সঙ্গীত বিদ্যা। সঙ্গীতে মানুষের মন কোমল করে,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব আনিয়া দেয়, পশু-ভাব ঘুচিয়া দেব-চরিত্র লাভ হইয়া থাকে। বস্তুত রীতিমত সাধনা ও ধ্যান ধারণা ব্যতীত সঙ্গীত-শাস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যায় কেহই উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারেন না। পরমার্থ-পদাভিলাষী মহাত্মাগণের পক্ষে সঙ্গীত একটি উপাদেয় বস্তু। সে যোগীজন-দুর্ল্লভ পরম মোক্ষ-পদ লাভ করিতে যত প্রকার সাধনা, প্রক্রিয়া বা যোগ তপ আরাধনা আছে, সঙ্গীত তাহাদের মধ্যে প্রধান অবলম্বন। ইহা দ্বারা যেরূপ অনায়াসে মনোবিকার বিদূরিত হইয়া প্রাণে স্বর্গীয় প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়, হৃদয় মাতিয়া উঠে, চিত্ত-সংযম অভ্যাস হইতে থাকে, পৃথিবীর আর কোন বস্তুতে

সেরূপ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহার ভক্তশিষ্যের নিকট এ কথা কহিয়াছেন! মানুষ ত দূরের কথা, গানে বনের পশু পক্ষীও বশ হয়, সুস্বরে বিমোহিত হইয়া জীব-হিংসায়ও বিরত হইয়া থাকে।

অনন্ত বিশ্ব প্রকৃতির সহিত সঙ্গীতের সম্বন্ধ অতি নিকট। শুধু অতি নিকট নহে—প্রকৃতির প্রাণের সহিত সঙ্গীতের প্রাণ মিশ্রিত,—হর-গৌরী বেশে অপূর্ব্ব সম্মিলন! প্রত্যেক বস্তুরই দেশ-কাল-পাত্র ভেদ আছে, সুতরাং সঙ্গীতও তাহার অন্তর্বিষ্ট। নির্ম্মল-চিত্ত ঈশ্বর-পরায়ণ সাধক-শ্রেষ্ঠের সুকোমল কণ্ঠ-নিঃসৃত তান-লয়-সংযুক্ত সাধন-সঙ্গীত সময়ের তারতম্যানুসারে—রাগ রাগিনী ভেদে গীত হইলে জড় প্রকৃতিতেও সজীবতার লক্ষণ দেখা যায়, তাহারও জীবনী-শক্তি লাভ হইয়া থাকে। শুনিয়াছি, গায়ক শ্রেষ্ঠ তানসেন এই পথের পথিক হইয়া মর-জগতে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য—সাধারণের অপ্রত্যক্ষীভূত ঘটনার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। খুঁজিলে, এখনও এই সার্ব্বজনিক বিপ্লবময় ভারতে—এ গভীর সমস্যাপূর্ণ দিনে দুই এক জন তানসেন না মিলে—এমন নয়। কিন্তু হায়, পূর্ব্ব তুলনায় এক্ষণে অস্মদ্দেশে দিন দিন-ই ঈদৃশ স্বর্গীয় বস্তুর অমর্য্যাদা ও অধঃপতন পরিলক্ষিত হইতেছে। এখন সঙ্গীত-বিদ্যা বাবু ভায়েদের 'সখের' জিনিসের মধ্যে পরিগণিত, বিলাসিতার অঙ্গ বিশেষ হইয়া, বিসদৃশ বেশে কি এক 'কিম্ভূত কিমাকার' ভাবে পর্য্যবসিত হইতেছে! সে কাল ও এ কালের তুলনায় সঙ্গীতের যে কতদূর অবনতি হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের অবিদিত নাই, সুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সঙ্গীতের শক্তি অপরিসীম। ইহাতে মুগ্ধ নয় কে? দুগ্ধ-পোষ্য শিশু হইতে অশতিবর্ষ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইহার অনির্ব্বচনীয় উদাত্ত—ভাবে বিভোর। আদি, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, হাস্য, অদ্ভুত ও শান্তি এই নব রসের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ইহাতে ওৎপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। অবস্থাভেদে—সময়ের গতি অনুসারে এই নবরস সংযুক্ত গান, নবরসজ্ঞ হৃদয়বান সুগায়কের কণ্ঠে গীত হইলে, তাহার পরিণাম যে কত শুভপ্রদ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। পৌরাণিক-ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সঙ্গীত কল্পতরু বিশেষ। ভক্তিরস সংযুক্ত ঐশ-সংগীতে যোগীর যোগ

সিদ্ধ হয়, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-পিপাসা মিটে, মুমুক্ষু মহাজনের ঈশ্বর আরাধনা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আবার উদ্দীপন রস-সংযুক্ত হৃদয়োন্মত্তকারী বীরত্ব-ব্যঞ্জক সঙ্গীতে—বীরের যুদ্ধ-ক্রিয়া, স্বদেশ-হিতৈষীর রাজনৈতিক-আন্দোলন, পরোপকারীর ত্যাগ-স্বীকার-ব্রত, ভগ্নোদ্যম-গৃহীর বিষয় ক্রিয়ায় অনুরাগ বহুল পরিমাণে কার্য্যকারী হয়।

সঙ্গীতের এমনই মহিমা যে, ইহা শ্রবণে পুত্র-শোকাতুরা অভাগিনী-জননী পুত্র-শোক বিস্মৃত হন, বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত সংসার-কীটের অশান্তি-ময় মনে ক্ষণকালের জন্যও শান্তি-বারি সিঞ্চিত হইতে থাকে, মহাপাষণ্ডের হৃদয়ও বিচলিত হয়। বিরহ বিধুরা বিরহিণী ইহাতে আশ্বস্ত হন, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপপূর্ণ দীন হীন, মহা বিপন্ন এবং আর্ত্ত জনও ক্ষণকালের জন্য ইহাতে শান্তি-সুখ লাভ করেন। পুণ্যবান, পাপী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভোগী, রোগী, বলবান, দুর্ব্বল, সুখী, দুঃখী—এ বিশ্ব সংসারে এমন হতভাগ্য কে আছে, সঙ্গীতে যাহার প্রাণ বিগলিত না করে? ভক্ত, দার্শনিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, বিশ্ব-প্রেমিক অথবা নর-পাষণ্ড পিশাচ-অবতার—এ অনন্ত জগতে এমন কে আছে, সঙ্গীতে যাহার মন দ্রবীভূত করিয়া না দেয়? তাই বলিতেছিলাম যে, সঙ্গীত কল্পতরু,—যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহারই সেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। এ অমূল্য রসাস্বাদনে যিনি একেবারে বঞ্চিত, তিনি হতভাগ্য—তিনি আপামর জন সাধারণের কৃপার পাত্র!

সকলের কণ্ঠস্বর মধুর নয়—সত্য, সকলের তান লয়—রাগ রাগিনীর বিচার করিবার ক্ষমতা নাই—স্বীকার করি, কিন্তু অল্পাধিক পরিমাণে সংগীতের সাধনা করে না কে? তাই বলিতেছিলাম, অতি সহজে চিত্তাকর্ষণ ও হৃদয় দ্রবীভূত করিবার পক্ষে এমন উপাদেয় সামগ্রী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

সঙ্গীতের গভীর উদাত্ত-ভাব সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া থাকে। ইহার আর একটি অলৌকিক মাধুর্য্য এই যে, যাহার স্বর যতই শ্রুতি-কটুকর হউক না, তাহার নিজের নিকট সে অবিশুদ্ধ গান ভাল লাগিবেই,—সে অসম্পূর্ণ তান লয় তাহার নিজের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিবেই! ইহাতে বিধাতার একটি

অপূর্ব্ব কৌশল ও অচিন্ত্য সৃষ্টি-রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যাহার এ হেন দুর্ল্লভ বস্তু—সংগীত বিদ্যায় নিজের একটুকুও অধিকার নাই—অথবা অন্যে মধুর কণ্ঠে গান করিলেও বিরক্তি বোধ করে, তাহার তুল্য নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিহীন-ব্যক্তি জগতীতলে আর নাই. পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কার্য্যই নাই, তাহাকে জন্মাবচ্ছিন্নেও বিশ্বাস করিও না। মহাকবি সেক্ষপিয়রও কহিয়াছেন,—

"The man that hath no music in himself
Nor is not moved with the concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils ;
The motions of his spirits are dull as night
And his affections dark as Erebus ;
Let no such a man be trusted."

Merchant of Venice. Act. V. Sc. I.

"সুরঃ ব্রহ্ম" কথাটি অতি সত্য। সুতরাং সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ সাধনা ও ধ্যান ধারণা চাই। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ঈশ্বরের আরাধনা ও সঙ্গীতের সাধনায় বড় বেশী পার্থক্য নাই। সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, স্বতন্ত্র ঈশ্বর সাধনা করিবার আবশ্যক করে না। একাধারে যাহাতে এত সৌন্দর্য্য, এত প্রেম, এত মাধুর্য্য, এত কমনীয়তা, তাহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

সঙ্গীত অর্থে যে কেবলই গানকে বুঝায়, এমন নয়। গান, বাদ্য, নৃত্য, অভিনয়—এ সমস্তই সঙ্গীতের অবর্ব্বিষ্ট ; সকলেই এক তানে পরস্পর সম্বদ্ধ ; যাহার প্রাণে যে ভাবের উদয় হয়, তিনি তাহারই সাধক। সঙ্গীত ভাবময়—আবেগময়—উচ্ছ্বাসময়। ভাব-ই ইহার প্রাণ। ভাবরূপ অব্যক্ত—অনন্ত-সৌন্দর্য্য ইহার স্তরে স্তরে মিশ্রিত! নর-চক্ষে সচরাচর সে ভাব দৃষ্ট হয় না,—মানুষের হৃদয়-দর্পণে যখন তখন সে ভাবের প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয় না। সঙ্গীতের এ গভীর উদাত্ত-ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন—এক

দিন—মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ অবতার,—আর পাঠকের প্রায় চক্ষের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন বলিলেও হয়—বুঝিয়াছিলেন, কবি রামপ্রসাদ—সাধক রামপ্রসাদ। শ্রীচৈতন্য দেবের সে প্রাণারাম মধুর হরিনাম—সে গগণভেদী উচ্চ সংকীর্ত্তন—সে মর্ম্মস্পর্শী গভীর রোলপূর্ণ হরিধ্বনি যেমন সহজে মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছে এবং আবাহন কাল পর্য্যন্তও করিবে, তেমন কি আর কিছুতে মোহান্ধ-জীবের প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিবে ?—না সাধক-প্রবর সংসার-যোগী রামপ্রসাদের সে লক্ষ সুধার আকর স্বরূপ—"মা—মা" শব্দ পরিপূরিত সুগভীর অতলস্পর্শ ভাবময় সঙ্গীত অপেক্ষা আর কিছুতে—মানুষ ত দূরের কথা—জড় প্রকৃতিরও অলঙ্ঘনীয় গতি রোধ করিবে ? এই ত সঙ্গীত—এই ত সাধনা ! আর যে দিন জীবের কল্যাণার্থ পতিত পাবনী ভাগীরথীর পূত-বারি সৃষ্টি করাইবার অভিপ্রায়ে সর্ব্ব শুভঙ্কর দেবাদিদেব মহাদেব অন্যান্য দেবগণ সমভিব্যাহারে ভগবান্ বিষ্ণু সমীপে শঙ্খ, ডম্বরু ও শিঙ্গার গভীর রোলে দিগ্মণ্ডল কাঁপাইয়া—সঙ্গীতারাধনায় তাঁহার স্তব স্তুতি সহকারে তদীয় শ্রীপাদ-পদ্ম হইতে পুণ্যময়ী গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি করতঃ পাপ মর-লোকের উদ্ধার-পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পাঠক, সে শুভ দিনের কথা স্মরণ কর! চরমোৎকর্ষ সঙ্গীতের কি সুন্দর পরিণাম! কি অপূর্ব্ব মহিমা!! কি অলৌকিক শক্তি!!! কিন্তু হায়, উপস্থিত যুগ-ধর্ম্মের ভীষণ প্রকোপে পড়িয়া ঈদৃশ সুদুর্লভ স্বর্গীয় বস্তু দিন দিনই কি পাপ-পঙ্কিলময় গভীর নীরয়-কূপে নিমজ্জিত হইতেছে! *

সাধন ও সাধক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় শ্রীচৈতন্যদেব বা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ অবতার।—"কে প্রেমিক এলি রে এ নদীয়ায়, প্রেমে করিলি পাগল নর নারীরে সবায়!" এ মহাত্মার

* ইতিপূর্ব্বে এ প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক "ক্রীড়া ও কৌতুকে" প্রকাশিত হইয়াছিল। জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুর অনুরোধে পুনর্ব্বার কর্ণধারে প্রকাশ করিলাম। ক—স।

সংক্ষিপ্ত-জীবনী হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন; সুতরাং তাহা লিখিয়া আর পুথি বাড়াইবার আবশ্যক নাই। "হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!" সদাই যাঁর এই ধ্যান—এই জ্ঞান,—তর্ক নাই—বিচার নাই—মীমাংসা নাই—প্রাণ চায়—তাই হরি বলি—এই যাঁর মূল মন্ত্র, তাঁ'র মত প্রেমিক, ভক্ত ও বিশ্বাসী-হৃদয় জগতে আর কে আছে? এমন অপূর্ব্ব প্রেম ও জীবন্ত বিশ্বাসের অধিকারী পৃথিবীতে আর কে হইয়াছে? ধন্য শ্রীচৈতন্য দেব,—ধন্য নবদ্বীপ—আর ধন্য 'কলির মানুষ!' এ বিশুষ্ক বিজ্ঞান চর্চ্চা ও নীরস-সাহিত্য আলোচনার দিনে—এ অনাচার-প্লাবিত ভারতের এ গভীর সমস্যা-পূর্ণ দিনে—এ মহা পাপপূর্ণ ঘোর কলিযুগে জীবের 'হরি' বিনা আর কি অবলম্বন আছে? জাতি—বর্ণ—অন্ন বিচার নাই, "যে প্রেম চায়—তারে দিই।" কিছুই জানিনা—কিছুই বুঝি না, যে 'হরি' বলে—তারি হই! কি সুন্দর ভাব—কি অলৌকিক দৃশ্য—কি প্রাণারাম সাধনা! এরূপ গভীর উদাত্ত প্রেম ও জীবন্ত বিশ্বাস আমরা ধর্ম্ম রাজ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাই। নশ্বর দেহত্যাগ সময়ে যখন তিনি নৈশ প্রকৃতির লীলাময়ী দৃশ্যে মোহিত হইয়া জোৎস্নাময়ী ফুল্ল রজনীতে—ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলিমাময় ব্যোম-পথে সুবিমল চন্দ্রমা—নিম্নে সুদৃশ্য হ্রদ সলিলে সেই চাঁদের ছায়া দেখিয়া অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হরিময় দর্শনান্তর প্রেম ভক্তির পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বিহ্বল চিত্তে "আমার হরি আর কোথায়? এই-ই আমার হরি!" বলিয়া হ্রদে ঝাঁপ দেন, স্মরণ করিতে ভক্তিরসে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়, মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া আইসে। জনশ্রুতি অন্যরূপ হইলেও, আমাদের বিশ্বাস, শ্রীচৈতন্যদেব ভাবের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্য-লীলা অতীব মনোহর ও লোক-বিস্ময়কর। ভাবী জীবনে যিনি পৃথিবীর একজন মহৎ ব্যক্তি হন, শৈশবকালেই তাঁহার সে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবেই। এ মহাত্মার বাল্য জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার অবতারণা শুনা যায়, তাহা অবিশ্বাসকরা স্থূল-বুদ্ধির পরিচয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আস্থাবান্ হিন্দু ও ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উল্লেখ করেন।

তারপর স্বর্গীয় রামপ্রসাদ।—কবি রামপ্রসাদ—সাধক রামপ্রসাদ! ইহা-পেক্ষা তোমায় আর অধিক বিশেষণ দিতে পারি না—কারণ তুমি পাঠকের প্রায় চক্ষের উপর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি কোন দেবতার অবতারও নও—কিম্বা পৃথিবীর মানুষের উদ্ধারের জন্য 'ধ্বজা'ও উড়াও নাই। সকলেই জানে—তুমি একজন মানুষ,—কবি—বড় জোর সাধক; কিন্তু আমরা তোমাকে দেবতা সম্বোধন করিব। তুমি এখন স্বর্গে থাক—আর যে খানেই থাক, আমরা তোমাকে বলিব,—তুমি দেবতা,—মানুষবেশে কিছু দিন এ পাপ সংসারে আসিয়াছিলে মাত্র। তা' যদি না হইবে, তবে তোমার অনন্ত সুধার খণি "মা—মা" শব্দ পরিপূরিত গানে বনের পশুও বশ হয় কেন? এমন ভক্তিপূর্ণ সুর তুমি কোথা হইতে সৃষ্টি করিলে? এমন সাদা কথা—সরল ভাব—মর্ম্মস্পর্শী প্রাণ-ভুলান—মন-গলান সরস কথা তুমি কোথায় পাইলে? তোমার সাধনায় আড়ম্বর নাই—পরিশ্রম নাই—কোন 'যোগ যাগ'ও নাই! অথচ তুমি একি অপূর্ব্ব সাধন-প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছ? তুমি এই সবে মাত্র মানুষের দৃষ্টি পথের অন্তরাল হইয়াছ, তাই লোকে তোমাকে চিনিতেছে না; কিন্তু কালে এমন দিন আসিবে, যে দিন তোমার নামও সাধক শ্রেণীর শীর্ষস্থানের মধ্যে পরিগণিত হইবে। তোমার গানের প্রত্যেক পুক্তি যেন এক একটি সুধার খণি, প্রত্যেক পদ গুলিই যেন হৃদয়ের অন্ত-স্থল স্পর্শ করে। ইহাতেই তোমার অদ্ভুত সাধনা উপলব্ধি হয়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত হালিসহর গ্রাম এই মহাপ্রভুর জন্মে পবিত্র হয়। রামপ্রসাদ দরিদ্র; মনিবের বাটীতে চাকরি করিতে গিয়া জমা খরচের খাতায় প্রথম গান রচনা করিলেন,—"দে মা আমায় তবিল-দারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি!" তাঁহার গান অসংখ্য, সে পরিচয় পাঠক মাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন। তাঁহার মৃত্যু, রোগে হয় নাই—ভাবে হইয়াছিল। মহাপুরুষগণ পূর্ব্ব হইতেই ভাবী ঘটনা জানিতে পারেন; আর তাঁহাদের মধ্যে এমন একটি জিনিস পাওয়া যায়, যাহা সংসারের সাধারণ মানুষের মধ্যে মিলে না; তাঁহারা যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না, সেই সময়ের জন্যও তাঁহারা সর্ব্ব প্রধান হইবেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ "রাখাল

বেশেও রাজা!" অন্যান্য লক্ষণ গুলির মধ্যে বিশেষ এই দুইটি লক্ষণ প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে।

পাঠক, আধার আধেয় কি, এতক্ষণে বুঝিলে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দুয়ের মধ্যে এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে,—যেন এ ওকে টানে—সে তাকে টানে। আমরা সংসার-কীট, তাই প্রতিনিয়ত নরক-পথেই ছুটিতেছি,—তাহারই মোহিনী প্রলোভনে আকৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু উল্লিখিত সাধক চতুষ্টয় নাকি ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্ম-প্রাণ ছিলেন, তাই জীবনের অতি অল্পকাল মধ্যেই সংসারের লীলা খেলা শেষ করিয়া সেই স্বর্গ-পথেরই পথিক হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম রাজ্যের রাজা, বিশ্বব্যাপী 'আধার' ভাবেই যেন সেই 'আধেয়' বস্তুকে আকর্ষণ করিলেন। "যাহার জন্য যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট, কোন না কোন সময়ে সেই বস্তু যেন আপনা হইতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে" কথাটি বড়ই সত্য। আমাদের আলোচ্য সাধক চতুষ্টয়ও যেন দুই চারি দিন সংসারের ধুলা খেলা করিয়া অতি অল্প দিন মধ্যেই আপন লক্ষ্য স্থানে উপনীত হইলেন। কৃপাময়ী মা যেন ক্রীড়া-ক্লান্ত পিপাসু শিশুকে স্তন পান করাইবার অভিপ্রায়ে আকুল প্রাণে আপন শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, পুত্রও যেন সুস্থ হইল।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী 'আধার' রূপী রত্ন—পূর্ণ ও অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও অন্বেষণ প্রত্যাশী নন, তাঁহাকে কর্ণধার করিয়া এ বিশাল ভবার্ণবে অবগাহন পূর্ব্বক যিনি সুদৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে মণি মুক্তা অন্বেষণ করেন, তিনি তাহাতে সফল কাম হন, আর অব্যবস্থ-চিত্ত, অসহিষ্ণু ও সন্তরণে অক্ষম হইলে তাহার ভাগ্যে হলাহল ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব সাধক-ডুবুরি ভাল হওয়া চাই।

বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য ও রামপ্রসাদ-এ চারি জনই নাকি ভাল ডুবুরি, তাই সহজেই ব্রহ্মপদ-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন উপায়ে—বিভিন্ন পথে হইলেও কার্য্য কালে কিন্তু সেই একই—পূর্ব্ব লিখিত বিভিন্ন বেগবতী নদীর ন্যায় —সেই একই ব্রহ্মপদ-সাগরে মিলিত হইয়া তাহাতেই লীন হইয়াছিলেন।

আমরা উল্লিখিত সাধক চতুষ্টয়ের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের সাধন প্রণালী জনৈক ধর্ম্মশীল মহাত্মার সহবাসে শিক্ষা পাইয়া যথাসাধ্য

আলোচনা করিলাম; কালে ইঁহাদের সম্পূর্ণ জীবনী, সাধন-বৈচিত্র্য ও চারি আশ্রম সম্বন্ধে মন্তব্য এবং তন্নিদর্শন স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল।

আধ্যাত্মিক কৌতুক।

সাগর হইতে আসি' মরুভূমি মাঝে পশি
তৃষিত-পরাণে খুঁজি শীতল সলিল;
ত্যেয়াগিয়া উপবন করি পাষাণ খনন
দেখি যদি পাই তাহে বায়ু সুবিমল!
মুদিয়া দুইটি আঁখি আঁধার ঘরেতে দেখি
কোথায় রয়েছে মোর লুকান রতন;
ভক্তি-পথ উপেক্ষিয়া বিজ্ঞানের সাথে গিয়া
অজ্ঞানে ডুবিয়া করি ব্রহ্ম নিরূপণ,—
দেখ দেখি কৌতুক কেমন!

শ্রীশশিশেখরেশ্বর রায়।

সাহিত্য-সংবাদ।

নিরাশ প্রণয়। "মহাপ্রস্থান" ও "মোহিনী-প্রতিমা বা সরলা" রচয়িতা প্রণীত এবং বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ১৷৷০ টাকা। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। কৌলিন্য প্রথার বিষময় চিত্র প্রতিফলিত করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য না হইলেও মোটের উপর চিত্রটি মন্দ নয়। গল্পটি ভাল, গ্রন্থের ভাষাও সরল। তবে উপন্যাসের প্রাণ—চরিত্র গঠনে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং গল্পের সুদীর্ঘতা নিবন্ধন সকল স্থলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। বর্ণনার অত্যাধিক্যে এক এক স্থান

বড়ই নীরস ও সৌন্দর্য্যহীন হইয়াছে, পাঠ করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। আর ইংরাজী-গন্ধ-পূর্ণ প্রণয় ভালবাসার আমরা বড় একটা পক্ষপাতী নহি। গ্রন্থকার যদি আধুনিক হিন্দুপরিবারের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেন, তবে তাহাতে অনেক উপকার আসিত। আমরা নবীন গ্রন্থকারের নিকট হইতে কাল্পনিক ও Ideal উপন্যাস উপহার পাইতে অভিলাষী নহি। সে আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করিতে, মানব-হৃদয়জ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র সদৃশ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরই শোভা পায়—আর তাহার পরিণামও শুভপ্রদ হইয়া থাকে। তবে গ্রন্থকারের হৃদয় আছে, তিনি আপনি কাঁদিতে জানেন—অপরকে কাঁদাইতে জানেন। আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। যত্ন ও অধ্যবসায় বরাবর সমভাবে থাকিলে, কালে গ্রন্থকার একজন সুলেখক মধ্যে গণ্য হইতে পারিবেন।

জ্যোতি-প্রকাশ। দীনজন-সমিতি হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। কয়েকটি ধর্ম্মভাবপূর্ণ প্রবন্ধ অবলম্বনে ইহা বিরচিত। গ্রন্থকারের সাধু-উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি তত পরিপক্ক নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আছে, কিন্তু চিন্তাশীলতা ও ভাবের গভীরত্ব নাই। ধর্ম্ম-বিশ্বাস বরাবর সমভাবে থাকিলে, পরিণামে মঙ্গলের সম্ভাবনা। ভাষার উচ্ছ্বাস বেশ আছে, তবে লেখার বাঁধুনি নাই,—হাত এখনও কাঁচা। যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে, ভবিষ্যতে গ্রন্থকার এক জন সুলেখক হইবেন, আশা করা যায়।

পাণ্ডব-বিলাপ কাব্য। শ্রীযুক্ত হরিপদ কোঁয়ার প্রণীত। বিনা মূল্যে বিতরিত। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ইহা বিরচিত। ভাষার পরিপুষ্টি অভাব ও অলঙ্কার হীনতা দোষ থাকিলেও মোটের উপর এ ক্ষুদ্র কাব্যখানি মন্দ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে বর্ণনা ও ভাবের মাধুর্য্য আছে। গ্রন্থকারের বয়স অল্প; উৎসাহ পাইবার যোগ্য। তবে তিনি এখন গ্রন্থকার হইতে প্রয়াস না করিয়া আরও শিক্ষা লাভ করুন,—তাহা হইলে পরিণামে একজন সুলেখক মধ্যে গণ্য হইতে পারিবেন।

বিষাদ। (বিয়োগান্ত নাটক) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বারান্তরে সমালোচ্য। অন্যান্য গ্রন্থ গুলির সমালোচনাও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয় বৎসর, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ও বৈশাখ, ১২৯৫-৯৬।

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১।	করমেতি বাই	...	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব	... ৯৭
২।	শিশু-যোগী	(পদ্য)	শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র পাল	... ১০১
৩।	মনুষ্যত্ব	পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে	... ১১০
৪।	সংসার-আশ্রম (উপন্যাস)		সম্পাদক	... ১১৯
৫।	সংসার না দর্পণ ? ...		শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র সেঠ বি, এ,	... ১২৬
৬।	আমেরিকায় অবস্থান		শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি, এল,	১৩১
৭।	দু' দিন ...		শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী	... ১৩৬
৮।	স্বপ্ন দর্শন—কলিকাতা		শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ দত্ত	... ১৩৮
৯।	বিবিধ প্রসঙ্গ ...		সম্পাদক	... ১৪১

জনৈক মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ভূপতি মহোদয়ের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,

১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান শাখা তত্ত্ব প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমাদের শেষ নিবেদন।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় সংখ্যা 'কর্ণধার' নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এ দীর্ঘ কালের মধ্যে এখনও অনেক পরিচিত গ্রাহক ইহার যৎ সামান্য মূল্যটি দেন নাই। বারংবার অঙ্গীকার ভঙ্গ হইলে আমরাও সুতরাং বাধ্য হইয়া কাগজ বন্দ করিব। অতএব এইবার চূড়ান্ত নিবেদন, এ দুই সংখ্যা কর্ণধার প্রাপ্তি মাত্রই যাঁহারা টাকা না দিবেন, কি পুরাতন—কি নূতন—কি 'বীণার' গ্রাহক, সকলকেই আমরা আগামী সংখ্যা হইতে কাগজ বন্দ করিব। এবার কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কর্ণধার প্রকাশে কিছু বিলম্ব হওয়ায়, গত চৈত্র ও বৈশাখের সংখ্যা একত্র বাহির হইল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, কর্ণধার প্রকাশক।

অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ।

নূতন ধরণের উপন্যাস! সমাজ-চিত্র!

চিন্তাশীল লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। মূল্য ॥০ আট আনা। সমগ্র সংবাদ পত্রে বিশেষ রূপে প্রশংসিত।

দাদা ও আমি।

নূতন নাটিকা! নূতন নাটিকা!! নিউ ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অভিনীত।

সুপ্রসিদ্ধ 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' রচয়িতা প্রণীত। সমগ্র সংবাদ পত্রে বিশেষ প্রশংসিত, মূল্য ১৵০ মাত্র। শরৎসরোজিনী, ১৵০ ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী ১৲ টাকা। তিন খানি একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত

'শঙ্কর বিজয়' (ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জীবনী, ধর্ম্মপ্রাণ নাটক) ১৲ টাকা, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক' ৵০ আনা। 'ভক্তি ফুল' (কবিতা ও গান), 'সংসার-আশ্রম' (গার্হস্থ উপন্যাস), 'জীবন-যোগ' (বিবিধ প্রবন্ধ) ও 'আনন্দ মিলন' (ভক্তিপ্রাণ নাটক)—শেষোক্ত চারি খানি পুস্তক যন্ত্রস্থ, ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরী ও ১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কর্ণধার আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, কর্ণধার কার্য্যাধ্যক্ষ।

করমেতি বাই।

ভগবদ্ভক্তি যাহার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করে, সংসারাসক্তি তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধন, জন, রূপ, যৌবন কিছুরই প্রতি তার দৃষ্টি থাকে না। সংসারের সুখ দুঃখ তার কাছে তুল্য। ফল কথা, অন্তরেন্দ্রিয় নিচয় যতই ভগবানের প্রেম-রসে সিক্ত হইতে থাকে, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল ততই নিশ্চেষ্ট হয়। যখন বাহ্যেন্দ্রিয় নিচয় একেবারেই নিশ্চেষ্ট হয়—যখন সংসারের সুখ দুঃখ প্রভৃতির জ্ঞান একেবারেই লুপ্ত হয়, তখনই অন্তরেন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। ইহারই নাম যোগ।

যেমন এক আকাশ অনন্ত—অসীম, কিন্তু ঘটের মধ্যে আসিলে তাহাই আবার সসীম হইল, তেমনি এক অনাদি, অনন্ত, অসীম পরমাত্মা অংশে অংশে পৃথিবীর সমস্ত জীবাদিতে সসীম হইয়া আছেন। মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি, সকলেরি সীমা আছে; মানবের হৃদয়েরও সীমা আছে। যেমন ঘটের আকাশ, তেমনি মানব হৃদয়ে পরমাত্মাও সসীম। মানবের সসীম হৃদয়ে অসীম পরমাত্মার ধারণা করিতে গেলে আগে মানব হৃদয়ের সীমা বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন। যেমন ঘটের মুখের তারতম্য বশতঃ বহিরাকাশের সহিত ঘটস্থ আকাশের সংযোগের তারতম্য দেখা যায়, তেমনি মানব হৃদয়ের সাধনা রূপ মুখের তারতম্যানুসারে অন্তরস্থ পরমাত্মার অংশ অসীম পরমাত্মার সহিত অল্লাধিক যুক্ত হন।

মানব হৃদয়ের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে হইলে, এ জগতে সজীব নির্জীব যত হৃদয় আছে, সকল হৃদয়ের একত্র মিলন আবশ্যক। সমস্ত হৃদয়ের সমষ্টিতে যে হৃদয় হইবে, তাহাতেও অসীম পরমাত্মার স্থান সঙ্কুলন হইবে না। ফল কথা, যেমন ঘটের মধ্যস্থিত আকাশের সহিত বহিরাকাশ সম্পূর্ণ রূপে সংযোগ করিতে হইলে ঘটের অস্তিত্ব লোপ করা প্রয়োজন, তেমনি মানব হৃদয়ে পরমাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিতে হইলে হৃদয়ের অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে। অর্থাৎ সংসারের সুখ দুঃখাদি সমস্ত বোধাবোধ একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।

এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে একেবারে ভগবানে তন্ময়ত্ব ভাবের চেষ্টা করিতে হইবে। সেই ধ্যান—সেই চিন্তা ব্যতীত অন্য সমুদায় ভাবনা একেবারে ত্যাগ করাই ইহার প্রশস্ত উপায়। ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। "করমেতি বাই"এর জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ "করমেতি বাই" নামে কেহ পৃথিবীতে ছিলেন কি না, সে তর্ক আমরা করিব না। যখন সেক্ষপীয়র, হোমার প্রভৃতির অস্তিত্ব লইয়াও লোকে তর্ক করে, তখন তর্ক করা যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা তর্ক করুন। আমরা বলি—

"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, খজেল নামক স্থানে পরশুরাম নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সেই প্রদেশের রাজ-পুরোহিত। তাঁহার একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। ঐ কন্যাই করমেতি। করমেতি বাল্যেই বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু বালিকা বলিয়া তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে লইয়া যান নাই। তিনি পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার পিতা যে সম্পত্তিশালী, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না তিনি রাজ-পুরোহিত। তাঁহার শ্বশুর আবার তাঁহাপেক্ষাও ধনী। তিনি একজন জমিদার।

করমেতি শৈশব হইতেই হরিভক্তি পরায়ণা হইয়াছিলেন। ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ, চন্দ্রহাস প্রভৃতির ন্যায় দিবানিশি শ্রীহরির চরণ চিন্তায় কাল যাপন করিতেন। হরি কথা ব্যতীত অন্য কথা প্রায় তাঁহার মুখে শুনা যাইত না। করমেতির এত শৈশবে বিবাহ হইয়াছিল যে, তিনি স্বামীকে চিনিতেন না—জগত স্বামীকেই হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য করিয়াছিলেন। হৃদয়ে—শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি এরূপ ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি নির্জ্জনে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইতেন;—কখন হাসিতেন—কখন বা পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেন। কিন্তু মানব হৃদয়ে নাকি অসীম ব্রহ্মের সম্পূর্ণ সত্বার উপলব্ধি অসম্ভব—এই জন্য যখন তিনি হৃদয়ের কৃষ্ণধন হারা হইতেন, তখন কাঁদিতেন, আর "কোথা কৃষ্ণ—কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতেন; লোকে মনে করিত, করমেতি পাগল। কিন্তু তাহারা নিজেই যে পাগল, সে কথা একবার ও ভাবিত না।

ক্রমে করমেতির বয়স বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন লোকে ভাবিল, শ্বশুরালয়ে না গেলে তাহার এ রোগ সারিবে না।

ক্রমে তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। করমেতি শুনিলেন, যাহাতে তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" করিয়া আর বেড়াইতে না পান, সেই জন্য তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার উদ্যোগ হইতেছে। শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। তখন করমেতি ভাবিলেন, কি করি,—কোথায় যাই। কোথায় গেলে নির্ব্বিবাদে প্রাণ ভরিয়া আমার কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমামৃত পান দ্বারা মানস চকোরকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি। অবশেষে স্থির করিলেন, পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করাই শ্রেয়। যুবতী কামিনী, কখন গৃহের বাহির হন নাই,—কোথায় বৃন্দাবন? কোন দিকে? কে লইয়া যাইবে? এ সমস্ত কিছুই ভাবিলেন না। সে চিন্তা তিলেকের তরে তাঁহার মনে উদয় হইল না। শুধু স্থির করিলেন, দিনের বেলা যাইবার চেষ্টা করিলে কেহ তাঁহাকে যাইতে দিবে না, অতএব রজনীতে গোপনে পলায়ন করিতে হইবে।

রাত্রিকালে, যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, করমেতি পলায়নে কৃত নিশ্চয় হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু হা ভাগ্য! বর্হিদেশ হইতে দ্বার বন্ধ, বাটীর বাহির হইবার উপায় নাই।

কিন্তু করমেতি গৃহত্যাগে কৃত নিশ্চয়। গৃহের ছাদে উঠিলেন। ছাদ হইতে লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়িলেন। যে হরির কৃপায় তাঁহার ভক্ত—অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই, পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইয়াও চূর্ণীত হয় নাই, সেই হরির কৃপায় করমেতির অঙ্গে কিছু মাত্র আঘাত লাগিল না—বিন্দু মাত্রও বেদনা হইল না। করমেতি এক দিকে চলিলেন। ভক্ত বৎসল ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া গন্তব্য-পথ দেখাইতে লাগিলেন।

ক্রমে প্রভাত হইল। করমেতি গৃহে নাই,—চারিদিকে সন্ধান হইতে লাগিল। রাজ-গুরু-কন্যা! তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য—লোকের অভাব নাই।

এ দিকে অবলা করমেতি লোকালয় ত্যাগ করিয়া এক মাঠে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, বহু সংখ্যক লোক উৎগ্রীব

ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারই অনুসন্ধানে আসিতেছে। তৃণ শূন্য প্রান্তরে লুকাইবার স্থান নাই। করমেতি নিরুপায়। এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে একটি গলিত শব-দেহ, তাহার উদর গলিত ও স্ফীত হইয়াছে। করমেতি সেই গলিত শবের উদর মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।

এদিকে লোকজন চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া চলিয়া গেলে, করমেতি অনুসন্ধান ভয়ে তিন দিন অনাহারে সেই শব-দেহ মধ্যে বাস করিয়া অবশেষে বহু কষ্টে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন।

বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে অতুল আনন্দ জন্মিল। তিনি ব্রহ্মকুণ্ড তীরে নির্জ্জন বন মধ্যে একান্তে বসিয়া হৃদয়-ধনে দৃঢ় রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরমানন্দে হরি-প্রেমামৃত পান করিতে লাগিলেন।

এদিকে পরশুরাম কন্যার জন্য নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। বহু অনুসন্ধানে কন্যার দর্শন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ যখন দেখিলেন, কন্যা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হরি-চরণ ধ্যান করিতেছে, তখন তাঁহার মনে যে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিবার নয়।

বিপ্রবর কন্যার কৃষ্ণ-ভক্তি বিষয়ে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মা, গৃহে চল। আর কেহ তোমার কৃষ্ণ আরাধনার ব্যাঘাৎ করিবে না। মা, তোমা হইতে আমার কুল পবিত্র হইয়াছে। এখন গৃহে আসিয়া আমার গৃহ পবিত্র কর।"

যোগ-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া করমেতি বলিলেন, "পিতঃ, আমার আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা নাই। তোমার যে কন্যা, সে শ্যামসুন্দর-সিন্ধুতে ডুবিয়াছে, পিতঃ, আর তার দেখা পাইবে না, এখন গৃহে যাও। গৃহে গিয়া কৃষ্ণ আরাধনায় মনোনিবেশ কর। ঐহিক ও পরমার্থিক সুখ লাভের এমত উপায় আর নাই!"

বিপ্রবর কিছুতে ফিরাইতে না পারিয়া অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে আগমন করিলেন। রাজা সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক করমেতির জন্য এক মনোহর আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। করমেতির সেই আবাস আজিও বর্ত্তমান আছে। শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

শিশু যোগী।

(১)

আঁধারে নিশি আজ হ'য়েছে নিমগন,
ছেয়েছে নভ দেশ জলদে অগনন;
স্তবধ চারিদিক নড়ে না তরু লতা,
সমীরে ডেকে কাছে কয়না কেউ কথা;
চপলা মেঘ কোলে চমকে থেকে থেকে,
কি যেন ভীতি-রেখা আঁধারে যায় রেখে।
হেরিয়ে আলো ছায়া কাঁপিল বন কায়া,
কাঁপিল পাখী সব তরুর শাখা পরি,
সহসা কোথা যেন বলে কে "হরি হরি!"

(২)

এ ঘোর নিশাভাগে, এ বনে কেরে জাগে!
কে গায় হরি নাম অতুল অনুরাগে!
আজি কে এল হেতা ভকতি ভরা প্রাণে,
কানন কাঁপাইল শ্রীহরি নাম গানে।
জাগিল তরু লতা ফুটিল ফুল কুল;
ছুটিল নিরঝর হরষে কুল কুল।
হরির নাম শুনে সমীর এল ধেয়ে,
শুনায় হরি নাম সবারে গেয়ে গেয়ে।
কলিকা হরিনামে খুলিল কচি প্রাণ,
হৃদয় বিদারিয়ে করিল মধু দান।
শ্বাপদ জীব যত সবাই ছুটে এল,
হরির নামে দ্বেষ হিংসাদি ভুলে গেল।
জগৎ হরি ময়, কানন হরি ময়,
মধুর হরি নামে ঘুচিল সব ভয়;

আজি কে এল হেতা, আজি এ ঘোর বনে,
কে হরি নাম গায় আকুল প্রাণ-মনে।
ভাবে আপন ভোলা, কে এলি হরি বোলে,
বল্‌রে হরি—হরি, বল্‌ আপন মনে,
আজি কে হরি নাম গায় আঁধার বনে।
শুনিয়া হরিবোল আইল দেব ঋষি,
আইল বীণা করে, ভাতিল দশ দিশি ;
দেখিল শিশু এক কাঁদিছে হরি ব'লে
কহিল ঋষি তা'রে বড়ই কুতূহলে ;—
"কে তুই শিশু যোগী, কে তুই তরুতলে,
নয়ন ভাসে তোর কেন রে অশ্রু জলে ?
যুড়িয়া কর যুগ, মুদিয়া আঁখি দুটি,
হৃদয়ে দেখি' কা'রে, ধরিতে যাস্‌ ছুটি ?
বসন খানি পড়ে, উলঙ্গ হ'য়ে যাস্‌,
কে তুই নব যোগী কি ব্যথা প্রাণে পাস্‌ ?
আঁধারে কোথা যাবি, এ যে গহন বন,
দাঁড়ারে দাঁড়া শিশু, দাঁড়ারে বাছাধন।
চিনেছি এই বার, চিনেছি আমি তোরে,
বল্‌রে হরি হরি বল্‌ হৃদয় ভোরে ;
সুনীতি-প্রাণ ধন, তুই না ধ্রুব ছেলে !
তুই না এলি হেতা দুঃখিনী মায়ে ফেলে !
শুনিয়া মা'র মুখে শ্রীহরি দয়াময়,
তাই কি হরি পাশে, দুঃখ মোচন আশে,
আইলি বন মাঝে আঁধারে ভুলি' ভয় ;
হেতা কি হরি পাবি, হরি কি হেতা রয় ?"
ঋষিরা কত শত, বরষ শত শত,
ধেয়ানে থেকে রত যে হরি নাহি পায়,
তুই অবোধ ছেলে, তোর কি হরি মেলে।

গৃহে যা' ফিরে ধ্রুব কেন কাঁদাস মায়,
হরি কি 'হেলা ফেলা' যে চায় সেই পায় ?
বদনে হরি বোলে, আয়রে বাহু তুলে,
জড়ায়ে ধর্‌ গলা, যাতনা যাই ভুলে,
প্রাণের মধু তোর, ঢেলে দে প্রাণে মোর
আয়রে ধ্রুব—যোগী ছুটিয়া হৃদে মোর।"

(৩)

মুদিয়াছিল আঁখি হৃদয়ে হরি পেয়ে,
শুনিয়া ঋষি বাণী ধ্রুব দেখিল চেয়ে।
দেখিয়া ঋষিরাজে, ভাবিল হরি তার ;
এসেছে তাঁরি কাছে ঘুচাতে দুঃখ-ভার ;
বলিয়া হরি—হরি, অমনি ধেয়ে যায়,
কেঁদে আকুল ধ্রুব ঋষির পড়ে পায়।
বলে, "কোথায় হরি ছিলে গো এত ক্ষণ,
আমি যে সারা হলুম খুঁজিয়া সব বন ;
আমি একলা ছেলে, এসেছি মায়ে ফেলে,
মায়ের আমি বই কেউ যে নাই আর ;
হরি গো চল চল, কাঁদিছে মা' আমার।
শুনেছি মার মুখে শ্রীহরি দয়াময় ;
শুনেছি হরি নামে বিপদ নাহি রয়,
শুনেছি হরি বিনা ঘুচা'তে দুঃখ-ভার,
দুঃখিনী জননীর কেউ গো নাই আর।
তাই এসেছি রেতে, হরি তোমায় নিতে,
হরি না গেলে আমি কি নিয়ে যা'ব ঘর ;
হরি গো চল চল, হরি হ'ওনা পর।"
নারদ ধ্রুব মুখে শুনিয়া হেন কথা,
নয়নে ধারা বহে, প্রাণে পাইল ব্যথা ;

ধ্রুবকে কোলে তুলি, চুমিয়া চাঁদ মুখ,
কহিল দেব ঋষি হৃদয়ে ভরা দুঃখ।
"এ কচি প্রাণে তোর ধ্রুবরে বল্ বল্,
কে হরি নাম-সুধা ঢালিল নিরমল!
আমি জনমাবধি কত বরষ ধ'রে,
গাইনু হরি নাম হৃদয় প্রাণ ভ'রে;
তবু না হরি পাই হৃদয়ে এক বার,
ধ্রুবরে ধন্য তুই পেলি করুণা তাঁর।
আমারে হরি ভেবে কেন কাঁদিস্ এত!
আমি ত হরি নই আমিও তোর মত;
শ্রীহরি ভেবে ভেবে পাগল প্রাণ মন,
তবুত হরি হৃদে পাই না দরশন।"
শুনিয়া হেন বাণী ধ্রুব আছাড় খেয়ে,
পড়িল ধরাপরে, ঋষি ধরিল যেয়ে;
"তুমিও হরি নও" ধ্রুব তখন বলে—
"হরি আমার তবে কোথা গো গেল চ'লে!
এই হৃদয়ে ছিল কহিতেছিনু কথা,
কোথায় গেল হরি দিয়ে দারুণ ব্যথা!
বল গো বল প্রভু কোথায় হরি পাব,
হরি না পেলে গৃহে কি নিয়ে ফিরে যা'ব।"
নারদ বলে তবে, "ধ্রুবরে আয় আয়,
বৈষ্ণব মন্ত্রে তোরে দীখিত করি আয়,
গুরুকে দিনু ভাগ হরিকে পে'লে তোর।"

(৪)

এতেক কহি ঋষি ধ্রুবকে কোলে তুলি,
স্নান করায়ে দিল পূত সলিলে উলি;
লিখিল হরি নাম ধ্রুবের কোমল কায়,
আঁকিল মন লোভা তিলক মৃত্তিকায়।

সাজিল নব যোগী সাজিল নব সাজে,
দীখিত হ'ল ধ্রুব আজি এ বন মাঝে।
গুরু-আদেশ মতে ধ্রুব মুদিল আঁখি,
হৃদয়ে হরি ভাবে নাভীতে কর রাখি';
দেখে শিশুর এই অপূর্ব্ব প্রাণায়াম
দূরে দেবর্ষি সুখে গায় হরির নাম।

(৫)

আহা কি প্রাণ ভোলা, আহা কি প্রাণারাম,
পেয়েছে ধ্রুব আজ মধুর হরি নাম;
হৃদয়ে হরি পাই' ধ্রুবতে ধ্রুব নাই,
ভুলেছে সব যেন বিশাল চরাচর;
ভুলেছে পিতা মাতা, স্বজন নিজ পর।
অধরে মৃদু মৃদু ফুটিছে মধু হাস,
হাসিতে ভাসে কত সুষমা রাশ্ রাশ্।
ভকতি-সিন্ধু প্রাণে উথলে অবিরত,
হরষ-ধারা বহে নয়নে শত শত।
প্রাণের আঁখি মেলি ধ্রুব তখন চেয়ে
দেখে, হরির নামে হৃদয় গেছে ছেয়ে;—
উঠেছে রবি, শশী, ফুটেছে তারা দল,
ভেসেছে জ্যোৎসনা আবেশে ঢল ঢল;
আঁধারে আলো মিশে, উষাভা আসে ভেসে,
ফুটিছে ফুল ফুল গোপনে প্রাণ খুলে,
সতিকা তরু কোলে জাগিছে দুলে দুলে।
প্রভাত পরকাশ ধ্রুবর প্রাণে আজ,
ভকতি পূর্ণ জ্যোতি ভাতিল প্রাণ মাঝ;
সে জ্যোতি ভেদ করি, উদিল আহা মরি,
কমলা লয়ে বামে, কমল কর ধরি।

ধ্রুব তন্ময় চিত দেখে যুগল রূপ,
ডুবিল হরি ভাবে—উথলে প্রেম কূপ ;
অমনি কোথা হ'তে কে যেন আচম্বিতে
বলিল,—"আয় ধ্রুব, এসেছি তোরে নিতে ;
(আহা) ঘেমেছে চাঁদ মুখ, দেখিয়ে ফাটে বুক,
ধ্রুবরে কোলে আয় বেদনা ভুলে যাই
ধ্রুবরে বল তোর কি মহা ধন চাই।"
হরির প্রেম কূপে ধ্রুবর প্রাণ মন,
ডুবিয়াছিল আহা না জানি কত ক্ষণ ;
ধ্রুব চমকি এবে দেখে সম্মুখে তার
সহস্র রবি করে ফুটেছে চারি ধার ;
সে করে ফুটে ফুল শুষক নাহি হয়,
তাপিত প্রাণ মাঝে শীতল ধারা বয় ;
ধ্রুবের' রবি করে ভাসিল মন প্রাণ,
পাইল প্রেম সুধা পাইল স্নেহ দান।
প্রসারি' বাহু দুটি, কমলা এল ছুটি,
ধ্রুবরে কোলে তুলি মুছায়ে দিল মুখ ;
হরির প্রেম ধারে ধ্রুবর ভাসে বুক।
অনন্ত নভ ছেয়ে উঠিল হরি বোল,
হৃদি গভীর তলে পশিল মহা রোল ;
হরির নাম শুনে জাগিল জড় জীব,
জাগিল ইন্দ্র, চন্দ্র, জাগিল ব্রহ্মা, শিব ;
জাগিল তরু লতা পেয়ে নবীন প্রাণ,
শ্রীহরি প্রেমে আজ ডুবিল ধরা খান।

(৬)

কমলা বলে,—"হরি এই কি দয়া তব,
হরি হে রাখ রাখ বুঝেছি দয়া সব ;
এ হেন কচি ছেলে, এসেছে মায়ে ফেলে,

না জানি কোন্ প্রাণে নিদয় ছিলে তায় ;
হরি হে ধ্রুবে দেখে হৃদয় ফেটে যায়।
আগে জানিলে হরি ধ্রুব এসেছে বনে,
বৈকুণ্ঠ ছাড়ি' তব আসিয়া সেই ক্ষণে ;
ধ্রুবকে শিখাতাম যতনে বুকে করি—
"হরি নিঠুর বড় আর ব'ল না হরি!"

(৭)

ধ্রুব কমলা কোলে অমনি কেঁদে কয়,
"নিঠুর নহে মাগো শ্রীহরি দয়াময় ;
হরির যত দয়া এমন আছে কার,
হরির দয়া রাজ্যে বসতি সবাকার।
হরি জীবের প্রাণ, হরি পাপীর ত্রাণ,
হরিই জীব গতি হরি ব্রহ্মাণ্ড ময়,
সবাতে আছে হরি হরিতে সবে রয় ;
এসেছি হরি হ'তে হরিতে যা'ব পুন,
হরিই আদি অন্ত কি কব হরি গুণ!"

(৮)

কমলা কোলে ধ্রুব কহিয়া হেন বাণী,
ধরিল নেমে এসে হরির পা দু' খানি ;
কহিল,—"দয়াময় ঘুচেছে সব ভয়,
পেয়েছি রাঙা পদ দিব না ছেড়ে আর ;
হরি দাঁড়াও হৃদে দেখি হে এক বার।
কেঁদেছি বনে বনে না জানি কত দিন,
শরীর প্রাণ মন ক্রমে হ'য়েছে ক্ষীণ ;
শুধু তোমার আশে, হরি রেখেছি প্রাণ,
হরি অনাথ আমি, করুণা কর দান।
দাও শ্রীপদ বুকে বেদনা ভুলে যাই,
হরি—হরি হে আজ প্রাণে ধরেনা সুখ,

হরি দাঁড়াও হৃদে ভুলি দারুণ দুঃখ ;
শ্রীপদে দাও স্থান, লও অসার প্রাণ,
চাইনে কিছু আর এ পাপ ধরা মাঝ ;
হরি পুরাও মোর প্রাণের সাধ আজ !"
এত কহিয়া ধ্রুব পড়িল হরি পায়,
হরি কাঁদিয়া বলে, "ধ্রুবরে আয় আয় ;
চাঁদ-বদন আয় চুমিব বাছা ধন,
শীতল হ'বে মোর তাপিত প্রাণ মন ;
যে দিন হ'তে তুই আইলি বন মাঝ,
গোলক ছাড়ি ধ্রুব ভুলিনু সব কায ;
শুনিতে হরি বোল হ'য়ে ব্যকুল মন,
হৃদি কমলে তোর দিনুরে দরশন।
হৃদয় প্রাণ ভোরে, ভকতি দিলি মোরে,
বাঁধিলি প্রেম-ডোরে তুইরে কত বার ;
ধ্রুবরে আজি তোর ঘুচিল দুঃখ ভার।
ব্রহ্মাণ্ড নেরে মোর, নে রে বৈকুণ্ঠ ধাম,
বারেক শুনা ধ্রুব, বারেক হরি নাম ;
যে নামে বায়ু সনে প্রস্থন কয় কথা ;
সেই সে হরি নাম, মধুর প্রাণারাম,
ধ্রুবরে বল্ বল্ ! হরষে ডুবে যাই ;
প্রেম্ দে ধ্রুব মোরে আর না কিছু চাই।
আয়রে প্রেম রাজ্যে, প্রেমে হ'য়ে মগন,
প্রেমের রাজা তোরে করিব বাছা ধন ;
আমি প্রেমের দ্বারী রহিব দ্বারে তোর,
সদা ভাসিব প্রেমে প্রেমে হইব ভোর ;
ভিক্ষা করিব প্রেম,—প্রেম করিবি দান !
প্রেমে বাঁচিবে বিশ্ব, প্রাণ যুড়াবে পাপা,
প্রেমে মজিবে সবে কেহ না রবে তাপী।"

(৯)

এতেক কহি হরি, হেলায়ে শিখী পাখা,
দাঁড়ায় রমা সনে ঈষৎ হ'য়ে বাঁকা ;
অধরে ধরে বাঁশী, খসিয়া পড়ে হাসি,
নয়নে ভাসে প্রেম, ধ্রুব তা নিরখিল ;
সহসা প্রাণ মাঝে কি যেন উথলিল।
কি এক রূপ-জ্যোতি ফুটিল চারি ধার,
ধ্রুব-হৃদয়-নভ চকিল বার বার ;
সে জ্যোতি পেয়ে ধ্রুব হ'ল উন্মাদ পারা,
পড়িল হরি পদে বহিল প্রেম-ধারা ;
গাহিল প্রাণ ভরি মধুর হরি নাম ;—
"হরি পেয়েছি আজ বিলম্ব নাহি সয়
হরি হে রাখ রাখ শ্রীপদে দয়াময় !"

* * * *

ধ্রুবর প্রাণ দীপ নিভেছে বহু দিন,
কিন্তু প্রতিভা তার রহিবে চির দিন।
মধুর হরি নাম পড়িয়া আছে শুধু,
এখনো প্রাণে তাই উথলে কত মধু !
জয় শ্রীহরি জয়, জয় হে সনাতন ;
জয় হে শ্রীগোবিন্দ ভকত-জন-ধন !!

শ্রীরাখালচন্দ্র পাল।

মনুষ্যত্ব।

আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, অমুকের সহিত দেখা হইলে ভাল করিয়া কথা কয় না, গৃহে গেলে এক কলিকা তামাক পর্য্যন্ত দেয় না ; লোকটার একেকালে মান্‌সেতা নাই। কিন্তু অমুকের কেমন মান্‌সেতা, সকলেরই সহিত মিষ্টালাপ করে, গৃহে উপস্থিত হইলে কিছু আহার না করাইয়া ছাড়িয়া দেয় না। যে ব্যক্তি স্বার্থের হানি করিয়া লোকের সহিত মিশে, পরোপকার করিতে সচেষ্ট, সকলকেই সমান চক্ষে দেখে, তাহারই মান্‌সেতা বা মনুষ্যত্ব আছে বলে ; যে কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর, তাহাকে মনুষ্যত্ব হীন বলে। কিন্তু যে সকল গুণ দেখিয়া আমরা মনুষ্যত্বের উপকরণ বলি, সাহেবেরা সে সকলের মধ্যে অনেক গুলিকে অবনতির কারণ মনে করেন। এই জন্য তাঁহারা বিনা কার্য্যে অধিকক্ষণ কাহারও সহিত আলাপ করেন না,—বিনা বেতনে কাহারও কার্য্য করিতে সম্মত হয়েন না ; দরিদ্র বা ভিক্ষুককে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দেখিলে তাঁহারা নিতান্ত বিরক্ত হয়েন ; আমাদের দেশীয় চিকিৎসকগণ যেমন যাহার যেমন অবস্থা—তাহার নিকট হইতে সেইরূপ অর্থ লইয়া চিকিৎসা করেন এবং আত্মীয়, বন্ধু ও দরিদ্রগণের নিকট হইতে কিছুই লয়েন না, সাহেবেরা তাহা না করিয়া সকলেরই নিকট হইতে সমান অর্থ গ্রহণ করেন। অধিকক্ষণ কাহারও বাটীতে অবস্থান করেন না। রোগীর মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলেও ভিজিট লইতে ছাড়েন না। উকীলগণ মক্কেলের কদ্দমা হউক বা না হউক, সে দিনকার ফি লইবেন। মকদ্দমা হারিলেও াহা, জিতিলেও তাহা, আর মকদ্দমা না হইলেও তাহা। সর্ব্বথা তোমার ল হইল কি মন্দ হইল, তাহা আমি দেখিব না। আমি তোমার জন্য কিছু রিক বা মানসিক পরিশ্রম করিলে পূরা ফি লইব। অর্থাৎ তোমার ভাল তে বা তজ্জন্য খাটিতে আমি বাধ্য নই। আমি যখন তোমার জন্য ছি, তখন তোমার উপকার হউক আর না হউক, তুমি ভাল থাক আর তে যাও, তাহা আমার দেখার আবশ্যক নাই—আমার মজুরি য় করিবই। শুধু ইহা নহে, অনেক সময়ে আদৌ না খাটিয়াও তাঁহারা

টাকা লয়েন। অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন উকীল কি বারিষ্টার টাকা লইয়াও অন্যের মকদ্দমা করিয়া থাকেন, অথচ যাঁহার টাকা লইলেন, তাঁহার টাকা ফেরত দিলেন না। সাহেবেরা এইরূপ আরও অনেক কার্য্য করেন। সে সকল দ্বারা কেবল আপনারই লাভ হয়—পরের সমূহ অনিষ্ট হয়। কিন্তু এ সকল কার্য্যে সাহেবদের অমান্‌সেতা হয় না। তাঁহারা বলেন, ভারতবাসীরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াই ঈদৃশ হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই জন্য এক্ষণে আমরা অনেকেই উন্নতি সাধন মানসে ঐ সকল গুণ সম্পন্ন হইবার চেষ্টা করিতেছি! বাঙ্গালী ডাক্তারেরাও রোগীর বাটীতে দু' মিনিট কালও থাকিতে চাহেন না। যিনি যত অল্পক্ষণ ধ্য রোগীর বাটী হইতে উঠিয়া যান, তিনি তত উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়েন। এখন ডাক্তারের সংখ্যা অনেক অধিক হওয়ায়, ওরূপ করিলে আর অন্ন হয় না দেখিয়া, অনেকে সে প্রথা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের দেশের লোকে কিন্তু ঐরূপ গুণ সম্পন্ন লোককে নিতান্ত মনুষ্যত্ব হীন বলে। বাস্তবিক ঐ সকল লোক মনুষ্যত্ব হীন কি না, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক, মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে।

মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, কিরূপে তাহা স্থির হইবে? কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইয়া উহা স্থির করিতে পারা যায়। মনুষ্যের ভাবকেই অবশ্য মনুষ্যত্ব বলে ; সুতরাং যাহাতে মনুষ্যের উপযোগী গুণ আছে, তাহারই মনুষ্যত্ব আছে বলিতে হয়। কেন না, বাহ্যিক আকার জীবগণের প্রধান পরিচায়ক হইলেও কেবল আকৃতি সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নহে। যে জীব যে গুণের জন্য বিশেষ আদৃত, সে গুণ ভাল না থাকিলে কেবল সুন্দর আকৃতি দ্বারা যশস্বী হয় না। যে ঘোটক বেগে চলিতে পারে না, সে অতি সুদর্শন হইলেও লোকের নিকট আদৃত হয় না। ঐরূপ—যে গাভী অধিক দুগ্ধ প্রদান করে না, এবং যে গ ভারবহনে অসমর্থ,—কেহই তাহাদিগকে আদর করে না। কেন না দ্রু গতি—অশ্বের, দুগ্ধ—গাভীর, এবং ভার বহন—গর্দ্দভের প্রধান গুণ। হীন অশ্বকে অনশ্ব, দুগ্ধ হীন গাভীকে অগাভী ও ভারবহনাক্ষম গর্দ্দ অগর্দ্দভ কহা হয়। যে গুণ যে জাতির প্রধান, সেই গুণ অধিক থাকি

তাহাকে উৎকৃষ্ট, ও সেই গুণ অল্প থাকিলে তাহাকে অপকৃষ্ট বলে। তাহাদিগকে তন্নামে অভিহিত করা অনেকের মত নহে। মানবীয় গুণ হীন মনুষ্যগণ অনেক সময়ে অমানব—গর্দ্দভ, গরু প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে সকল মানব মানবীয় গুণে ভূষিত, তাঁহারাই প্রকৃত মানব পদ বাচ্য ও সেই গুণের কার্য্যই মনুষ্যত্ব। যাহাতে মানবীয় গুণ থাকে, তাহার মনুষ্যত্ব আছে, আর যাহাতে তাহার অভাব, তাহার মনুষ্যত্ব নাই বলিতে হয়।

এক্ষণে কথা এই যে, কোন্ গুলি প্রকৃত মানবীয় গুণ, তাহা জানিব কি প্রকারে? মনুষ্য নানাগুণে ভূষিত। সেই সকলের মধ্যে কতকগুলি ভাল—কতক গুলি মন্দ বলিয়া অভিহিত হয়। অর্থাৎ মানবীয় বৃত্তি সকলের মধ্যে অবশ্য কতক গুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি ও কতক গুলি নিকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া অভিহিত হয় বটে, কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলি যদি মানবীয় নহে, অর্থাৎ ঐ গুলি যদি একবারে মানবের ত্যজ্য হয়, তাহা হইলে মানব জগতের অস্তিত্ব থাকে কি? কখনই না। তাহা যদি না হইল, তবে কি প্রকারে সে গুলিকে মানবের অনুপযোগী বলিব! আমাদের বোধ হয়, একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন্ গুলি প্রকৃত মানবীয় গুণ, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা দেখিতে পাই, মানব মধ্যে এমন কতক গুলি বৃত্তি আছে, সে গুলি পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীতেও আছে, এবং আরও এমন কতক গুলি বৃত্তি আছে, যাহা অন্য কোন জীবে নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ; ক্ষুধা, ভয় প্রভৃতি বৃত্তি গুলি মানব ও পশু উভয়েতেই আছে; কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধা, দয়া প্রভৃতি বৃত্তি কেবল মানবেই আছে, অন্য কোনও জীবে নাই। মানব যে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিগণিত হয়, সে কেবল ঐ সকল গুণের জন্য। সে মানব ঐ সকল অর্থাৎ ইতর জীবাতিরিক্ত গুণ সম্পন্ন, তাহারই মনুষ্যত্ব আছে বলিতে হয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে ঐ সকল মানবীয় গুণের উৎকর্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জীব-সাধারণ বৃত্তির দমন না করিলে, ঐ সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা যায় না। স্বার্থের বিঘ্ন না করিলে, আপনাকে ক্ষুদ্র বোধ না করিলে,—দয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না। যে আপনাকে বড় মনে করে, সে কি অন্যকে শ্রদ্ধা

ভক্তি করিতে পারে? যে লোভ সম্বরণ করিতে না পারে, সে কি পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হইতে সক্ষম হয়? কখনই না। পশুবৃত্তি সকলের দমন না করিলে কখনই মানবীয় গুণ সম্পন্ন হইতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া পশু বৃত্তি গুলির এক কালীন ধ্বংস করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি জীব-সাধারণ বা নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল এককালে মানবের অনাবশ্যক হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর কখনই মানবে সে সকল সন্নিবেশিত করিতেন না। শরীর রক্ষা ও বংশ রক্ষার জন্য নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের একান্ত আবশ্যক। আহার না করিলে আদৌ মানুষ বাঁচে না, কাম বৃত্তির এক কালীন ধ্বংস করিলে মানবের অস্তিত্বই থাকে না। এই সকল কারণে কোন বৃত্তিই এককালে পরিত্যজ্য নহে। সকল বৃত্তির কার্য্যই আমাদের আবশ্যক। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের অধিক পরিচালনা বিধেয় নহে; কেন না, নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলি মানবীয় নয়,—এই সকল বৃত্তি সকল জীবেরই আছে। সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির অধিক পরিচালনে যে উন্নতি হয়, সে উন্নতি মানবীয় উন্নতি নহে। যিনি ঐ সকল বৃত্তির সুখ পরিতৃপ্তি করিতে সমর্থ, তাঁহাকে উন্নত বা মনুষ্যত্ব সম্পন্ন বলিতে পারা যায় না। কেন না যিনি মনোমত রূপ-গুণ-সম্পন্না রমণীর সহিত সম্ভোগ সুখে কাল যাপন করেন, ও যিনি আপনার সুখ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নানাবিধ ভোগ্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকে যদি উন্নত—মনুষ্যত্ব সম্পন্ন বলিতে হয়, তাহা হইলে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে কেন উন্নত মনুষ্যত্ব সম্পন্ন বলিব না! কি মনুষ্য, কি ইতর প্রাণী—কাহাকেই যত্ন করিয়া ঐ সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে হয় না। উহারা নিয়তই স্বকার্য্য সাধনেই ব্যতিব্যস্ত। উহাদের দমন করিবার জন্যই অনুশীলনের আবশ্যক। দমন করিতে না পারিলে ঐ সকল বৃত্তি হইতে সকল জীবেরই বহুল অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। মানবীয় গুণ কিন্তু বিশিষ্ট অনুশীলন গুণ ব্যতিরেকে প্রবৃদ্ধ হয় না। মানব উন্নতি শীল ও পৌরুষ সম্পন্ন; সুতরাং পুরুষত্ব প্রকাশ করিতে হইলে তাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি গুলির অনুশীলন ও নিকৃষ্ট বৃত্তির দমন করিতে হইবে। তাহা না হইলে প্রকৃত পক্ষে মানবের কার্য্যই থাকে না। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য কখন মানবীয় চেষ্টা সম্ভূত কার্য্য নহে। ইহা ঐ সকল ইতর

প্রাণীদিগের ন্যায় মানবদিগকে অভীপ্সিত পথে অনুসৃত করিয়া থাকে। অতএব নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলি এরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে মানবীয় বৃত্তি গুলি হীনপ্রভ না হয়। যে পরিমাণ আহার না করিলে জীবন রক্ষা হয় না, সেই পরিমাণ মাত্র আহার করিবে, ভোগ চরিতার্থের জন্য আহার করিবে না। যে পরিমাণ স্ত্রী সম্ভোগ না করিলে সন্তান অভাবে সৃষ্টির লোপ হয়, সেই পরিমাণ মাত্র স্ত্রী সম্ভোগ করিবে,—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না। ঐ রূপ যে পরিমাণ ক্রোধ না করিলে জীবন বা জীবনের প্রয়োজন—সংসার ও মনুষ্যত্ব রক্ষার উপযোগী কার্য্য অসম্পন্ন থাকে, সেই পরিমাণ ক্রোধ করিতে হইবে।

কোন নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হওয়া উচিত নয়। সমস্ত নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলিকে আপনার অধীনে রাখাই মনুষ্যের কার্য্য। তাহা না করিয়া যদি নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলি মানবীয় গুণের অধীন করিয়া রাখে, তাহা হইলে আর মানবের প্রাধান্য থাকিল কৈ? তাহা হইলে পশু গুণের ও পশুরই প্রাধান্য হইল। প্রকৃত মানুষ তাঁহাকে বলিব—যিনি সমস্ত নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলি মানবীয় গুণের অধীন করিয়া সেই সকল দ্বারা মানবকুলের রক্ষা বিধান করেন ও মানবীয় গুণের উৎকর্ষ বিধান করিয়া দেবত্বের পরিচয় দেন। আর সেই মনুষ্যেরই প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে বলিতে হয়।

সুতরাং পাশ্চাত্যগণ যে ভাবে চলেন, তাহা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। তাঁহাদের সকল কার্য্যই পাশব-বৃত্তির বৃদ্ধি কারক। তাঁহাদের মত ...নের ও বলের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি এবং ভোগ সুখই প্রকৃত সুখ। এজন্য তাঁহারা ধনোপার্জ্জনার্থ সকল প্রকার পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। অন্যের ...াভালাভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইলে, আপনার ধনাগমের অল্পতা হয়, ...ই জন্য তাঁহারা ধনোপার্জ্জন ব্যাপারে পরের সুখ দুঃখের প্রতি আদৌ ...পাত করেন না। পাছে অর্জ্জিত অর্থ কমিয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা ... মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী ও পুত্র কন্যাদিগেরও ভরণ পোষণ প্রদানে অনিচ্ছুক ...ক্ষুকদিগের প্রতি এত বিরক্ত। তাঁহাদের অর্জ্জিত অর্থ কেবল ভোগ ...র উপযোগী কার্য্যেই ব্যয়িত হয়। ভোগ-সুখে তাঁহাদের এত আনুরক্তি ...যে, তৎ সাধন মানসে তাঁহারা প্রাণ-প্রতিমা স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করেন। পাছে

দয়িতা মনোমত সুখের উপযোগী না হয়, এই জন্য বিবাহের পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে নির্ব্বাচনে রত হন এবং পরে তাহারা যদি মনোমত সুখ প্রদানে অসমর্থ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। পরের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য ইঁহারা যে সকল পৈশাচিক ব্যবহার করেন, তাহা মনে হইলেও মানব নামে ঘৃণা হয়। শিল্পের উন্নতি নাম দিয়া এমন কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতেছেন যে, সে সকলের সাহায্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশ হইতে পারে। টর্পেডো দ্বারা গোপনে অসংখ্য প্রাণী ও সম্পত্তির বিনাশ করিতেছেন। যে বৈজ্ঞানিক উন্নতি আদি মানবের প্রধান উন্নতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে, সেই বিজ্ঞান যে সকল পদার্থ প্রসব করিতেছে, তৎসমুদয়ই অনিষ্টকর ও অসার। বড় বড় প্রাণনাশক কামান, নানাবিধ মোহিন মদ্য, নানা প্রকার বাহ্য চাকচিক্যশালী অকর্ম্মণ্য বেশ ভূষা, বহুবিধ বাল-প্রলোভনপূর্ণ অকর্ম্মণ্য খেলানা প্রভৃতি আবিস্কারে বিজ্ঞানের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া নিয়ত ধনোপার্জ্জনে ব্যস্ত রহিয়াছেন,—এক মুহূর্ত্ত কাহারও বিশ্রাম নাই। যতপ্রকার নীতিবিরুদ্ধ উপায় আছে, উপার্জ্জনের জন্য সমস্তই এখন ইঁহারা অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রতিদ্বন্দীতা নামে আত্মশ্লাঘা, বিজ্ঞাপন নামে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, যোগ্যতা নামে পরানিষ্ট, হিংসা—সমস্তই এক্ষণে পুরুষত্বের পরিচায়ক হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সকল মহাদোষ বর্ত্তমান সমাজ দোষ বলিয়াই গণ্য করেন না। মানবগণ এই প্রকার অন্যায় পথে বিচরণ করিয়া যে ধনোপার্জ্জন করেন, তাহা কেবল বিলাস সুখেই ব্যয়িত হয়। চাকচিক্যশাল... বেশ বিন্যাস, সুদর্শন গৃহশোভন সামগ্রী, জিহ্বার পরিতৃপ্তিকর নান... বিধ ভোজ্য, আড়ম্বরপূর্ণ গৃহ, বেগবান অশ্ব যুক্ত শকট, রমণীর অঙ্গ-ভূষ... অলঙ্কার ও সুন্দরীগণের নৃত্য গীত শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদের সমস্ত ... ব্যয়িত হয়। ইহারই নাম কি মনুষ্যত্ব—না ইহারই নাম উন্নতি? ইহ... কি আমাদের মনুষ্য ভাবের উন্নতি করিতেছে?—না পশু ভাবেরই প্রা... দিতেছে? হায়, মানবীয় ভাব এখন যাহা কিছু দেখা যায়, তৎস... ফ্যাসানের সহিত জড়িত। দয়ার পাত্র দেখিয়া এখন আর দয়ার ... হয় না,—রাজাদেশই এখন দয়ার কারণ। ভক্তি—পিতা মাতায় ...

গুরুতে নাই, রাজাতে নাই,—স্বেচ্ছাচারী বা নাস্তিকতাবাদ প্রচারকারীদের উপরই যাহা কিছু আছে। ঈশ্বরোপসনা এখন নিত্য করিতে হয় না,—অন্তরেও করিতে হয় না,—নির্দ্দিষ্ট দিনে গির্জ্জা ঘরে বা সমাজ-মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা প্রদান দ্বারা করিতে হয়। এখন্ত সকল যুক্তিরই মূল-সত্য—সুখের বিদ্যমানতা। অর্থাৎ যে কার্য্য করিলে স্বার্থনাশ হইবার সম্ভব, তাহা কখনই কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, ইহা এক্ষণকার যুক্তি মার্গানুসারী পণ্ডিতগণের স্বতঃসিদ্ধ (Axiom); এই যুক্তির আশ্রয় করিয়া এক্ষণে উন্নত সমাজের কর্ত্তব্য নির্ণয় হইয়া থাকে। তাই এক্ষণকার কার্য্য প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু পাঠক, এ কাল ছাড়িয়া একবার সে কালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে, তখনকার সর্ব্ব বিষয়েই কি সুন্দর প্রণালী ছিল। পাছে পরের স্বার্থ নাশ হয়, পাছে কাহারও বৃত্তি নাশ হইবার সম্ভাবনা ঘটে, এই জন্যই পূর্ব্বকালীন আর্য্যগণ পিতৃ পুরুষদিগের অবলম্বিত বৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বনে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন না। কেন না, অন্যে যে বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, পাছে সেই বৃত্তি অবলম্বনে তাহার জীবনোপায়ের বিঘ্ন বা অল্পতা হয়, তজ্জন্য কেহই জাতি ব্যবসা ত্যাগ করিতেন না—অথচ এরূপ সূক্ষ্ম ন্যায়-পথে তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহা কেবল আপনি ভোগ করিতেন না। জীবন রক্ষার উপযোগী যৎকিঞ্চিৎ আপনি উপভোগ করিয়া অবশিষ্ট সমস্তই পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়বর্গের ভরণ পোষণ, অভ্যাগত অতিথিগণের সেবা এবং দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণকে সমুচিত দান করিতেন। এই প্রকার ব্যয়ে অর্থ উদ্বৃত্ত হইলে পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ, পুত্র কন্যাগণের অন্নপ্রাশন ও বিবাহ—এবং পূজা ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয় ও দরিদ্রগণকে ভোজন ও অর্থ দান করিতেন। পুষ্করিণী খনন, রথ্যা প্রস্তুত এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মের উন্নতি দান প্রভৃতি নানা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যথোচিত ব্যয় করিতেন। এখন উপরোক্ত পাশ্চাত্য নীতির অনুসরণ করিয়া তৎ সমস্তই পরিত্যক্ত হইতেছে। এখন পরের বৃত্তি গ্রহণ না করাই দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অনেকে যন্ত্রাদির সাহায্যে সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা নষ্ট করিয়া

আপনি বিপুল ধন রত্নে বিভূষিত হইতেছেন। যদি সেই সকল ধন পরের উপকারার্থে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, এখন সে সমস্ত ধনই কেবল মাত্র আত্ম ভোগ সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয়িত হয়। অক্ষমের এ জগতে স্থান হওয়া উচিত নয় বলিয়া তাঁহারা দরিদ্র, ভিক্ষুক এবং ক্রমে পিতা মাতারও ভরণ পোষণাদি কার্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন। সিংহ ব্যাঘ্রাদি যেমন দুর্ব্বল মেষ শাবকাদির প্রাণ সংহার করিয়া আপন আপন উদর পূরণ করে, আধুনিক উন্নতিশীল মানবগণও সেইরূপ দুর্ব্বলদিগের বৃত্তি হরণ করিয়া ধন-পিপাসা ও ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করেন। সেই জন্য মেষ শাবকাদি যেমন সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুদিগকে ভয় ও ঘৃণার চক্ষে দেখে, আধুনিক নির্ধন ব্যক্তিও ধনাঢ্যদিগকে—এবং দুর্ব্বল বলবানদিগকে তেমনি ভয় ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কিন্তু এ শ্রেণীর লোকে সক্ষমদিগকে বিশিষ্টরূপে ভক্তি ও সম্মান করিত, তাঁহারাও নিয়ত অক্ষমদিগকে প্রভূত উপকার করিতেন। আপনাদিগের সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি করিতেন না দেখিয়া, অক্ষমগণও তাঁহাদিগকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, তাঁহাদের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রাণ দিয়াও উপকারের চেষ্টা করিত। সুতরাং তখন ধনী নির্ধন, দুর্ব্বল বলবান—সকলেই পরস্পরের বন্ধু ও হিতৈষী ছিল। কিন্তু হায়, এখন কালবশে সকল মানবই সকল মানবের শত্রু!

মাংস খণ্ড লইয়া যেমন শিকারী পক্ষীগণ পরস্পর বিবাদ করে, আধুনিক মানবগণও তেমনি ধন ও পদ লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে, প্রকৃত বন্ধুত্ব কিম্বা প্রকৃত পরহিতেচ্ছা এখন আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না অন্য ভাবের কথা—যাঁহাকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করা যায়, উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহার নিকটও দু টাকা হাওলাত চাওয়া নিতান্ত অসভ্যতা ও অমনুষ্যত্বের কার্য্য বলি পরিগণিত হইয়া থাকে। তাই আজি ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টারগণ উপ কথিতরূপে ব্যবহার করিয়াও লোক সমাজে নিন্দিত হন না! তাই ভারতীয় শান্তির সম্পদ তপোবন—হিংস্র জন্তুপূর্ণ মহানগরে পূর্ণ হইয় হায়, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুপ্রশস্ত রাজমার্গ, চাকচিক্যশালী বিবিধ প্র

বেশ, গৃহসজ্জা, নৌবর্ত্ম ও বাষ্পীয় গমনোপযোগী বিবিধ যান, সতত মনুষ্যের প্রাণরক্ষাপযোগী নানা প্রকার যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি মানবের উন্নতির উপকরণ হইয়াছে! দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি এক্ষণে মানবীয় প্রবৃত্তির উপকরণ নহে। এই উন্নতি বলে দ্বিপদ মানব—চতুষ্পদ ও শতপদীতে পরিণত হইতেছে! সভ্যজাতিগণ নিবিড় জঙ্গল মধ্যেও এক্ষণে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বিনাশ করিতেছেন;—তাঁহাদের মনের অভিপ্রায়, মানবকে নিরাপদ করেন; কিন্তু তাঁহারা যে নূতন হিংস্র জন্তুর সৃষ্টি করিতেছেন—তাহারা যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হইতেও ভয়ানক, তাহা একবারও বিবেচনা করেন না!

অনেকে বলেন, যে গুলি মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক গুণ, তাহা সমধিক পরিচালন করিলে সংসার একান্ত অচল হয়, ভারতীয়গণ ঐ সকল গুণের সমধিক পরিচালন করাতেই ঈদৃশী দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াছেন। নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালনা না করিলে শারীরিক বলের অল্পতা হয়, সুতরাং বিদেশ হইতে শত্রু আসিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করেন। আমারা বলি,—এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। মানবীয় শক্তি কখনই পশু শক্তির নিকট পরাজিত হয় না। কোন্ কালে প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছেন? আমরা দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতেছি বটে, কিন্তু সে মানবীয় শক্তির দোষে নয়,—প্রকৃত মানবত্ব হারাইয়াছি বলিয়াই দস্যুগণ আমাদিগের প্রতি উপদ্রব করিতেছে! যত দিন আমরা মানবীয় বলে বলীয়ান ছিলাম, তত দিন কেহই আমাদিগের নিকট আসিতে সমর্থ হয় নাই। মানবত্ব হারা হইয়াই আমরা অধঃপাতে গিয়াছি। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে এই মাত্র বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিতেছি যে, যদি বাস্তবিক পশু বৃত্তির সমধিক পরিচালনা না করিলে আমাদের তিষ্টিবার উপায় নাই বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই যাইতে হইবে, এ পৃথিবী মনুষ্যের উপযুক্ত নয়।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

সংসার আশ্রম।

নবম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্ম কাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক আহারাদি করিয়া বিশ্রামাভিলাষে নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতেছে; কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত আপন অবস্থানুযায়ী—কেহ ছাদে, কেহ দরদালানের শীতল মেজেয়, কেহ মেটে ঘরের দাওয়ায়, কেহ বা প্রাঙ্গনে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া আছে; এবং তালবৃন্ত সঞ্চালন সহকারে মধ্যে মধ্যে সাংসারিক বিষয়ের আলোচনায় ও রূপকথায় দারুণ গ্রীষ্মের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা পাইতেছে। দু' এক খানি ভাসা ভাসা মেঘ মধ্যে মধ্যে সুবিমল চন্দ্রমা আচ্ছাদন করিতেছে, আবার ক্ষণপরেই সরিয়া যাইতেছে। বৃক্ষরাজি সমস্ত নিশ্চল, বাতাসের লেশ মাত্রও নাই। বাদুড় প্রভৃতি দু'একটা নিশাচর পক্ষী মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরিত হইবার জন্য উড়িয়া যাইতেছে। কোন স্থানে গ্রাম্য কুক্কুরগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, নিকটস্থ গৃহস্থও অমঙ্গল আশঙ্কায় অমনি তাহাদিগকে তাড়া করিতেছে। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সকলেই বিশ্রাম লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

এই সময়ে দুইটি যুবক মধুপুরের পূর্ব্বাংশে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার তীরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। যুবক দুইটি সমবয়স্ক, উভয়ে পরস্পরের মধ্যে অতি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, উভয়ের সুখ দুঃখে উভয়েরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি। কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া উভয়েই নীরব হইলেন,—মুখে কি একটা গভীর চিন্তার ছায়া দেখা দিল, উভয়েই যেন কি একটা বিজাতীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

শূন্য পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভাই শৈলেন, ভাবিয়া আর কি করিবে বল! বুঝি তোমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ। করুণাময় ভগবান ভিন্ন তোমাদের

দূর করিবার আর কেহ নাই। স্বীকার করি, উপস্থিত নানা বিপদে তোমরা জড়ীভূত হইয়াছ, জানি,—নানা প্রকার অভাবে ও কঠোর দরিদ্রতায় তোমরা অহর্নিশি তুষানলে পুড়িতেছ,—বুঝি, দুর্জ্জনের পীড়নে ও অধর্ম্মের প্রতাপে দিন দিন তোমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—কিন্তু ভাই, আমার বিশ্বাস, তোমাদের এ দুঃখ চির দিন থাকিবে না। বিধাতার এমনই নিয়ম নয় যে, চিরদিন সমভাবে যাইবে। বিশেষতঃ তোমরা যেরূপ ধর্ম্ম ভীরু, অন্ততঃ তুমি যেরূপ সর্ব্বমাঙ্গল্যে পূর্ণ বিশ্বাসী, তোমার হৃদয় যেরূপ উন্নত, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, কালে তোমরাই আবার দেশের একজন মহৎ লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে!"

যুবক নিজ প্রশংসা স্বকর্ণে শুনিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন,—"ভাই সুদিন, দুঃখের সময়ে কেন তুমি আর এরূপ অমূলক প্রশংসায় আমায় অন্ধ কর! আমি অতি মূঢ় ও অপদার্থ। আমার এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে তুমি অত উচ্চ আসনে আমাকে উপবেশন করাইতে যত্নবান হও। আমাকে নাকি তুমি প্রাণের সহিত ভাল বাস, তাই তোমার প্রিয় জনের সকল কার্য্যই মহৎ বলিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ, এটি তোমার অন্ধ-বিশ্বাস মাত্র। এখন সে কথা যাক; ভাই, আমার মন ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে, কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না। সংসারে থাকিতে আমার আর তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই। ভাই, দু' মুঠো অন্নের জন্য মা ভাই লালায়িত, এজন্য প্রতিদিন আত্মীয় স্বজনের নিকট সপরিবারে যার পর নাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছি, কিন্তু আমি এমনই পাষণ্ড—এমনই অপদার্থ যে, অদ্যাবধি দুইটি অন্নের সংস্থাপন করিতে পারিলাম না! ভাই, তুমি আমাকে 'আদর্শ-চরিত্র' ব'লে ব্যাখ্যা কর, কিন্তু আমাপেক্ষা দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য বুঝি এ সংসারে আর কেহ নাই। অধিক আমার পাপ জীবনে!"

যুবক প্রাণের আবেগ আর সামলাইতে পারিলেন না, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বন্ধুর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া তৃণ-শয্যায় শায়িত হইলেন। ক্ষণ এইরূপে থাকিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বিষাদপূর্ণ গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"ভাই, দুঃখের কথা বলিব

কি, অবস্থা মন্দ হইলে কোন স্থানেই তার আদর বা সুখ নাই। ভাল কথাতে কি, মন্দ কথাতে কি, আর নিস্তব্ধতাতেই বা কি, সকল অবস্থায় তা'কে আশ্রয়দাতার বাক্য-নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। এই দুঃখে বাস্তু ভিটে ত্যাগ ক'রে এলেম; ভাবিয়াছিলাম, মাতুলালয়ে কিছু দিন সুখে কাটিবে। কিন্তু ভাই কপাল গুণে তাহা বিপরীত ফলে পরিণত হইল। বরং নিজ বাটীতে ছিলেম ভাল, আহার হোক—আর উপবাসই থাকি, কেহ কিছু বলিতে পাইত না; কিন্তু এখানে তাহাপেক্ষা বেশী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। আপন মামা মামীরা যত বলুন না বলুন, কিন্তু দূর সম্পর্কীয় যে মামীটি আছেন, তিনি আমার জ্যেষ্ঠাভার্য্যার দীক্ষা গুরু! তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায়—সাধ্য কার! ভাই, এমন কুটীলতা, এমন স্বার্থপরতা, এমন পরশ্রীকাতরতা আমি জীবনে কোথাও দেখিনে। অথচ মুখে 'তোমা বই আর জানিনে' ভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান। স্বীকার করি, অনেক পুরুষ-পাষণ্ড সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু ভাই আমার বোধ হয়, এ ঘোর কলিতে শক্তিরূপা স্ত্রী-দানবীরই ভাগ অধিক। আমার জানিত আমি এমন একটিও ঘর দেখিতে পাই না, যে সংসারে এরূপ কাল ভুজঙ্গিনীর তীব্র দংশনে পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় জর্জ্জরিত না হইতেছে! ভাই, কি দুরদৃষ্ট দেখ না, দু' বেলা দু' মুঠো খাব, এতে তার চক্ষু টাটায়, মন হিংসায় গর্জ্জিতে থাকে। তবু যদি তার নিজের সংসার হ'ত, তা হলে না জানি ভাই এত দিনে আমাদের দশা কি হইত!"

সুদিনের হৃদয়ও অতি মহৎ, পর দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণও একেবারে গলিয়া যায়। তিনিও বন্ধুর দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—ভাই, তুমি ঠিক বলেছ, "অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়" বরাৎ মন্দ হ'লে কোথাও তার সুখ নাই। ভগবানকে ডাক, তিনিই হা দূর করিবেন। হায়, পরিণামে তোমাদের অদৃষ্টে যে এত নিগ্রহ তাহা স্বপ্নেরও অগোচর।" সুদিনের চক্ষু হইতেও দুই চারি ফোঁটা ফেলিয়া নিপতিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে আবার কহিলেন,—"ভাই, এখন কি করি বল! এক অ দীর্ঘ এরূপে আর কয় দিন কাটিবে? আমি ত আর কোন উপায়

দেখিতে পাই না। কি করি—কোথা যাই? হায়—হায়! এ বিপদে কি কেহ নাই রে!" যুবক আবার অধৈর্য্য হইলেন, আবার কাঁদিলেন। ক্ষণপরে কি ভাবিয়া একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন। যেন কাহার সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণ একটু শান্ত হইল। আহা, ভগবৎ প্রেমাধিকারী বিশ্বাসী দরিদ্র হৃদয় কি সুন্দর!

এ জগতে যা'র কাঁদিবার স্থান নাই, সহানুভূতির পাত্র নাই, ভাল মন্দ কথা প্রকাশ করিবার লোক নাই, তাহাপেক্ষা দুঃখী আর কে! পবিত্র প্রণয় অপেক্ষা জগতে দুর্লভ বস্তু আর কি আছে? প্রাণের বন্ধু এ সংসারে যাহার না মিলিয়াছে, তাহার ন্যায় হর্তভাগা বুঝি জগতে আর কেহ নাই। সে বিপুল ধনাধিপতি হইলেও মহা দরিদ্র, সে সুপণ্ডিত হইলেও অশান্তির সহচর! বন্ধুত্ব, তোমার আদর যে না বুঝিয়াছে, তোমার মহত্ত্ব যে না জানিয়াছে, তোমার গভীর উদাত্ত ভাব—হৃদয়ে যে উপলব্ধি না করিয়াছে, তাহার মানব জন্মই বৃথা,—সে ধর্ম্ম-জগতে অতি হীনভাবে পরিগণিত হয়!

শৈলেন্দ্রনাথ আবার কহিলেন,—"ভাই সুদিন, দেখ, সকলেই আমাকে অত্যন্ত আমোদ-প্রিয় ভাবিয়া থাকে; বস্তুতঃ আমিও কাহাকে নিজের দুঃখ বড় একটা জানিতে দিই না। আমার জীবনের লক্ষ্যই এই, নিজের দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিয়া অপর সাধারণকে ব্যথিত করিব না—বা নিরর্থক আপনার হৃদয় সকলকে জানাইব না। এরূপ করিলে দুইটি দোষ হয়—এক—হৃদয় বিহীন অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির পরিহাস ও উপেক্ষা লাভ, আর এক—তাহার কুটীল ভ্রুকুটীতে সংসারে বিড়ম্বনা ভোগ! বিশেষতঃ আমার বিশ্বাস, মানুষ বড়ই দুর্ব্বল, দুর্ব্বলতায় তাহার হৃদয় গঠিত, সে নিজ দুঃখ ভারে নিজেই অবনত, নিজ অভাবে নিজেই নিপীড়িত; সুতরাং তাহার কাছে উপকার প্রত্যাশা কি রূপে করা যায়? সে যত টুকু উপকার করে, তার তলে তলে স্বার্থের ছায়া বিদ্যমান। জ্ঞাতসারে হোক, আর অজ্ঞাত হোক, তাহার স্বার্থ-অভিসন্ধি থাকিবেই থাকিবে। এই সকল কারণে আমি মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া—কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বাহ্যিক আনন্দ উপভোগ করি। ব্যথার ব্যথী না হইলে পরের ব্যথা বুঝিবে কে? অন্যে

দুঃখ বুঝিতে নাকি তোমার সামর্থ আছে ভাই, তাই তুমি আমার দুঃখ বুঝিয়াছ,—আমিও তোমার কাছে কোন কথা গোপন করি না।" দুই বন্ধুতে মিলিয়া সুখ দুঃখের আরও অনেক কথা হইল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে দেখিয়া উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন। যুবক দুইটি—একজন আমাদের শৈলেন্দ্রনাথ,—দ্বিতীয়টি তাঁহার প্রিয় বন্ধু সুদিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

এখানে সুদিনচন্দ্রের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। সুদিন—শৈলেন্দ্রের বাল্য-বন্ধু। অতি শৈশবকাল হইতে উভয়ের মনে পবিত্র প্রণয়-বীজ রোপিত হয়; অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতির আধিক্যে অতি অল্পকাল মধ্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। পরস্পরের নিঃস্বার্থ হিতেচ্ছার পরিণাম—বিশুদ্ধ জল বাতাসের গুণে ক্রমে সেই বৃক্ষ ফল ভরে অবনত হইতে থাকে। সে ফলের আস্বাদ বড়ই মধুর—বড়ই চিত্ত-স্নিগ্ধকর। ভক্ষণ করিয়া আশ মিটে না; যতই ব্যবহার করা যায়, ততই আকাঙ্ক্ষা-বৃত্তির বৃদ্ধি পায়।

ইঁহারা উভয়েই সহাধ্যায়ী। এক-ই গুরু—এক-ই শিক্ষকের উপদেশে ইঁহাদের জ্ঞানালোক বৃদ্ধি পায়। দুই জনই সমবয়স্ক—দুই জনেরই হৃদয় যেন এক-ই উপাদানে গঠিত। দুই জনেরই মনোভাব কাল-স্রোতে সমান টানে বহিতেছে। প্রভেদের মধ্যে সুদিন ব্রাহ্মণ-তনয়—শৈলেন্দ্র কায়স্থ-সন্তান। কিন্তু প্রণয়ের তীব্র উজান-স্রোতে সে জাতিভেদরূপ চিহ্নিত দুর্গ-সেতু কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ফলতঃ, প্রাণে প্রাণে মিশিয়া এক আত্মা হইয়া যাইলে, সমাজ বন্ধনের দৃঢ় উপকরণ—সামাজিক নিয়মগুলির প্রতি বড় একটা দৃষ্টি থাকে না।

কিন্তু তাহা বলিয়া ইঁহারা আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল ভণ্ড সমাজের পৃষ্ঠপোষক হন নাই—বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কখন "হে প্রভু, আলোক হইতে অন্ধকারে—শ্রীবিষ্ণু—অন্ধকার হইতে আলোকে

কর" বলিয়া নিরাকার ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ রূপ বা অভয় চরণ যুগল (?) ও দেখেন নাই। বরং এই ভণ্ড দলের বিশ্বজনীন উদার 'সাম্যবাদীত্বের' উপর তাঁহাদের হাড়ে হাড়ে রাগ ছিল। প্রথম প্রথম ইংরাজীর দুই চারি পাত উল্টাইয়া এবং একটি 'ভ্রাতা' বন্ধুর প্ররোচনায় শৈলেন্দ্রনাথের মন একটু ইতস্ততঃ হইয়াছিল বটে, কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রধান সুহৃৎ—কঠোর দারিদ্র্য, পারিবারিক বিপদ ও সাংসারিক অভাবের তীব্র কষাঘাতে সে ক্ষণ-ভঙ্গুর অসার মত বা মার্জ্জিত রুচি (?) তাঁহার অন্তর হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। দুঃখের সময়ে একটি পাকা সমজদার লোকের অব্যর্থ উপদেশ তাঁহার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছিল। সেই লোকটি তাঁহার সম্পর্কীয় কোন উদ্ধত নব্য যুবককে এক দিন রহস্য প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন,—"দেখ বাবাজী, চ'খে চস্‌মাই দাও—আর হ্যাট কোট প'রে চোখ বুজিয়ে 'আঁধার' দেখ—শ্রীবিষ্ণু—নিরাকার বিভুর ধ্যান কর, কাযের বেলায় কা'কেও পাবে না বাবা! ও তর্ক জ্যেঠামি ছেড়ে দিনান্তেও একবার হরিনাম কর' বাবা নিদেন দু' বেলা দু'মুটো 'আলু ভাতে ভাতও' জুট্‌বে!" বস্তুতঃ, কি শুভক্ষণেই শৈলেন্দ্রের কাণে এই কথাটি পৌঁছিয়াছিল,—তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে যে একটু 'সুরুচির' দাগ লাগিয়াছিল, এইক্ষণ হইতে সে কলঙ্ক-কালিমা চির দিনের মত বিধৌত হইয়া গেল।

শৈলেন্দ্র ও সুদিন অধিকাংশ সময় একত্রে বাস করিতেন। মধুপুরের উত্তরাংশে চাটুর্য্যে পাড়ায় সুদিনের বাস;—রায়েদের বাটীর অতি নিকট। সুতরাং শৈলেন্দ্র ও সুদিন এ উভয়েরই একত্র সম্মিলন হইবার কোন অসুবিধা ছিল না। এক্ষণে শৈলেন্দ্র মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, অজ্জন্যও কিন্তু তাঁহারা বিফল মনোরথ হইতেন না; যেহেতু বিজয় নগর মধুপুর এক মাইলের ও কিছু কম ব্যবধান। সুদিনও শৈলেন্দ্রের বিদ্যালয় ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্কুল ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে ভীষণ রোগে উপর্য্যুপরি তাঁহার দুইটি ভ্রাতা মৃত্যু মুখে পতিত হন। নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে তিনি অর্দ্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বন্ধু শৈলেন্দ্রের অনেক যত্নে এক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার

প্রকৃতি টা কিছু চঞ্চল,—অব্যবস্থচিত্ত প্রযুক্ত অনেক সময়ে তাঁহার কার্য্যের প্রতি বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। বিশেষতঃ অতি বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহিত সেই অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হয়। গ্লান বাজনায় সাংসারিক কার্য্যে কিছু শিথিলতা আনয়ন করে। এ ত্রুটী সুদিনের অন্তর আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহা ব্যতীত বিশেষ কিছু দোষ তাঁহার জীবনে উপলব্ধি হয় নাই। শৈলেন্দ্রনাথের উপস্থিত এই পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত মানসিক কষ্টের উপশম করিবার জন্য বন্ধু সুদিনচন্দ্র অনেক সময়ে তাঁহাকে সঙ্গীতের মধুর আস্বাদনে আকৃষ্ট রাখিতেন। তিনি একজন সুর তালজ্ঞ—ভাল বাজিয়ে। শৈলেন্দ্রনাথেরও সঙ্গীতে কতক পরিমাণে অধিকার ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর অধিক মধুর ও না হইলেও, তান লয়—রাগ রাগিনী হৃদয়ঙ্গম করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুদিনের তীব্র উত্তেজনায় তিনি অনিচ্ছা সত্বেও অনেক সময় সঙ্গীতের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। বস্তুতঃ, কঠোর দুঃখের সময় শৈলেন্দ্রনাথের ঈদৃশ একটি বন্ধু-রত্ন না থাকিলে তাঁহার জীবন অতীব ভারবহ ও দুর্ব্বিসহ হইত।

বিশেষতঃ সুদিন কিছু বেশী রকম আমোদ প্রিয় এবং সুরসিক। বঙ্গ রহস্য, শ্লেষ প্রয়োগ দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। অকারণে অনধিকার পরচর্চ্চায় তিনি অনেক সময় ব্যয় করিতেন। কাহারও কোন বিষয়ে একটু আধটু দোষ পাইলে তিনি তাহাকে 'নাস্তানাবুদ' না করিয়া ছাড়িতেন না। এজন্য তিনি অনেক সময়ে অনেকের বিরাগভাজন হইতেন। এমন কি, বন্ধু শৈলেন্দ্রও এক সময় বিশেষে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে ত্রুটী করিতেন না। শৈলেন্দ্রের মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য তিনি যে কত প্রকার রহস্যকর বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যেন সাক্ষাৎ হাস্যরসের প্রতিমূর্ত্তি। গাম্ভীর্য্য যে পথে গিয়াছে, তিনি আজীবন ভ্রমে কখন ও সে পথে গিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

শৈলেন্দ্রনাথ কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। উদ্দেশ্য সাধনে ও লক্ষ্যে তাঁহার স্থির দৃষ্টি ছিল। তিনি ধীর গম্ভীর—অথচ নম্র ও বিনয় স্বভাব বি

গভীর প্রশান্ত চিত্ত -অথচ সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি; উচ্চহাস্যে রঙ্গ রহস্য করিতেন না—কিন্তু অন্তরে সে সুখ সম্ভোগ করিতেন—ওষ্ঠাধরে ও প্রকৃতি দর্পণ—নয়নদ্বয়ে সে ভাব-প্রতিভা বিজলীর ন্যায় খেলা করিত। হৃদয়বান দূরদর্শী লোকমাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন; বন্ধু সুদিনেরও ইহা অবিদিত ছিল না।

অবিদিত ছিল না বলিয়াই ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনও বিশেষ রূপ মনোভঙ্গ হইত না। বাহ্য দর্শনে প্রভেদ ভাব পরিলক্ষিত হইলেও অন্তরে সে ভেদ-বৈষম্য মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পাইত না।

সুদিনচন্দ্রের পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত রায় বংশীয়দিগের বিশেষ সম্প্রীত ছিল। এমন কি, অনেক সময় ইঁহাদের পাক পৈতা ভেদ থাকিত না। নিঃস্বার্থতা বশতঃ পরস্পরের স্নেহ-বন্ধন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে অকৃত্রিম প্রণয় এক্ষণে শৈলেন্দ্র সুদিনের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাহার পরিণাম কত সৌন্দর্য্য পূর্ণ, কত মনোহর, পাঠক তাহা ক্রমে দেখিতে পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

সংসার না দর্পণ?

"The world is a looking glass, and gives back to every man the reflection of his own face".

Vanity Fair.

সম্মুখে অমল দর্পণ স্থাপিত রহিয়াছে। চঞ্চল-চিত্ত, অস্থির প্রকৃতি মানব একবার চাহিয়া দেখ, আমার কথা রাখ। এদিক ওদিক চাহিও না;—যদি শান্তি চাও, হৃদয়ের জ্বালা নিবাইতে ইচ্ছা কর, একবার স্বচ্ছ সরসী দর্পণের দিকে নয়ন ফিরাও। যদি শত শত অসন্তোষ-বৃশ্চিক-দংশনে র হইয়া থাক, দর্পণে বারেক আপনার প্রতিফলিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া —বৃশ্চিক-কুল বিনাশ পাইবে, হৃদয়ে শান্তিদেবী আবির্ভূতা হইবেন!

দর্পণ সামান্য দ্রব্য-গঠিত বলিয়া তুচ্ছ ভাবিও না,—বিলাসীর প্রিয় সহচর ভাবিয়া ঘৃণা করিওনা। দর্পণ সামান্য হইলেও—অমল ধবল, বিলাসী-জন-সহচর হইলেও অকলঙ্ক-স্পৃষ্ঠ। দর্পণ স্বচ্ছ কাচ-খণ্ড ও নির্ম্মল পারদের সংযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূত পবিত্র পদার্থদ্বয়ের সম্মিলনে বিমল স্বচ্ছ দর্পণের উৎপত্তি। তুমি দর্পণের নিকট সুশিক্ষা ভিন্ন কুশিক্ষার আশা করিতে পার না, দর্পণ দর্শনে শান্তি ভিন্ন অশান্তি তোমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

মানুষ তোমার মহত্ত্ব বুঝিল না, গুণের পুরস্কার করিল না। তুমি যাহাদিগের জন্য আজীবন পরিশ্রম করিয়া আসিতেছ, তাহারা তোমার পরিশ্রমের মূল্য প্রদান করিল না; মূল্য প্রদান করা দূরে থাকুক—তুমি যে পরিশ্রম করিয়াছ, তাহাই তাহারা অনুভব করিতে পারিল না! তোমার বড় দুঃখ হইয়াছে;—কেবল দুঃখ নহে,—অনর্থক পরিশ্রম করিয়াছ বলিয়া তোমার অনুতাপ জন্মিয়াছে। তোমার দুঃখ, তোমার অনুতাপ বুঝিলাম।—বুঝিলাম, কিন্তু তোমার হইয়া তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না;—বরং যাহাদের জন্য তোমার এই মনঃক্লেশ—অনুতাপ, তাহাদের দলে মিশিয়া, তাহাদের অগ্রণী হইয়া, তোমাকে বিদ্রূপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কেন?—দর্পণের প্রতি চাহিয়া দেখ!

দর্পণের মত ন্যায়বান্ বিচারক আর পাইবে না। একবার চাহিয়া দেখ,—তুমি যদি মলিন-বেশ, পলিত-কেশ হও, যদি তোমার অদন্ত তু বিলোল চর্ম্ম হয়,—তুমি তবে কখনই দর্পণের নিকটে যৌবন-সুলভ র লাবণ্য-সম্পন্ন মনোহর অবয়বের প্রতিফলন প্রত্যাশা করিতে পার না যদি সুরুচি-দশনা, আকর্ণ-বিস্তৃত-লোচনা, অমল বরণা ষোড়শী দর্পণে প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে দর্পণ, কখনও স্খলিত-দশনা, কোটর-গত-নয়না তিমির-বরণা বৃদ্ধা-মূর্ত্তি প্রতিফলিতা করিবে না। তোমার যেমন রূ যেমন সৌন্দর্য্য, যেমন বসন, যেমন-ভূষণ, যেমন গঠন, যেমন চলন—দর্পণে প্রতিফলনে তত্তাবৎ অবিকল দেখিতে পাইবে,—অবয়বের মাত্র—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাংশও বিকলিত দেখাইবে না। নয়নে ধূলি-ক ক্ষুদ্র কীট পতনে তোমার ক্ষণিক দৃষ্টি-হীনতা জন্মিতে পারে, অঙ্গুলি-চ

বা চক্ষুর আকুঞ্চন প্রসারণে তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম বা দৃষ্টি-ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে,—তজ্জন্য তুমি আপনার প্রকৃত মূর্ত্তির ক্ষণিক বিকৃতি দেখিতে পার, কিন্তু সে বিকৃতির কারণ দর্পণ নহে,—সে বিকৃতি তোমা হইতেই ঘটিয়াছে, ও তোমাতেই আবদ্ধ।

দর্পণ-দেখিলে! —এখন বোধ হয় তোমাকে বিদ্রূপ করার জন্য, কৃতঘ্ন, নরাধম ভাবিয়া আমায় দোষ দিবে না। এখন বুঝিলে,—মানুষ লইয়াই সংসার, এবং এই সংসারই একখানি দর্পণ! তোমার সম্মুখস্থ দর্পণ খানিতে তোমার বাহ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বুঝিতেছ,—আর সংসার দর্পণে তোমার কার্য্যের,—তোমার পরিশ্রমের,—প্রকৃত প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। শরীর ও মন লইয়াই মানুষ,—শারীরিক সৌন্দর্য্যের পরীক্ষা হয় কাচের দর্পণে, আর মানসিক মহত্ত্বের পরীক্ষা হয়—সংসার-দর্পণে।—তুমি যেমন মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যেমন মন লইয়া সংসার-মুকুর সমীপে সমাগত হইয়াছ, সংসার তোমার মনের তেমনই প্রতিচিত্র প্রদান করিতেছে;—ইহার জন্য তোমার ক্ষুভিত হইবার,—অনুতাপ করিবার কিছুই নাই।

এখনও আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হইল না! এখনও সংসার দর্পণের ন্যায়পরতায় তোমার সংশয় রহিল! মনে মনে ভাবিতেছ,—তুমি যে কার্য্যকে প্রকৃত কার্য্য বলিয়া মনে কর না, যাহা তোমার মতে আদৌ প্রশংসার্হ নহে, লোকে তোমার সেই কার্য্যের জন্য শত মুখে সমস্বরে প্রশংসা-গীতি গাইতেছে, যে কার্য্যকে তুমি নীচতার [illegible] মনে করিয়া, আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতেছ, সেই কার্য্যকে লোকে মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে. আর যাহাকে তুমি তোমার পক্ষে মহা শ্লাঘনীয়, মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক বলিয়া ভাবিতেছ,—যে মহত্ত্বের পুরস্কার তুমি লোকের নিকট পাইবার প্রত্যাশা করিতেছ, লোকে তোমাকে সেই কার্য্যের পুরস্কার ও প্রশংসা প্রদান করিতেছে না;—তুমি সংসারের পক্ষপাতিতা, সংসারের [illegible]তা, সংসারের অপদার্থতা ভাবিয়াছ, সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়াছ। [illegible]রা মুকুর খানি অনাদরে—অশ্রদ্ধায় ফেলিয়া রাখিয়া মলিনতা ধরাইবে [illegible] করিতেছ, অথবা পদাঘাতে চুরমার করিবার উপায় ভাবিতেছ; কিন্তু

সাবধান! মনে ভাবিয়া দেখ, তোমার মানব-সুলভ দুর্ব্বলতা আছে, নানা কারণে তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম, দৃষ্টি-ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিতে পারে। হয়ত, তর্জ্জনী দ্বারা লোচন-যুগল চাপিয়া ধরিয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ,—তাই আপনার একমাত্র মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বহুমূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিতে পাইতেছ, হয়ত নয়নদ্বয় আকুঞ্চিত বা প্রসারিত করিয়াছ,—তাই আপনার কমনীয় মূর্ত্তি বিকৃতরূপে প্রতিফলিত দেখিয়া বিরক্ত হইতেছ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ,—দর্পণের বিষয় বারেক স্থির-চিত্তে বিবেচনা কর, আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর, জানিতে পারিবে,—তোমার একমাত্র স্মৃতি-বৃত্তির বহুধা বা বিকৃত প্রতিফলনের কারণ—এই সংসার-দর্পণ নহে, তাহার কারণ তুমি—ও তাহা তোমা হইতেই উৎপন্ন।

যাঁহারা সংসার দর্পণে আস্থাবান না হইবেন, তাঁহারা জীবনে সুখী হইতে পারিবেন না; তাঁহারা সংসারের সর্ব্বত্র সুখ অন্বেষণ করিবেন,—কিন্তু অনুশোচনা ও অনুতাপ ভিন্ন আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবেন না। হৃদয় মন্দিরে শান্তি-দেবীর আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবেন,—কিন্তু অশান্তি-পিশাচী হৃদয়-বেদিকা অধিকার করিয়া বসিবে; সঙ্কল্পিত পথে অগ্রসর হইবার আয়াস পাইবেন,—কিন্তু বিঘ্ন বিপত্তির ভীষণ-ভাব দেখিয়া প্রথমত সঙ্কুচিত ও স্তম্ভিত—পরে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-পথ ভ্রষ্ট হইয়া অসীম বিপদ-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইবেন। তাই বলিতেছিলাম, সংসার দর্পণে বিশ্বাসবান্ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। ধর্ম্ম-জগতের শঙ্কর [illegible] সাহিত্য-জগতের কালিদাস ও সেক্সপিয়র, বিজ্ঞান-জগতের সক্রেটিস [illegible] গালিলিও, নর-জগতের সিরাজ ও ক্লাইভের অবিকৃত প্রতিমূর্ত্তি সংসার দর্পণে প্রতিফলিত রহিয়াছে,—একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও। তাঁহারা জীবিতকালে সংসার দর্পণে স্ব স্ব বিকৃত বা বহুধা প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকিতে পারেন,—দেখিয়া অনুচিতরূপে শোচনা-গ্রস্ত, অনুতাপিত বা চিত্ত-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকিতে পারেন,—কিন্তু আজ দেখ, সংসার-দর্পণ তাঁহাদিগের অবিকল অবয়ব প্রতি[illegible] করিতেছে, তোমাকেও দেখাইতেছে, তাঁহাদিগকেও দেখাইতেছে। যিনি বিকৃত, বিকলাঙ্গ,—তিনি আপনার বিকৃত-রূপ বা অঙ্গবৈ[illegible]

দেখিয়া আপনার কর্ম্মফল গণনা করিতেছেন, যিনি অকলঙ্ক সুন্দর, তিনি স্বীয় অনুপম সৌন্দর্য্য রাশি ভোগ করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন! তাই বলি, মহান্—ন্যায়পরায়ণ—সত্যনিষ্ঠ সংসার দর্পণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হও, আপনার মানব-সুলভ অঙ্গ-বৈকল্য বা দুর্ব্বলতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর,—তোমার আত্ম-গ্লানি ঘটিবে না, শত সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে অধীর হইতে হইবে না। সম্মুখে বিমল দর্পণ অবমোচিত রহিয়াছে, একবার তাহার প্রতি প্রকৃতিস্থভাবে নয়ন ভরিয়া দৃষ্টিপাত কর, আপনাকে চিনিয়া লও, আপন কর্ত্তব্য-ব্রত উদ্‌যাপনে দৃঢ় সঙ্কল্প হও, সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে!

শ্রীরাধেশচন্দ্র সেঠ।

আমেরিকায় অবস্থান।*

(সমালোচনা)

বিদ্যাশিক্ষার জন্য, দেশ পর্য্যটনের জন্য, উচ্চপদলাভের আশায়, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে অনেকে ইউরোপে গিয়াছেন এবং যাইতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে কয়েক জন আপন পন্ন ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। ইউরোপের আমেরিকাও এখনকার একটি সুসভ্য দেশ—কোন কোন বিষয়ে রাপ অপেক্ষাও সভ্যতার পথে অগ্রসর; কিন্তু আমাদের মধ্যে অতি লোকই আমেরিকায় গিয়া থাকেন, অতি অল্প লোকই গিয়াছেন। হারা গিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে, আমরা যত দূর জানি, কেবল দুই জন ত্র তাঁহাদের ভ্রমণ ও অবস্থান বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; আর বাবু অমৃতলাল রায়। ইহাঁদের প্রতাপ বাবু আমেরিকায় গিয়াছিলেন—কেবল বেড়াইতে, অমৃত বাবু

* Reminiscences: English and American. Part 1.—e years among the Americans. By Amrita Lall . Calcutta, Roy Publishing House. Price 1 Rupee.

গিয়াছিলেন—তথায় অবস্থান করিতে, জীবিকা অর্জ্জন করিতে, জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে। সুতরাং অমৃত বাবুর পুস্তক যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষাপ্রদ এবং উপাদেয় হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

অথচ যেমন আশা করা গিয়াছিল, এ পুস্তক তেমন হয় নাই। অমৃত বাবু সুলেখক। 'হোপ' নামক ইংরেজি সংবাদ পত্র তিনি অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন। তিনি তিন বৎসর আমেরিকায় ছিলেন—সে দেশের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া ছিলেন; আমেরিকাবাসীর চরিত্র, তাহাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, দোষ গুণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার সুবিধা তাঁহার যেমন হইয়াছিল, সেরূপ কাহারও হয় নাই—শীঘ্র যে কাহারও হইবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং অমৃত বাবুর কাছে আমরা অনেক আশা করিয়া ছিলাম। অনেক আশা করিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় আশাভঙ্গের মনস্তাপ আমাদিগকে সহ্য করিতে হইল।

অনেক গুলি কারণে এই রূপ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, অমৃত বাবু এ পুস্তক সাধারণের জন্য লেখেন নাই। 'হোপ' পত্রিকার গ্রাহকবর্গের জন্য প্রধানতঃ এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে—পাশ্চাত্য প্রদেশে অবস্থান করি অমৃত বাবু যাহা যাহা দেখিয়াছেন—যাহা যাহা শিখিয়াছেন, কেবল তাঁহা বন্ধুবর্গকে সেই সকল শুনানই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং সাধার যদি এই পুস্তক পড়িয়া তৃপ্তিলাভ না করে, সেটা কিছুই আশ নহে; অমৃত-বাবুর নিন্দার কথাও নহে। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া যে, যদি এই পুস্তক সাধারণের চক্ষু ও চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ তাহা তাঁহার আশার অতিরিক্ত। তিনি যাহা আশা করেন নাই, করিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা করিতে পারেন নাই বলিয়া নিন্দা করি অন্যায় নিন্দা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকাবাসীর সামাজিক রীতি নী আচার ব্যবহার বিবৃত করাও অমৃত বাবুর উদ্দেশ্য নহে;—কৃষি বাণি এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহাদের কার্য্য প্রণালি বর্ণনা করিতেই তিনি করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, দেশ পর্য্যটন করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে সকল এই পুস্তকে প্রকাশিত করা যুক্তিযুক্ত বি করেন নাই—সে গুলি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য তুলিয়া র

ছেন। এই সকল কারণে সমালোচ্য পুস্তক খানি কতকটা অঙ্গহীন বলিয়া বোধ হয়।

আমেরিকায় অমৃত বাবু যাহা কিছু দেখিয়াছেন, সবই ভালবাসার চক্ষে দেখিয়াছেন। স্নেহের বস্তুর মন্দ ভাগটা প্রায় কেহ দেখে না, অথবা দেখিয়াও দেখে না। অমৃত বাবুও মারকীন রাজ্যে দোষাবহ বা নিন্দার্হ কিছুই দেখিতে পান নাই—যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই শত মুখে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন। যেখানে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিবার স্থান পান নাই, সেখানে একটা কৈফিয়ৎ দিতে যেন চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার দুই একটা দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। কিন্তু ইহার জন্য আমরা অমৃত বাবুকে বিশেষ দোষ দিইনা। স্নেহের ধর্ম্মই পক্ষপাতিতা। ভালবাসা অন্ধ।

হিউম এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালি শিল্পের অনুকূল, এবং প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী বিজ্ঞানের অনুকূল। কেন এরূপ ..., তাহার কারণ সকল নির্দ্দেশ করিবার এ স্থান নহে, কিন্তু হিউমের এই উক্তিটি বড়ই সারগর্ভ। মিস্ মার্টিনিউ তাহার 'মারকীন সমাজ' (Society ... America) নামক গ্রন্থে এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমেরিকার স্ত্রীগণের মধ্যে আমি এক জনও দক্ষ শিল্পী দেখি নাই। আমি তথায় একটির অধিক সুন্দর চিত্র দেখি নাই, এবং এক বা দুই স্থল ব্যতীত সুন্দর গীত বা বাদ্য শ্রবণ করি নাই।" ইহার অর্থ এই যে, সৌন্দর্য্যের ... বা অবতারণা যে সকল বিদ্যার উদ্দেশ্য এবং ..., সে সকলে আমেরিকাবাসীরা সভ্য জগতের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সমালোচ্য পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায় অমৃত বাবুও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহার একটি কৈফিয়ৎ দিতেও ব্যস্ত হইয়াছেন কৈফিয়ৎ দিতে ... ন নাই! তিনি লিখিয়াছেন যে, আমেরিকাবাসীদিগকে এ পর্য্যন্ত ...র প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে অতি মাত্র ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে বলিয়া ... শিল্পানুশীলনের এবং সৌন্দর্য্য গ্রাহিণী বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষ সাধনের ... পায় নাই। এই অপকর্ষ যে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালির প্রকৃতিগত ...তার ফল, এ কথাটা অমৃত বাবু প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন নাই।

আমেরিকাবাসীদিগের উন্নতি কল্পে অমৃত বাবু প্রধানতঃ তিনটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন:—প্রথম, দেশের উৎপাদিকা শক্তির প্রাচুর্য্য ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদের ব্যগ্রতা ও আয়াস, দ্বিতীয়, তাহাদের শ্রম প্রিয়তা এবং শ্রমতৎপরতা—যে কোন প্রকারের শ্রম হউক না কেন, তাহা স্বীকার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত নহে, তাহাতে তাহারা অসম্ভ্রম বোধ করে না; তৃতীয়, তাহাদের সাধারণ শিক্ষা; এই শিক্ষা আমেরিকার প্রত্যেক লোকই পাইয়া থাকে। এখানকার বিদ্যাশিক্ষার একটু বিশেষত্ব এই যে, চতুর্দ্দশ বৎসর নূনবয়স্ক বালক মাত্রকেই বাধ্য হইয়া সাধারণ বিদ্যালয়ে যাইতে হয় এবং সেখানে তাহারা বিনা বেতনে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এই শিক্ষাবিধানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমেরিকার শিক্ষা-কর আছে—সাধারণে এই কর আহ্লাদের সহিত প্রদান করে। সমগ্র সভ্য জগতে এমন কোন দেশ নাই—যেখানে লোকশিক্ষার জন্য এত অধিক অর্থ ব্যয়িত হয়। ইয়োরোপ যুদ্ধ এবং যুদ্ধোদ্যোগ লইয়াই ব্যস্ত—জন সাধারণের শিক্ষার দিকে ততটা দৃষ্টি নাই। ইউরোপের শিক্ষাব্যয় অপেক্ষা সামরিক ব্যয় সাত গুণ অধিক ... আমেরিকার সামরিক ব্যয় শিক্ষাব্যয়ের অর্দ্ধেক মাত্র।

আমেরিকাবাসীর প্রধান গুণ, আত্মনির্ভর। ইহাই তাহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। সেখানে কেহ কাহারও অন্নদাস নহে—সকলেই আপন আপন জীবিকা অর্জ্জন করিতে তৎপর। বড় কাজ না পাইলে ছোট কাজ করিতে কাহারও আপত্তি নাই—যাহা উপস্থিত পায় তাহাই ... করে, এবং তাহা হইতেই ক্রমে উন্নতি লাভ করে। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। আমেরিকায় প্রথম গিয়া একটা জুতায় কালি-দেওয়া চোদ্দ বছরের বালকের সহিত অমৃত বাবুর কথাবার্ত্তা হয়। কথা প্রসঙ্গে অমৃত বাবু তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি সে দেশে কাজ কর্ম্মের জন্যই আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অপরিচিত বিদেশীর পক্ষে কাজ পাওয়া বড়ই কঠিন। বালক ইহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল—"এ কি কথা বলিতেছ! তোমার ম... বয়সের যুবা পুরুষ নিউ ইয়র্ক নগরে কাজ পায় না? যাও, ঐ হোটেলে ... হাইট দাও গিয়া, এখনই পাঁচ ছয় আনা রোজকার হইবে। কিন্তু ... বোধ হয় কোন নীচ কাজ করিতে চাও না। এ দেশ কিন্তু পরের অন্নদা...

বা সৌখিনের দেশ নহে। এখানে যত লোক দেখিতেছ, সকলেই এক দিন তোমারই মতন অপরিচিত ছিল। তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই তোমার মতন সুন্দর ইংরাজি কহিতে পারিত; তোমার মতন শিক্ষিতই তাহারা ছিল না, অথচ তাহাদের কাহারও অচল নাই। উদ্যম থাকিলে এ দেশে কাহারও অচল থাকে না। যত দিন না ভাল কাজ যোগাড় করিতে পার, তত দিনের জন্য উপস্থিত একটা কিছু অবলম্বন কর। সময়ই অর্থ—সময় কখন নষ্ট করিও না। তুমি কি মনে কর, আমি চিরদিন কাজুতা বুরুষ করিয়াই কাটাইব? বোধ হয় না। কিছু কাল অপেক্ষা কর, এই দেখিবে যে, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সিদ্ধ করিয়াছি।" একজন সামান্য জুতা-বুরুষ-কারী বালকের মুখে এই কথা! এমন শ্রমপ্রিয়, আলস্যবিদ্বেষী, স্বাবলম্বী, উদ্যমশীল জাতির যদি উন্নতি না হইবে, তবে আর হইবে কার?

আমেরিকাবাসীদিগের একটি মহৎ গুণ, ইহাদের অকৃত্রিম সামাজিকতা। ইংরেজদিগের ন্যায় ইহারা আদবকায়দার দাস নহে। আদবকায়দা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে হাব ভাব, কথাবার্ত্তা, ব্যবহারাদির যে সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা সে সকলের বড় একটা ধার ধারে না বটে, কিন্তু ইহাদের হৃদয়ানুভূত সামাজিকতা এত অধিক যে, আদবকায়দার প্রয়োজনও বড় একটা দেখা যায় না। যেখানে হৃদয়ের অভাব, সেইখানেই বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন। কাহাকেও নমস্কার করিবার সময়ে মস্তক আধ ইঞ্চি অধিক অবনমিত হইল—কি কম হইল, এ দিকে ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই বটে, কিন্তু একজন আমেরিকাবাসী যদি তোমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করে, সে তোমার সহিত চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে, তাহার অন্তরের অনিগূঢ় ভাব সকল তোমার নিকট ব্যক্ত করিবে—যেন তুমি সেই পরিবার বহির্ভুক্তই একজন। ইউরোপে এ ভাবটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মধ্বজী, ধর্ম্মব্যবসায়ীরা সকল দেশেই সঙ্কীর্ণমনা এবং ক্ষুদ্রচেতা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যাঁহারা ভারতচন্দ্র রায়ের নাম শুনিলে মূর্চ্ছা যান, পরের ঘরের যুবতী বিধবা ছলে বলে কৌশলে বাহির করিয়া আনিতে তাঁহারা অনুমাত্র ও কুণ্ঠিত নহেন। আমেরিকাতেই বা অন্য রূপ হইবে

কেন? অমৃত বাবু আমেরিকায় গিয়া 'নিউ ইয়র্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' নামক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকার 'প্রেসবিটিরিয়ান' স্বত্বাধিকারীদিগের নিকট ছাপাখানার কর্ম্মপ্রার্থী হয়েন। ইহারা অমৃত বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যখন বুঝিলেন যে, ইহাঁর দ্বারা যিশু খ্রীষ্টের গোয়াল গুলজার হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন ইহাঁর উপকার করিতে আর রাজি হইলেন না;—উপকার করিতে হইলে যেন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করিতে হয়। এই ধর্ম্মব্যবসায়ীদের নিকট অমৃত বাবু যে সাহায্য পাইলেন না, 'ট্রুথ-সীকার' পত্রের নাস্তিকদিগের নিকট তাহা পাইলেন,—অমৃত বাবু নাস্তিক কি না—এ অনুসন্ধান তাঁহারা করিলেন না। এ ব্যাপারে অমৃত বাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। ইহা চিরপ্রসিদ্ধ যে, যে যাহার ব্যবসায় করে, সে তাহা নিজে ব্যবহার করে না। উকিলেরা মোকদ্দমা করিতে নারাজ, ডাক্তারেরা ঔষধ খাইতে নারাজ, ময়রারা মিষ্টান্ন খায় না, শুঁড়িরা মদ খায় না,—তবে ধর্ম্মব্যবসায়ীরাই বা ধর্ম্মাচরণ করিবে কেন? কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে এই পেশাদারি ভাবটা ছিল না, কেন না হিন্দুধর্ম্মের ব্যবসায় ইতিপূর্ব্বে ছিল না। আজ কাল কিয়ৎপরিমাণে হইতেছে। আজ কাল দেখিতে পাই, দুই চারি জন হিন্দুধর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এটি এ দেশের পক্ষে অতি কুলক্ষণ। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, যাহা লইয়া ইহাঁরা ব্যবসা খুলিয়াছেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মের 'খোলামির' ভাগ মাত্র। হিন্দু ধর্ম্মের যাহা প্রাণ, ইহাঁরা তাহা বুঝেনও না, বোধ হয় জানেনও না। জানিলে কি আর হিন্দুধর্ম্মের দোকান পাতিতেন!

এই পুস্তক সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাও বটে, আর সমালোচনায় সকল কথা বলিয়া দিলে গ্রন্থকারের উপর অত্যাচার করা হয়। যাঁহার ক্ষমতা আছে, তিনি এই পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করেন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। তবে এই সমালোচনায় একটা অঙ্গহীন থাকিয়া গেল। মার্কিন সুন্দরীদিগের সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। সুন্দরী পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন,—কি করি নাচার।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

দু' দিন।

জানিনা, কোথা হইতে আসিয়াছি—কোথায় যাইব। তবুও অবিরত চলিতেছি বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই; কাল কুলাল চক্রবৎ নিয়তই ভ্রমিতেছে, আমরাও সেইরূপ কাল সঙ্গে ঘুরিতেছি;—পথহারা পথিকের ন্যায়—হারাধন অন্বেষণকারীর ন্যায় যেন অবিরতই এই সংসার-মরুতে ভ্রমিতেছি। আশা-মরীচিকা আমাদিগকে মরু-পান্থ জ্ঞানে কতই পুলকিত করিতেছে, আমরাও সহসে ইহার অনুসরণ করিতেছি। যদিও সম্মুখে অনন্ত বালুকণা ধূ ধূ করিতেছে,—যদিও মরীচিমালীর প্রখর কিরণে শরীর অবসন্ন,—তবুও হায়! কুহকিনীর মোহিনী-মায়ায় পুলকিত-চিত্তে সধীরে অগ্রসর হইতেছি।—কিন্তু গন্তব্য পথ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়; আমরা কিছুই জানিনা, অথচ জানি বলিয়াই জগৎ জানে;—আমরা কিছুই বুঝিনা, অথচ বুঝি বলিয়াই জগৎ বুঝে।—সরল দৃষ্টিতে দেখি,—জীব হয় ও মরে; কিন্তু চিরদিন কেহই থাকে না। সব দুদিন,—ভোগবিলাসে, আমোদ প্রমোদে, সুখে দুঃখে রত। আজ দেখি—কাল নাই; চমৎকার লীলা! আজ দেখি—একজন রাজাসনে বসিয়া দশ জনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, আবার কাল দেখি, তিনিই সেই দশ জনের একজন; আজ একজনের গ্রীতায় জগৎ থরহরি কম্পবান; আবার কাল ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ,—তাঁহার সে ভীতা আর এ জগতের জীব হৃদয় কাঁপায় না। সে মহীয়সী শক্তি তাঁহার টিই মিলিয়া গিয়াছে; তিনি দুদিনেই অনন্ত কালের কোলে কলেবর ঢালিয়া দিয়াছেন।

এইরূপ আজ ভিখারী—কাল রাজা; আজ যে রাজা, কাল সে ভিখারী। এইরূপ দুদিনের খেলা;—সব দুদিনের তরে! আমিত্ব দুদিন, তুমিত্ব দুদিন; কেবল তিনিত্বই চিরদিন, তিনিত্বই অনন্তকাল। তিনিত্বই অনন্তত্ব; তাঁহারই অনন্ত দিন। আর সব দুদিন। আজ যে স্থানে জঙ্গল, কাল সে স্থানে সুপ্রাসাদ। এইরূপ পরিবর্ত্তনই কালের সঙ্গে নিয়তই জড় জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে। গৃহ-জড়-জগতে মানব-পরিবর্ত্তন যখনই "হই" বলিয়া ধ্বনি

করিতেছে, অমনি সেই সুললিত রব প্রকৃতির বিশাল বিশ্ব হৃদয়ে প্রতিঘাত হইয়া "নাই" বলিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভূমণ্ডলে এই দুইটিই প্রধান রব; ধ্বনি বলে "হই"—প্রতিধ্বনি বলে "নাই"। এই দুটী মনোমোহন রব নিয়তই জলবুদ্বুদের মত ফুটিয়াই, অনন্তে মিশাইতেছে। সব পুতুল-খেলা! সকল জীবই দু'দিনের তরে ঘরে ঘরে ফিরিতেছে। যাই তারটী ছিন্ন হইল, অমনি জীব-লীলা ফুরাইয়া গেল, যাই বাতাস প্রবাহিত হইল অমনি দীপ নিভিয়া গেল। তাই বলি, সব দুদিনের তরে; আজ যে ভূমণ্ডলে অমাবস্যা ঘোর অন্ধকার, আবার সেই ভূমণ্ডলেই পূর্ণ-শশধর স্নিগ্ধ রমণীয় কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া অনন্ত নীলাকাশে সুমধুর হাস্যে সমুদ্ভাসি… আজ দেহে প্রাণে বড় মিল, বড় ভাল বাসা, আবার কাল প্রাণের কথা দে… শুনেনা,—যাই অমিল হইল, অমনি সেই অদৃশ্য প্রাণ-বায়ু অনন্তে মিশা… গেল। আজ শিশিরের সঙ্গে পাতার বড় ভাব! যাই সূর্য্য রশ্মি প্রকা… হইল, অমনিই সে ভাবটুকু ফুরাইল—শিশির ফোঁটা শুকাইল। যামিনীর সহিত তমসের কত প্রেম! যাই শশাঙ্ক উদিত হইল, অমনি সেই প্রেমে… খেলা অচিরেই মিটিয়া গেল; কাদম্বিনির সহিত সৌদামিনীর কেম… প্রণয়! যাই গর্জ্জন ফুরাইল, বর্ষণ হইল, অমনি সৌদামিনী লুকাল, সাধের প্রণ… পলাইল। মুকুলিত কুমুদিনীর সহিত কলানিধির কেমন ভালবাসা! রজ… প্রভাত হইল; দু'দিনের ভালবাসা দুদিনেই মিলিয়া গেল, কুমুদিনী অফুট রহিল! কমলিনীর সহিত মরীচিমালীর কেমন বিমল প্রেম! প্রদোষ দেখা দিল, অমনি সে প্রেম-লীলাও ফুরাইয়া গেল, সুহা… কমলিনী অনাথিনী হইল! সুমধুর হাসি, অনন্ত দুঃখরাশিতে পরিণত … বসন্তে কোকিল, নদী-জলে মৃদুমন্দগামী সমীর হিল্লোল, ফুলে ভ্র… কুসুমে কীট, ফাল্গুনে নব-পল্লব, অর্থে মান, সৌন্দর্য্যে মোহ, জ্ঞানে গৌর… সরলতায় মধুরতা, নীলাকাশে শশধর, এসব দুদিনের তরে, যাই নিদাঘ দে… দিল, কোকিল-কলাপের মধুর আলাপও ফুরাইল; যাই ঝটিকা উপস্থিত … পবনের মৃদুল-গতি ভীম গতিতে পরিণত হয়; সেই মধু ফুরাইল, … পলাইল!

তাই বলি, এইরূপ সকলই দুদিনের তরে! ভালবাসা দুদিনের,

জীবনও দুদিনের ;—ভালবাসায় জীবন,—জীবনে ভালবাসা ; পরমাত্মার যখন দেহের প্রতি ভালবাসার হ্রাস হয়,তখনই জীবনলীলা ফুরাইয়া যায়, পর মাত্মার ও দেহে যখন বড়ভাব থাকে, তখনই জীবন-ক্লাস, ভাব তিরোহিতের সময়ই অন্তিমকাল। তাই বলি, ভালবাসায় জীবন। আর সে জীবন ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। যে জীব যে ভালবাসার পাত্র, তাহার জীবনেই ভাল বাসা—তাহার জীবনে প্রেম ; অন্য কাহারও উপরে না হয় নিজের সঙ্গে নিজের প্রেম ; তাই বলি প্রত্যেক জীবনেই ভালবাসা ; কিন্তু এ প্রেম দুদিনের ! চিরস্থায়ী নয়,— নশ্বর! দুদিনের যাহা, তাহাই ...র ; দু দিনই নশ্বরের ; দু দিনের প্রধান গুণ "নশ্বরত্ব", আর অতীত ...নের যাহা, তাহা অবিনশ্বর, সুতরাং তিনই—কেবল সেই ভগবানই ...নশ্বর—অনন্ত কাল স্থায়ী !

শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী।

স্বপ্নদর্শন—কলিকাতা।

...ব চার্ণকের নাম ইতিহাস-পাঠকদিগের অবিদিত নহে। বঙ্গদেশে পূর্ব্ব-...রত-বণিক সমিতির বাণিজ্যের আরম্ভ কালে তিনি উক্ত সমিতির ...তিনিধি পদাভিষিক্ত ছিলেন। প্রাচ্য বৃটিস-সাম্রাজ্যের—ভারতবর্ষের ...ধানী কলিকাতা জবচার্ণক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্যকার ...ভারতের, বাণিজ্য কেন্দ্র সমৃদ্ধিশালী মহানগরী একসময়ে ভাগীরথী তীরে ...ক খানি সামান্য গ্রামের সমষ্টি মাত্র ছিল। ঐ গ্রাম সমুহ নিম্ন জল...., ধান্য ক্ষেত্র এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু পূর্ণ মহাবনে পরিবেষ্টিত ছিল। ...ড়, রাজমহল, ঢাকা, নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নগর সমূহ পর্য্যায় ...ম. বঙ্গের রাজধানী পদাভিষিক্ত হইয়া নিজ গৌরব ও সমৃদ্ধি ...কে দেখাইয়াছিল। উহারা এ জগতে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া ...তে ভাসিয়া গিয়াছে। যত কাল ইতিহাস বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ...গের নাম এবং গৌরব-কাহিনী বিলুপ্ত হইবেনা বটে, কিন্তু ...গের স্মৃতি—জন সাধারণের মন হইতে কাল-প্রবাহের সহিত ...: বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে।

কালের অনিবার্য্য গতি কে রোধ করিতে পারে? ইহা মানুষের সাধ্যাতীত। এক গড়িতেছে আর ভাঙ্গিতেছে। আবার গড়িতেছে পুনরায় তাহা ভাঙ্গিতেছে। এ জগতে পরিবর্ত্তন ভিন্ন কথা নাই। এই উপস্থিত কলিকাতা মহানগরী এক সময়ে বা কি ছিল—আর আজই বা কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যে জব চার্ণক এ নগরের ভিত্তিমূল প্রোথিত করিয়াছিলেন, তিনি কখন কি একবারও স্বপ্নে ভাবিয়াছিলেন যে, তাহা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত কলিকাতা আজি এই নয়ন-প্রীতিকর, প্রাসাদ মণ্ডিত, মহা নগরে "পরিণত হইয়া প্রাচ্য বৃটিস শক্তির কেন্দ্র স্থানীয় হইবে !

জব চার্ণক ! তুমি যদি একাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে, অথবা স্বর্গে নরকে কিম্বা প্রেতলোকে,—কে জানে,—যে খানেই থাক, যদ্যপি এক্ষণে সেণ্টজনস্* গির্জ্জাস্থিত তোমার সমাধি-মন্দির নিম্ন হইতে উ... হইয়া আসিয়া দেখ, তাহা হইলে কিদেখিবে ? দেখিতে পাইবে যে, তোমা... প্রতিষ্ঠিত নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লী—যে স্থানে তুমি এক সময়ে বসিয়া আর... প্রদায়িণী তাম্রকুট সেবন করিতে এবং দেশীয় অপরাধীদিগকে বেত্রাঘা... করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া তাহাদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে সঙ্গীত ধ্ব... ন্যায় শ্রবণ সুখ অনুভব করিয়া তুমি পুলকিত হইতে, আর ঐ সঙ্গীত সুধা পানে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া আহারীয় দ্রব্য সকল দ্বিগুণ ক্ষুধা ও আস্বাদের সহিত ভক্ষণ করিতে,—এক্ষণে দেখিয়া বিস্মিত হইবে যে, সেই ... এক মহানগরীতে পরিণত হইয়া সমস্ত ভারত-শাসন কেন্দ্রীভূত হইয়া... এক্ষণে আর ব্যাঘ্র, বরাহ, কুম্ভীর ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ... বেষ্টিত ভাগীরথী পার্শ্বে কয়েক খানি কুটীর মাত্র দৃষ্ট হয় না। ওয়া... আভিংয়ের রিপ ভ্যান উইংক্লের ন্যায় নিদ্রা অবসানে জাগরিত ... দেখিতে পাইবে যে, আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিকের যষ্টি প্রভা... তোমার কলিকাতার প্রথমাবয়ব(১)অভ্রংলিহ বনস্পতিরস্থলে সুন্দর সৌধমা... গঠিত হইয়াছে। বঙ্গের জীবনান্ত উইলিয়াম দুর্গ ও উহার পরি...

* যাহাকে আমরা পাথুরিয়া গির্জ্জা বলিয়া থাকি।

(১) Embryo.

জীবনও দুদিনের ;—ভালবাসায় জীবন,—জীবনে ভালবাসা ; পরমাত্মার যখন দেহের প্রতি ভালবাসার হ্রাস হয়,তখনই জীবনলীলা ফুরাইয়া যায়, পরমাত্মার ও দেহে যখন বড়ভাব থাকে, তখনই জীবন-কাল, ভাব তিরোহিতের সময়ই অন্তিমকাল। তাই বলি, ভালবাসায় জীবন। আর সে জীবন ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। যে জীব সে ভালবাসার পাত্র, তাহার জীবনেই ভাল বাসা—তাহার জীবনে প্রেম ; অন্য কাহারও উপরে না হয় নিজের সঙ্গে নিজের প্রেম ; তাই বলি প্রত্যেক জীবনেই ভালবাসা ; কিন্তু এ প্রেম দুদিনের ! চিরস্থায়ী নয়,— নশ্বর ! দুদিনের যাহা, তাহাই নশ্বর ; দুদিনই নশ্বরের ; দুদিনের প্রধান গুণ "নশ্বরত্ব", আর অতীত অনন্তের যাহা, তাহা অবিনশ্বর, সুতরাং তিনই—কেবল সেই ভগবানই অবিনশ্বর—অনন্ত কাল স্থায়ী !

শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী।

স্বপ্নদর্শন—কলিকাতা।

জব চার্ণকের নাম ইতিহাস-পাঠকদিগের অবিদিত নহে। বঙ্গদেশে পূর্ব্ব-ভারত-বণিক সমিতির বাণিজ্যের আরম্ভ কালে তিনি উক্ত সমিতির প্রতিনিধি পদাভিষিক্ত ছিলেন। প্রাচ্য বৃটিস-সাম্রাজ্যের—ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা জবচার্ণক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্যকার ভারতের, বাণিজ্য কেন্দ্র সমৃদ্ধিশালী মহানগরী একসময়ে ভাগীরথী তীরে কয়েক খানি সামান্য গ্রামের সমষ্টি মাত্রছিল। ঐ গ্রাম সমূহ নিম্ন জলা ভূমি, ধান্য ক্ষেত্র এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু পূর্ণ মহাবনে পরিবেষ্টিত ছিল। সপ্তগ্রাম, রাজমহল, ঢাকা, নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নগর সমূহ পর্য্যায় ক্রমে বঙ্গের রাজধানী পদাভিষিক্ত হইয়া নিজ গৌরব ও সমৃদ্ধি জগৎকে দেখাইয়াছিল। উহারা এ জগতে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া কালের গর্ভে ভাসিয়া গিয়াছে। যত কাল ইতিহাস বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন উহাদের নাম এবং গৌরব-কাহিনী বিলুপ্ত হইবেনা বটে, কিন্তু উহাদের স্মৃতি—জন সাধারণের মন হইতে কাল-প্রবাহের সহিত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে।

কালের অনিবার্য্য গতি কে রোধ করিতে পারে ? ইহা মানুষের সাধ্যাতীত। এক গড়িতেছে আর ভাঙ্গিতেছে। আবার গড়িতেছে অন্যে তাহা ভাঙ্গিতেছে। এ জগতে পরিবর্ত্তন ভিন্ন কথা নাই। এই উপস্থিত কলিকাতা মহানগরী এক সময়ে বা কি ছিল—আর আজই বা কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যে জব চার্ণক এ নগরের ভিত্তিমূল প্রোথিত করিয়াছিলেন, তিনি কখন কি একবারও স্বপ্নে ভাবিয়াছিলেন যে, তাহা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত কলিকাতা আজি এই নয়ন-প্রীতিকর, প্রাসাদ মণ্ডিত, মহা নগরে "পরিণত হইয়া প্রাচ্য বৃটিস শক্তির কেন্দ্র স্থানীয় হইবে !

জব চার্ণক ! তুমি যদি একাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে, অথবা মৃত্যুর পর নরকে কিম্বা প্রেতলোকে,—কে জানে,—যে খানেই থাক, যদ্যপি এক্ষণে সেণ্টজনস্* গির্জ্জাস্থিত তোমার সমাধি-মন্দির নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া আসিয়া দেখ, তাহা হইলে কিদেখিবে ? দেখিতে পাইবে যে, তোমার প্রতিষ্ঠিত নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লী—যে স্থানে তুমি এক সময়ে বসিয়া আর প্রদায়িণী তাম্রকুট সেবন করিতে এবং দেশীয় অপরাধীদিগকে বেত্রাঘাত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া তাহাদিগের ক্রন্দন ধ্বনিতে সঙ্গীত ধ্বনির ন্যায় শ্রবণ সুখ অনুভব করিয়া তুমি পুলকিত হইতে, আর ঐ সঙ্গীত সুধা পানে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া আহারীয় দ্রব্য সকল দ্বিগুণ ক্ষুধা ও আস্বাদের সহিত ভক্ষণ করিতে,—এক্ষণে দেখিয়া বিস্মিত হইবে যে, সেই ক্ষুদ্র পল্লী এক মহানগরীতে পরিণত হইয়া সমস্ত ভারত-শাসন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এক্ষণে আর ব্যাঘ্র, বরাহ, কুম্ভীর ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পূর্ণ বেষ্টিত ভাগীরথী পার্শ্বে কয়েক খানি কুটীর মাত্র দৃষ্ট হয় না। ওয়াশিংটন আভিংয়ের রিপ্‌ভ্যান উইংক্লের ন্যায় নিদ্রা অবসানে জাগরিত হইয়া দেখিতে পাইবে যে, আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিকের যষ্টি প্রভাবে তোমার কলিকাতার প্রথমাবয়ব(১)অভ্রংলিহ বনস্পতিরস্থলে সুন্দর সৌধমালা গঠিত হইয়াছে। বঙ্গের জীবনান্ত উইলিয়াম দুর্গ ও উহার পরি

* যাহাকে আমরা পাথুরিয়া গির্জ্জা বলিয়া থাকি।

(১) Embryo.

ক্ষুদ্র গ্রাম গোবিন্দপুরের স্থান অধিকার করিয়াছে। বীর মদোন্মত্ত শ্বেতাঙ্গ যুবক দল বন্দুক হস্তে সদর্প-পদবিক্ষেপে ইংলণ্ডের জয় ঘোষণা করতঃ তথায় প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত। হে ইংরাজ, তুমি যখন তোমার ভিক্ষা লব্ধ ক্ষুদ্র গ্রাম কয়েকখানি অধিকার করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে, তখনই তুমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলে যে, অবশেষে কলিকাতা তোমার মহারাজ্যের আধিপতিত্ব করিবে। কিন্তু আবার যখন জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা নয়ন সমক্ষে উন্মোচিত হয়, তখনই হৃদয় ব্যথিত হয়। সকলেরি পরিণাম ভবিষ্যতের মায়া-যবনিকার অজ্ঞেয় পৃষ্ঠে রহিত। মনুষ্য দৃষ্টি সে গভীর তিমিরাচ্ছাদন পথ ভেদ করিতে অক্ষম। কে বলিতে পারে যে, এই কলিকাতা কত দিন ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী রূপে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া চারিদিকে নিজ গৌরব বিস্তার করিতে থাকিবে? যখন ...গৎ বিখ্যাত যুধিষ্ঠিরের বংশের নাম মাত্র শ্রুতি গোচর হয় না, যখন ...পরার্দ্ধস্বামিনী রোম নগরীর অধপতন হইয়াছে, যখন "দিল্লীশ্বরোবা ...গদীশ্বরো বা" শব্দের সার্থকতা আর শ্রুতি গোচর হয় না, ...খন ভুবন বিজয়ী সেকেন্দর সাহের রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়াগিয়াছে, যখন ...রাগ্রগণ্য নেপোলিয়ন শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল সেণ্ট ...লেনা দ্বীপে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যখন প্রতিজ্ঞা ... না হইতে প্রবল প্রতাপ রাণা প্রতাপের বংশধরেরা পিতৃকুটীরের স্থানে ...ধবলিত অট্টালিকা শ্রেণী স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, কেবল ... নির্জ্জীব প্রায় ... ক খানি সামান্য গ্রামের ... স্বর্ণ গ্রাম, সম্মানিভ শয্যায় ..., ধাপুরুষের সম্মানার্থ ... পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার স্মৃতি মাত্র রক্ষা ..., ভাগে শষ্পগুচ্ছ মাত্র স্থাপন করত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার স্মৃতি মাত্র রক্ষা ...য়াছেন। হিন্দুকুল সূর্য্য (২) "ভারত নক্ষত্র" (৩) রূপে পরিণত হইয়াছেন, ...জানে, কোন দিন খদ্যোতিকা রূপ ধারণ পূর্ব্বক কোন সামান্য পক্ষীর ...রসাৎ হইবে, তখন কে বলিতে পারে, ঈশ্বর না করুন, যে আবার ...মোর এই মহানগরী ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির আবাস ভূমি হইবে না? ...গের যখন কোন এক ভবিষ্যকালে মেকলে সাহেবের লেখনী প্রসূত

: বি... (২) The Races of Udoypur. (৩) Star of India.

জনৈক অসভ্য নিউজিলণ্ডবাসীর লণ্ডন সেতুর ভগ্ন স্তম্ভোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বক্র দৃষ্টিতে একদা প্রভূত ক্ষমতাশালী ইংলণ্ডীয় রাজনগরীর সুন্দর রূপে বিবৃত পর্য্যালোচনা ও মনোবিকারে ধ্বংস স্বপ্ন স্মরণ করি, তখন অসংখ্য প্রাসাদ শ্রেণী সুশোভিত প্রভূত ঐশ্বর্য্যের আধার এই কলিকাতা নগরের এককালে কি দশা উপস্থিত হইবে, মনে মনে ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

তাই বলি, হে কলিকাতা মহানগরি, তুমি আজ যে মস্তক উন্নত করিয়া গর্ব্বিতভাবে ভাগীরথী তীরে সদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ গৌরব, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য জগৎ সমক্ষে বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারত জাতির উপর আধিপত্য করিতেছ, কে জানে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তোমার চিত্র কিরূপ চিত্রিত হইবে! অতএব সাবধান, দেখিও যেন আর গর্ব্বিত ব্যাবিলন নগরীর ন্যায় ...মিও কালে অতি গর্ব্বিত না হও, প্রভূত পরাক্রমশালী মোগল সম্র...গের ইন্দ্রপুরী তুল্য দিল্লী নগরী, দেশবিখ্যাত নবরত্ন শোভিত মহারা...ক্রমাদিত্যের রাজধানী কান্যকুব্জের দশা স্মরণ কর।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সামায়িক পত্রিকা গুলির একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। ...সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় "বঙ্গদর্শনের" অনুকরণে আমাদের দেশের ... সমস্ত মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকা সমূহের আবির্ভাব। দীর্ঘকালব... সেই অল্প বিস্তর 'এক ঘেয়ে' রকমের প্রবন্ধাবলী পাঠে 'নিত্য... পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে—ইহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। আম... সহযোগীবর্গ ভূমিকার যিনি যাহাই লিখুন, কার্য্যকালে কিন্তু সেই ... রকমের "তোড় বড়ী খাড়া—খাড়া বড়ী তোড়" রূপে পত্রিকার ক... পূর্ণ করিয়া থাকেন। সেই বিভিন্ন লেখনী নিঃসৃত একটি ক্রমশঃ প্রক... উপন্যাস, এক বা ততোধিক সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্ম্মমূ... এবং কবিতাময়ী প্রবন্ধে সমগ্র সাময়িক পত্রিকা গুলি সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাই আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি যে, এখন হইতে "বিবিধ প্রসঙ্গে" ...সংখ্যাতেই আমরা কিছু কিছু নূতন বিষয়ের অবতারণায় পাঠকের ...র্পণ করিতে চেষ্টা করিব। সাময়িক প্রধানপ্রধান ঘটনা, মাসিক স... রহস্য, আমোদ প্রমোদ, সমাজ-চিত্র প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সার...

সর্ব্বসাধারণের হিতকর বিষয়ের চুম্বকমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় সংপূরণ করিব। "প্রচার" "মালঞ্চ" প্রভৃতি দু'একখানি সাময়িক পত্রও কিয়ৎ পরিমাণে এ পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কর্ণধারের আকার অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং আমরা দুই চারি পৃষ্ঠার অধিক ইহার জন্য ব্যয় করিতে পারিব না। ভরসা করি, সঙ্গত বোধ হইলে, অন্যান্য মাসিক, পাক্ষিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা গুলিও ইহার অনুসরণ করিবেন।

দারুণ গরম পরিয়াছে। বৈশাখ অতীত হইয়া জ্যৈষ্ঠ দেখা দিল, তথাপি একবিন্দুও বৃষ্টি নাই। চারিদিকেই হাহাকারের রোল উঠিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় গৃহের বার হওয়া নিতান্ত দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ...রূপ দীর্ঘকালব্যাপী গরম আমরা কখনও অনুভব করি নাই।

দক্ষিণ ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। একেত ইরূপ গ্রীষ্মের দারুণ প্রকোপ, তাহাতে আবার লোকে অন্নাভাবে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস করাল মূর্ত্তিতে বিভীষিকা দেখাইতেছে। সবে সূত্রপাত মাত্র;—বসন্ত, বিসূচিকা, উদরাময় প্রভৃতি দলবলের এখনও পূর্ণ প্রকোপ প্রকাশ পায় নাই, এখনও সংহার মূর্ত্তি মহাকাল 'মড়ক' ...বশে দেখা দেন নাই, কিন্তু অতি শীঘ্রই ইহার কোন প্রতিকার না হইলে, তাহারও বড় বেশী বিলম্ব নাই। চুরি ডাকাতি বিস্তর হইতেছে। অনাসন, ...র্দ্ধাসন কেবলই যে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—তাহা নয়, ...নেক গৃহস্থ ভদ্র পরিবারও ইহার ভীষণ প্রকোপ এড়াইতে পারিতেছেন ...। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে, কোন ভদ্র পরিবার নবাগত ...তাকে বহুচেষ্টায়ও এক মুষ্টি অন্ন দিতে না পারিয়া লোক লজ্জায় ...স্ত্রী পুরুষে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কি এখনও ...দ্রা যাইবেন? যে বহুস্থানব্যাপী ভীষণ আগুন জ্বলিয়াছে, দুই চারি ...র কলসী জলে তাহার কি উপশম হইবে? গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টার ...হাই বলুন না, এ বিষম সমস্যাপূর্ণ সময়ে প্রতি থানায়—প্রতি এলাকায় ও ...ত্তি হাটে মাঠে এক একটি অন্ন ছত্র খোলা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ...রসা করি, দয়াবান সার ষ্টুয়ার্ট বেলী শীঘ্রই এত গুলি প্রজার অকাল ...র পথ রোধ করিবেন। এ হতভাগা দেশের ধনকুবেরগণ ত কেবলই ...দ উল্লাসে মত্ত। রাজা, রায় বাহাদুর প্রভৃতি টাইটেল ওরফে 'ভিক্ষার ...র' জন্য,—সাহেব ভোজে, আসবাব সাজে, বৃথা কাযে রাশি রাশি অর্থ ...করিতেছেন, কিন্তু এ নিদারুণ সময়ে দেশের লোকের প্রাণ রক্ষার

জন্য যে ছুটে। অন্নছত্র খুলিয়া দুটো পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিবেন, তাহাতে যেন একবারে তাদের সর্ব্বনাশ হয়। হা কপাল! হা মনুষ্যত্ব!! হায় রে পয়সা!!!

সম্প্রতি পাথুরিয়াঘাটাস্থ "নর হুর্ল্লোড়" ধর্ম্মসভা সম্প্রদায় অনাবৃষ্টি নিবারণোদ্দেশে নগর সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ইষ্টদেবতার মহিমা-গান করিয়াছিলেন। সম্প্রদায়ের সদুদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

তাহিরপুর-রাজ শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের যত্নে শীঘ্রই কলিকাতায় একটি "জমিদার পঞ্চায়ৎ" সভা সংস্থাপিত হইবে। অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মিলনে এতদিনে দেশের একটি প্রধান অভাব দূরীকৃত হইবে, আশা করা যায়। সভার আর আর উদ্দেশ্যও অতি মহৎ। আ... ইহার একখানি অনুষ্ঠান-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। রাজা বাহাদুরের স্বদেশ হিতৈষীতা অ... প্রশংসনীয়। ভরসা করি, তাঁহার তীব্র অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্ন কখন পণ্ডশ্রম হইবেনা। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা, তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া এরূপ সদনুষ্ঠানে দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

এণ্টান্স, এল, এ, ও বি এ, পরীক্ষার ফল এবার অতি শোচনীয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি অন্যান্য বর্ষের তুলনায় এত মন্দ ফল আর কখনও হয় নাই। সিণ্ডিকেট-কর্ত্তৃপক্ষ ও পরীক্ষকদিগের হাত ... প্রশংসনীয় বটে!

এমারেল্ড থিয়েটার। নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ... এখানকার ডাইরেক্টার। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী আবা... সম্প্রদায়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। অনেকগুলি পুরাতন অভি... অভিনেতৃও ইহাতে অভিনয় করিতেছেন। সম্প্রদায়ের বড়ই দুরদৃষ্ট ... এত অর্থব্যয়েও কিছুতেই ইঁহারা আসর জমাইতে পারিতেছেন না। সুন... বড়ই মূল্যবান জিনিস! ইহা একবার নষ্ট হইলে সহজে আর মিলে না। ভরসা করি, ভাল ভাল নূতন নূতন নাটকের অভিনয়ে ইঁহারা পূর্ব্ব গৌ... অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। "আনন্দ কুমার" সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ... পারিলেও রাজনৈতিক নাটকের অভিনয় ইঁহারা সর্ব্ব প্রথম করিয়াছে... তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কয়েক সপ্তাহ হইতে এ সম্প্রদায়ে "... "রাজা বসন্তরায়" "নবীন তপস্বিনী" "মৃণালিনী" প্রভৃতি নাটকের অ... হইতেছে। কিন্তু শীঘ্রই বর্ত্তমান সময়োপযোগী নূতন, নূতন না... অভিনয় না হইলে থিয়েটার চলিবে কিরূপে?

ষ্টার থিয়েটার। সম্প্রতি এ সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "প্রফুল্ল" নামক নাটকের অভিনয় করিতেছেন। "প্রফুল্ল" নাটকের ঘটনাটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। সংসারে পাপের এত রকমও ভীষণ চিত্র আছে রে! সাক্ষাৎ মদিরা রাক্ষসীর বিভীষিকাময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি এবং নৃশংস সহোদরের লোমহর্ষণপূর্ণ পৈশাচিক স্বার্থসিদ্ধি ও তাহার পরিণাম—পাপ পুণ্যের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এই নাটকের প্রাণ। এই দুই তীব্র হলাহলের সংস্পর্শে একটি শান্তিময় সোণার সংসার কিরূপ ভীষণ শ্মশানাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাই নাট্য-চিত্রে প্রতিফলিত করা নাটককারের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা এ চিত্রটি দেখিয়া আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। প্রতিভাবান নাট্য-চিত্রকর গিরিশচন্দ্রের নিকট আমরা আরো কিছু অধিক প্রত্যাশা করি। এতগুলি চরিত্রের একত্র সমাবেশ কিছু নয়। ভিন্ন প্রকার মানব প্রকৃতি ও ঘটনা-বৈচিত্র্য এক নাট্য-চিত্রে প্রতিফলিত করা সম্ভবপর নয়;—হৃদয়ের অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে যেন গড়া ছাড়িতে দেয় না, প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে দেয় না, ভাবিতেও অবসর দেয় না। ডাক্তার ওরফে গো-বৈদ্য ও তাহার বহুরূপী দানবী পত্নী—এ দুইটি চরিত্রের খেই খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। যোগেশ, রমেশ, সুরেশ ও প্রভুভক্ত পীতাম্বরের চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। তবে স্থানে স্থানে কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে। যোগেশের উন্মত্ততা, রমেশের ভীষণ স্বার্থপরতা দেখিয়া—পাঠক, তুমি কখন শিহরিবে—স্তম্ভিত হইবে—হাসিবে ও মনে মনে সমস্তই বুঝিবে,—এবং "বেশী বুঝিয়া হয়তও একটু একটু কাঁদিবে।" নাটকের নামকরণ ঠিক হয় নাই; "প্রফুল্ল" নাম না দিয়া "যোগেশ" রাখাই ভাল ছিল। "যোগেশ, "রমেশ" ও "ভজহরি" প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। সাজ সজ্জা ও দৃশ্যপট অতীব প্রশংসনীয়।

বেঙ্গল থিয়েটার। এ সম্প্রদায় বনেদীভাবে বেশ একরূপেই চলিতেছেন। "শৈলজা" "প্রভাস" "পরীক্ষিৎ" পূর্ব্ববৎ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়োপযোগী প্রকৃত নাটকের প্রতি কি ইঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে না?

বঙ্গভূমি সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে এক আধ দিন 'সাহায্য-রজনী' দিবেন না?

দ্বিতীয় বৎসর, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১২৯৫-৯৬।

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১। সংসার আশ্রম (উপন্যাস) সম্পাদক ... ১৪৫
২। ফুলের সাজি (কবিতা ও গান) ... ১৮৯
সাধন সঙ্গীত ... ৺ রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর
পাতা ... শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায়
বিরহ-গীতি ... শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার
সুন্দরী ... শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী
৩। বিবিধ প্রসঙ্গ ... সম্পাদক ... ১

জনৈক মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ভূপতি মহোদয়ের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কর্ণধার কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান শাখা তত্ত্ব প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

JUST PUBLISHED.

Three years among the Americans. Being part 1 of "English and American Reminiscences." By Amrita Lal Roy, Editor "Hope."

Part II. entitled "England and India," will be published in course of about a month. Price, each part, Re I, both parts, Re. 1-12.

But both parts will be given free to every subscriber of "Hope" remitting one year subscription (Rs. 4) in advance.

As only a limited number of copies have been printed, applications should be made at once to

N. M. ROY,
65, Okhil Mistry's Lane, Calcutta.

পুরষত্ব-হানির মহৌষধ।

আমেরিমা হইতে আনীত ও নূতন আবিষ্কার মূল্য ৫ প্যাকিং।০ এই ঔষধে সকল প্রকার ধ্বজভঙ্গ, শুক্রক্ষয় ও শুক্রপাত-জনিত মাথাধরা, দৌর্ব্বল্য আরোগ্য হয়। ইহা ধারণাশক্তি-বৃদ্ধির একটি অমোঘ ঔষধ! সকলের বিশ্বাস, মেহ, স্বপ্নদোষ, সপূজ ধাতুনির্গমন, খড়িগোলার মত সাদা প্রস্রাব কিছুতেই আরোগ্য হয় না। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সপ্তাহ এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শুক্রের তরলতা দূর হইয়া গাঢ় হওয়ায় ধাতুশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। আমরা এই ঔষধ আনাইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; সকলেই ফললাভ করিয়াছেন। এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মেহ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। ইহাতে পারা বা অন্য কোন হানিকারক পদার্থ নাই। ২০ দিনের ঔষধ প্রতি শিশি মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র, প্যাকিং।০ চারি আনা। সাবধান ভয়ানক অনুকরণ, সাবধান! এই ঔষধের অসীম উপকারিতা ও বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া কতিপয় প্যাটেণ্টওয়ালা এই ঔষধের নকল আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রেতা গণ! সাবধান! আদত আমেরিকা হইতে আনীত প্রসিদ্ধ "পুরুষত্ব-হানির মহৌষধ" কেবল ৩৯নম্বর ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গীহাটা, কলিকাতা, ভারতবর্ষের একমাত্র এজেণ্ট এ, সি, মুখার্জি কোর নিকট পাওয়া যায়। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক

সংসার আশ্রম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লোকের মানসিক অবস্থা সমভাবে অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না প্রতিনিয়তই ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সময়ের তারতম্যানুসারে মনোভাব বিভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। প্রাতে যে 'তুমি' ছিলে মধ্যাহ্নে আর সে 'তুমি' নও, এবং মধ্যাহ্নে যে 'তুমি' ছিলে, সন্ধ্যাগমে সেই 'তুমির' পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দণ্ডে দণ্ডে—পলে পলে—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমার মনোভাব বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। ইহার প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব নিয়ম—ইহাই ভগবানের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি-কৌশল!

যদি এরূপ না হইত, তাহাহইলে এত দিন মানব-জগতের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ! অহর্নিশি তুষানলে পুড়িয়া রক্ত মাংস নির্ম্মিত মানব দেহ কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে—বলত? অবস্থানুযায়ী ঘটনা স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে—পাপ পুণ্যের তুমুল সংগ্রামে —মনে মনে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কয়জনে এ আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ পূর্ণ সংসারে তিষ্ঠিতে পারে—বলত? পক্ষান্তরে আবার নিরন্তর দুগ্ধ ফেণনিভ কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া বহু ভোগ বিলাস দ্রব্য উপভোগে বা কয়জন শান্তি সুখে কাল কাটাইতে পারে—বলত? বলিহারি, ভগবানের কি মহিমা—প্রকৃতির কি সৃষ্টি রহস্যই রে! এ অনিবার্য্য নিয়মের বিপরীত ফল যে ভোগ করে, সে হয় ঘোর উন্মাদ—নয় কোন কঠিন রোগে —না হয় অতি সত্বর অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়। জ্ঞাতসারে হ'ক বা অজ্ঞাতসারেই হ'ক, ধীরে ধীরে—মৃদু পাদবিক্ষেপে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব অবস্থানুসারে পর পর কেমন মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিতে থাকে! একের খেলা শেষ হইলেই অমনি আর একটির আবির্ভাব হয়, আবার একের পরিতৃপ্তি হইলে অন্যটি পুনরায় কেমন তাহার স্থান অধিকার করে। বলিতেছিলাম, পরিবর্ত্তনই মানব প্রকৃতির ধর্ম্ম,— আর পরিবর্ত্তনই

জীবের প্রাণ! এই পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই সুখের পর দুঃখ—আর দুঃখের পর সুখ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, আর মানুষও তাই মোহিনী আশায় বুক বাঁধিয়া বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে মনকে প্রবোধ দিতেছে।

দুঃখিনী আনন্দময়ী নিরুপায় হইয়া এক্ষণে তাঁহার পিত্রালয়ে আসিয়াছেন, অভাগা পুত্রগুলিও ছায়ার সমান তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। এখানে আসিয়া তাঁহার দারুণ দুঃখের বিশেষ কিছু উপশম হয় নাই—বরং মনোকষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে শৈলেন্দ্র ও সুদিনের কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। অভাগিনীর দুঃখের বোঝা কিছু কমে নাই, অথচ তাঁহার প্রাণে এমন অমানুষী সহিষ্ণুতা কে আনিয়া দিল, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হৃদয়ের পরতে পরতে অহর্নিশি তুষানলে পুড়িয়া সমস্তই সহিয়া গিয়াছে, এখন যেন আর কোন কষ্টই তাঁহার নূতন বলিয়া বোধ হয় না। বরং এক্ষণে যেন অপেক্ষাকৃত তিনি কিছু পরিমাণে শান্তি সুখ লাভ করিতেছেন। শৈলেন্দ্রনাথও বন্ধু সুদিনের সহবাসে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। বুঝিয়াছেন, এ সংসার [illegible]রীক্ষার স্থল। মঙ্গলালয় ভগবানের প্রেম রাজ্যে কিছুই অসুখের নয়। [illegible]যণ দারিদ্র্য দুঃখ, কঠোর অভাব ও ভীতিপ্রদ বিপদের হস্তে ফেলিয়া [illegible]নি ভক্ত পুত্রের পরীক্ষা করেন মাত্র। দেখেন, ইহাতেও তাঁহার মনে [illegible]র্ব্বমাঙ্গল্যে পূর্ণ বিশ্বাস' বিচ্যুত হইয়াছে কি না! জলন্ত অঙ্গারেই স্বর্ণের উ[illegible]ক্ষা হয়,—ভস্মরাশির মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিলেই বা কি আর না [illegible]লেই বা কি, সে সোনার 'আসল বা খাদ' কিরূপে নিরূপিত [illegible]? পারিবারিক বিপদ দারিদ্র্য দুঃখ বা কঠোর অভাবই [illegible] জলন্ত আগুন, আর বিশ্বাসী ভক্ত হৃদয়ের মনোবৃত্তি সেই পরীক্ষিত [illegible]ণা!—শৈলেন্দ্র এ গভীর উদাত্ত ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেন এবং [illegible]র অকৃত্রিম স্নেহ ও আশ্বাস বাক্যে সে ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া [illegible],—সুতরাং ক্রমে তিনি সহজেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। নতুবা যে [illegible]ন্দ্রনাথ দুইদিন পূর্ব্বে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প প্রায় ছিলেন, যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে মনে মনে ক্ষত বিক্ষত হইয়া জীবনকে

বিষম ভারবহ বোধ করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রকার আশা ভরসা ও ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যিনি বৈরাগ্যের উচ্চসীমায় উপনীত হইয়া জীবন যাপন করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন, অতি অল্প যত্নে অকস্মাৎ তাঁহার মনের সে গতি ফিরিল কেন? যে প্রাণ ভীষণ মরুভূমি সদৃশ নীরস ও ভয়াবহ ছিল, যাহাতে বাড়বাগ্নি সদৃশ অহর্নিশি ধু ধু রব শ্রুত হইত, আজ সেই প্রাণই আবার কেমন শান্তি উপবনের ন্যায় সরস ও স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইল! ধন্য চক্রী, ধন্য তোমার বিশ্ববিমোহন সুদর্শন!

"আশা নাচায় কাঁদায়!" বস্তুতঃ কথা ও তাই; এও সেই আশার খেলা—আশার ছলনা! তুমি মনে করিতেছ, এত দুঃখ নির্য্যাতন বিপদের পর তুমি যে একটু সুখের মুখ দেখিলে, এ সুখ আর তোমার যাইবে না—ইহাতে তুমি আর বঞ্চিত হইবে না! কিন্তু এটি তোমার মহ[illegible] ভ্রম! বিশাল বিশ্ব সংসারের অপূর্ব্ব পরীক্ষা ক্ষেত্রে তুমি অপরিণামদর্শী শিশু মাত্র; মানব প্রকৃতির অভিধান এখনও তোমার অভ্যস্থ হয় নাই; 'দোরঙা খোলের' তুমি এক পিঠ মাত্র দেখিয়াছ, তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ। ঐ যে ভীতিপ্রদ ভীমা তামসীর মধ্যে মাঝে মাঝে এক এক বার বিজলী হানিতেছে, পথভ্রান্ত পরিশ্রান্ত পথিকের পক্ষে কি উহা সুমঙ্গল? কখন নয়। সেইরূপ উপর্য্যুপরি বিপদ, অভাবের তীব্র কষাঘাত—ও পারিবারি[illegible] দুর্ঘটনার মধ্যে মাঝে মাঝে যে একটু একটু আবছায়া মাত্র সুখের বি[illegible] জ্যোতি প্রকাশ পায়, তাহা আর কিছু নয়—বিশাল কার্য্য ক্ষেত্রে মানু[illegible] পরীক্ষা মাত্র। ভাগ্য ফল ও গ্রহ-বৈগুণ্য রোধ করে সাধ্য কার?

বন্ধু সুদিনের যত্নে শৈলেন্দ্রনাথ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, অভাগিনী আনন্দময়ীও দারিদ্র্য দগ্ধ হৃদয়ে একটু শান্তি পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু কে জানে—কাল চক্র আবার কি ভাবে ঘু[illegible] ঘুরিতে কোথায় আসিয়া উপনীত হইবে! ঐ বসন্তের সুপ্রভাত, সু[illegible] পরিষ্কার আকাশ, কিন্তু কে জানে—আবার কখন উহা ঘোর ঘন ঘটা সমাচ্ছ[illegible] বেশে ক্ষণপ্রভায় চমকিত হইয়া ভীষণ অশনি সংযোগে জীব মণ্ডলীকে [illegible] করিয়া তুলিবে? কে জানে, আবার কখন কোথা হইতে নির্ম্মম [illegible] দস্যু কিরূপে আনন্দময়ী ও শৈলেন্দ্রের সুখ-রত্ন অপহরণ করিয়া [illegible]

দিগকে গভীর শোক সাগরে নিক্ষিপ্ত করিবেন? তাই বলিতেছিলাম, দুস্তর দুঃখের মাঝে কণামাত্র সুখ লাভে উন্মত্ত হইওনা—অধীর হইও না। 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস' খোওয়াইও না। 'আজ আছে—কাল নাই' যাহার সম্বন্ধ, 'এই ছিল—আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্দ্ধান' যাহার ধর্ম্ম, সে মোহিনী কল্পনায় ও 'ভেক' আশা-প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়া অপরিণামদর্শী ও অপক্কবুদ্ধির পরিচয় মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণত মানুষের মন কখন সমভাবে অতি দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইতে পারে না, আর প্রকৃতির নিয়মও তাহা নয়। তাহা হইলে তাহার বিপর্য্যয় ঘটে। কে যে কি ভাবে মানুষের মনে এ অপূর্ব্ব ভেদ বৈষম্য ও পরিবর্ত্তন-ভাব আনিয়া দেয়, কোথা হইতে কিরূপে যে এ ভাবের অভ্যুদয় হয়, তাহা মানুষের কল্পনা-শক্তি ও বিচার মীমাংসার অতীত। দুঃখিনী আনন্দময়ী ও সংসার বিরাগী শৈলেন্দ্রের জীবনই আমাদের পরিচয়-স্থল। ...ত ভাই নিরীশ্বরবাদী বৈজ্ঞানিক,—ভাই দার্শনিক! বল দেখি, এ রহস্যের মূল কি ভাই! একটু 'মনকে চোখ ঠাওরিয়া' ভাবিয়া দেখ দেখি, এ শান্তি ...ণা প্রাণে কে আনিয়া দেয়! তোমার কূট-তর্ক শুনিতে চাহিনা, তোমার নাসিকা-বিস্ফারিত দাম্ভিকতা পূর্ণ যুক্তিও বুঝি না, একটু বেশ সরলভাবে ধীর প্রশান্ত-চিত্তে বুঝাইয়া দাও দেখি, কেন এ কারণ-কার্য্য-হীন অভাব-...য় ভাবের অভ্যুদয় হয়? আহা, ভক্তবৎসল ভগবানের এ স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ ...মের আস্বাদ পেলিনি রে! ধিক তোর মনুষ্য-জন্মে। আহা, এত দয়া ... কার রে!—এত প্রেম আর কোথায় রে!—এত ভাব মাধুর্য্য আর ...দ্রাণ রে! ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বাসী হৃদয়, ধর্ম্মে আত্ম মন প্রাণ-সমর্পণকারী দরিদ্র ... —ধন্য তোমায়! ভগবানের এমন করুণা আর কাহার উপর আছে? ...ত তোমার ন্যায় এমন ভাগ্যবান আর কে?

... দুঃখিনী আনন্দময়ী আপন সুদুর্লভ সরলতাগুণে পিত্রালয়ে এক প্রকার ...রুদ্বেগে কাটাইতে লাগিলেন। যে বাস্তবিক-ই ভাল,—শত্রুরও তাহার প্রতি ... দয়া হয়; বস্তুত কথাটি ঠিক। সুতরাং এখানেও পাড়াপ্রতিবাসী ...ন্দ্রষ সকলেই আনন্দময়ী ও তাঁহার পুত্রদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে ...ছিলেন।

শৈলেন্দ্র—বন্ধু সুদিনের যত্নে এক্ষণে বেশ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। অহর্নিশি দুঃখানলে পুড়িয়া পুড়িয়া এখন তাঁহার চিত্ত সংযম অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। 'খাদ' বাদে 'আসল গিনির' সারটুকু প্রকাশ পাইয়াছে। তবে এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সময়ে এ 'আসল' হইতেও আবার 'খাদ' বাহির হইবে। চাই কি, আগুনের তেজ পূর্ণগ্রাসী হইলে সমূলেও ভস্মীভূত হওয়া বিচিত্র নহে। শৈলেন্দ্রের দুঃখ-অগ্নি ও হৃদয়-স্বর্ণ—এ দুই-ই এখন অসম্পূর্ণ। তিনি অনেক সময় তাঁহার বন্ধু সুদিনের বাটীতে অতিবাহিত করিতেন। দীর্ঘকাল একত্র সহবাসে শৈলেন্দ্র ইঁহাদের বাটীর সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করেন। পল্লীগ্রামে নিয়মই এই, পাড়াপ্রতিবাসী সকলের সহিত সকলেরই একটা সম্বোধন সূচক লৌকিক সম্বন্ধ থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠানুসারে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও শূদ্রকে 'দাদা' 'কাকা' 'জেঠামশায়' ইত্যাদি 'সম্বোধন' ব্যবহার করে। অধিক কি, বাটীতে বেশী দিনের পুরাতন খানসামা ভৃত্য থাকিলেও, প্রভুর পুত্র কন্যাগণ—আর স্বয়ং খোদকর্ত্তাও যদি সেই ভৃত্যের সেবা শুশ্রূষায় 'মানুষ' হইয়া থাকেন, তবে তিনি অবধিও তাহাকে উক্ত সম্মান সূচক সম্বোধন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত নব্য যুবক দল কিন্তু এরূপ সম্মান সূচক সম্বোধনে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন এবং ঈদৃশ হেয় পুরাতন প্রথারও বড় একটা পক্ষপাতী নন। যত শীঘ্র এ সকল অসভ্য রীতি নীতি (?) দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়, ইঁহারা ... জন্য বড়ই তৎপর। অথচ মুখে 'সাম্য—স্বাধীনতা—মৈত্রীর' আস্ফালন! ... পোড়া শিক্ষা, সভ্যতা আর একালের মুখে ছাই!

বন্ধু সুদিনের বাটীতে শৈলেন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত সম্পর্ক পাতান সম্বো... অসদ্ভাব ত ছিল-ই না,—তা'র উপর আবার তাঁহার বেশী ঘনিষ্ঠতা-যেন সত্য সত্যই উক্তবিধ সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইয়া আসিল। সুদিনচ... শৈলেন্দ্রের মাতা প্রভৃতিকে এই রূপ সম্বোধন করিতেন। তিনিও উত্তরো... তাঁহাদের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। শৈলেন্দ্র ও সুদি... আত্মা—এক প্রাণ হইলেন। ইহারই নাম বন্ধুত্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—"আশা নাচায়—কাঁদায়!" বস্তুত কথাও ঠিক।

দুঃখিনী আনন্দময়ী ও তাঁহার পুত্রগণ অপেক্ষাকৃত এক্ষণে যে একটু নিরুদ্বেগে থাকিয়া সুখের মুখ দেখিতেছিলেন, নির্ম্মম কাল দস্যু তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। প্রজ্বলিত বিপদাগ্নিতে আবার হৃদয়জাত স্বর্ণের পরীক্ষা হইতে চলিল। প্রকৃতির বিশাল বিশ্ব রঙ্গভূমে মানুষের ভাগ্যাভিনয়! এ অভিনয় নিয়তই ঘটিতেছে, সাধারণের চক্ষে অপ্রত্যক্ষীভূত হইলেও সূক্ষ্মদর্শী আত্মচিন্তানিরত ব্যক্তিগণের নিকট ইহা অবিদিত নাই। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ, আর ক্ষণকাল ধৈর্য্য সহকারে আমাদের হরিহরের অভাগা পরিবার মণ্ডলীর জীবন-নাটকের শেষ অভিনয় দর্শন কর। ঘটনার পর ঘটনায়—কার্য্যের পর কার্য্যে—দেশ-কাল পাত্র ভেদে মানুষের পরিণাম কিরূপে কোথায় উপনীত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ৺ হরিহর রায় জীবিতাবস্থায় কন্যা কয়েকটির মধ্যে কবল মাত্র জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার দুইটি কন্যা অবিবাহিতা। তন্মধ্যে মধ্যমা হেমাঙ্গিনী এক্ষণে বিবাহোপযোগী হইয়াছে। পূর্ব্বকালে প্রাচীন ঋষিদিগের মতে ৮।৯ বৎসর বয়সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াই পদ্ধতি ছিল; কিন্তু এখনকার হাল আইনে দ্বাদশ—ত্রয়োদশ—চতুর্দ্দশ বৎসরেও কন্যা অরক্ষিতাবস্থায় থাকে। বিশেষতঃ বড় মানুষের ঘরে প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। পোড়া নবযুগের মুখে ছাই, আর কালের উন্নতিশীল সভ্যতার ক্ষুরে দণ্ডবৎ! হায়! আর কি সে কাল—সে শুভদিন ফিরিবে না?

হেমাঙ্গিনী এক্ষণে দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে। একে মৌলিক কায়স্থের কন্যা তা'তে পয়সা নাই, তার উপর আবার মেয়েটি দেখিতেও বড় সুশ্রী এ অবস্থায় সুতরাং তাহার বিবাহে বড় গোলযোগ ঘটিল। এখনকার পিতা মাতা—পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কিছু মোটা আয়ের সংস্থান করিয়া নিতে। ছেলে যার, তার গায়া কত! তার উপর আবার যদি তার

দু'মুটো খাবার সংস্থান থাকে, তবে আর তাকে পায় কে! এ ছাড়া আর একটি বিশেষ কথা বলিতে ভুলিয়াছি,—আজ কাল ইংরেজ বাহাদুরের কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়ে গোটাকত পাশ ওরফে 'চাপরাস' বাহির হইয়াছে, তাহার গৌরব কত! এই চাপরাস ধারণ করিয়া রাজ সরকারে চাকরি করিতে চাইলে, বড় জোর অদৃষ্ট ক্রমে—লেজের পরিমাণ-নূন্যাধিক্যে কাহার বিশ ত্রিশ টাকা বেতনের 'মাছিমারা' কেরাণী, কাহারও দশ পনর টাকা বেতনের সরকারী, আর কা'র কা'র ভাগ্যে বা কেবলই ১০ টা ৫টা 'নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া' দৌড়নই সার। এছাড়া গৌরাঙ্গের সবুট পদাঘাত বা "রামচাঁদ" শ্যামচাঁদের সুমিষ্ট প্রহার এবং সুধমাখা মধুর 'ড্যাম্—নিগার' প্রভৃতি বাক্য লহরী দ্বারা সম্বোধন ত মধ্যে মধ্যে আছেই। শ্বেত পুরুষদিগের নিকট 'জুজুটি' হইলেও 'জাত ভাইরের' কাছে কিন্তু ইঁহাদের আস্ফালন দেখে কে! বিশেষতঃ ইংরাজী অনভিজ্ঞ সেকেলের লোকদিগের কাছে ইহাঁদের বহ্বাড়ম্বর আরও কিছু অধিক।

এশ্রেণী পুত্রের পিতা মাতা 'দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে' চাহেন। অর্থাৎ পুত্রের আজীবন লেখা পড়ার ব্যয় এক বিবাহ উপলক্ষেই তুলিতে সঙ্কল্প করেন। আর তাও বলি, না করিয়াই বা করেন কি! পুত্রের আজীবন চাকরিতেও ত এ টাকা উঠিবে না। আর মূলেই যদি চাকরি না যোটে? হায়রে 'পাশকরা ছেলে'! গুণধর পুত্র একখানা চাপরাস পাইলে তাহার দর ন্যূনকল্পে ত দুই হাজার, দু'খানা পাইলে চারি হাজার, আর তিন চারখানা পাইলে একেবারে পাত্রীর পিতার বাস্তু ভিটাতেই হাত পড়ে। দুঃখ, নিগ্রহ, অপমান যাহা কিছু তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে, সকলেই পুত্রের মুখের পানে তাকাইয়া নীরবে সহ্য করেন, আর যাই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল, অমনি যেন হিংস্রক ভুজঙ্গের ন্যায় আততায়ীকে (পাত্রীর পিতা) দংশন করিতে উদ্যত হন। ইদানীন্তন আলোক প্রাপ্ত উদ্ধত যুবক যেমন পিতা প্রভৃতি গুরুজনকে 'ওল্ডফুল' ইত্যাদি বিশেষণে অলঙ্কৃত করেন, কিন্তু তিনি নিজে যখন বৃদ্ধ হইবেন, তাঁহার অদৃষ্টে সভ্যতালোক প্রাপ্ত উন্নতিশীল গুণধর পুত্রও যে তাঁহাকে ঐ ভাবে সম্বোধন করিবে—তাহা যেমন তিনি বিবেচনা করেন না, সেই রূপ আধুনিক

মাতা পুত্রের বিবাহ কালীন অন্ধ হন, কন্যার পিতার নিকট অতি নির্দ্দয় ভাবে জুলুম করেন ; কিন্তু একবার ভ্রমেও মনে স্থান দেন না যে, তাঁহাদের কন্যার বিবাহের সময়ও অন্য পাত্রের পিতা মাতাও তাঁহাদের সহিত এরূপ 'কষায়ে' ব্যবহার করিবে। ধিক্ এ পোড়া প্রথায়! *

হেমাঙ্গিনীর বয়স দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাহার বিবাহের কথা আন্দোলন হইতে লাগিল। কন্যার বিবাহ বিষয়ে বড় মানুষের অপেক্ষা গরীব দুঃখীদের বেশী ভাবনা। একে নিতান্ত দুঃখের দশা, তাহাতে উপস্থিত কন্যাদায়ে আনন্দময়ী অতিশয় চিন্তিতা হইলেন। সহরের মত পাড়াগাঁয় ঘটকীর বড় একটা রেওয়াজ নাই, ঘটক ব্রাহ্মণেরাই উভয় পক্ষের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। আনন্দময়ী এক ঘটককে এই সংবাদ দিলেন। ঘটক মহাশয় অগ্রিম কিছু পারিশ্রমিক আদায় করিয়া পাত্রের অনুসন্ধান করিতে সম্মত হইলেন এবং এক কাজের সঙ্গে আরও দু' এক কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘটক মহাশয়ের মুখের লম্বা চৌড়া কথাই সার, কাজে তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। পাঁচ সাত গ্রাম ঘুরিয়া তিনি যে দুই চারিটি সম্বন্ধ আনিলেন, তাহার কোনটিই সুফল প্রদ হইল না। কোনটির দর দুই হাজার, কোনটি বা হাজার, কোনটি পাঁচ সাত শ'। যেটি এই সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প মূল্যে পাওয়া গেল, সেটিতে কিন্তু দোষ বিস্তর। ছেলেটি স্কুল পাঠশালার ছাড়িয়াছে, মা সরস্বতীর সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, কোন কাজ কর্ম্ম করে না, বেশীর ভাগে একটু আধটু 'মাসীর হেল্‌থ' পান করেন, আর সুযোগ পাইলে 'ধরি মাচ—না ছুঁই পানি' গোছের চোরাগোপ্তাও খেলিয়া থাকেন। সুতরাং এ সম্বন্ধ কাহারও পছন্দ হইল না। বিশেষতঃ আনন্দময়ীর

* 'বিবাহ-বিভ্রাট' নামক এক খানি সাময়িক নাট্য-চিত্রে বর্ত্তমান বিবাহ ব্যবসায়ের বড়ই মর্ম্মভেদী রহস্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ফলতঃ, মধ্যে মধ্যে এরূপ তীব্র সমালোচনপূর্ণ ব্যঙ্গ নাটিকার আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। 'বিবাহবিভ্রাট' প্রণেতার নিকট আধুনিক হিন্দুসমাজ বহুল পরিমাণে ঋণী। আমরা প্রত্যেক 'পাশকরা ছেলের' পিতা মাতাকে এক একবার এই গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি।

একান্ত ইচ্ছা যে, ছেলেটির স্বভাব চরিত্র ভাল হয়, আর একটু আধটু লেখাপড়াও জানে। অবস্থা ভাল হয় খুব সুখের, মন্দ হইলেও তাঁহার বড় একটা আপত্তি ছিল না। ফল কথা, নির্ম্মল স্বভাব যে মানুষের সর্ব্ব প্রধান অলঙ্কার, আনন্দময়ী একথা বুঝিতেন। তিনি পাড়া প্রতিবাসী দু' একজন আত্ম বন্ধুকে এ দায় জানাইলেন। তাঁহার পিতৃব্য সম্পর্কে একজন আত্মীয় কলিকাতার সহরতলীতে একটি পাত্র স্থির করেন। এ পাত্রটি অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। কিন্তু ইঁহাদেরও 'খাঁই' নিতান্ত কম নয় ; ইঁহারাও ন্যূনকল্পে সর্ব্বসুদ্ধ ৫০০৲ টাকা চান। অতি বড় শত্রুরেরও যেন কন্যা দায় না হয় ; বিশেষতঃ আজ কালের বাজারে। কন্যা পক্ষেরই গরজ বেশী; সুতরাং আনন্দময়ী কন্যাটীকে লইয়া কলিকাতায় কোন এক আত্মীয়ের বাটীতে উঠিলেন। তথায় বরপক্ষীয়গণ কন্যা দেখিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ মাতার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনিও দু' একজন আত্মীয়কে লইয়া পাত্র দেখিয়া আসিলেন। উভয় পক্ষের এক প্রকার সম্বন্ধ স্থির হইল ; কিন্তু আসল বিষয়েই এখন একটু গোলযোগ ঘটিতেছে। বরপক্ষ বলিতেছেন যে, তাঁহারা ৫০০৲ টাকার কমে কিছুতেই রাজি নহেন। কিন্তু আনন্দময়ীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দশটী টাকার সংস্থান হওয়াই কষ্টকর ; অথচ এতগুলি টাকা যে কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে, তাহার কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট নাই। সাহসে ভর করিয়া অনেক কাকুতি মিনতিতে এক শ' টাকা কমিল, কিন্তু বাকী টাকারই বা উপায় কি? যাইহোক, এখন উপস্থিত ত লগ্ন পত্রাদি এক রকম হইয়া গেল, তারপর যাহা হইবার তাহা হইবে। সাধু সঙ্কল্পে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, তাহা প্রায়ই বিফল হয় না,—কোন না কোন প্রকারে তাহা সম্পন্ন হইয়া যায়।

৺ হরিহর রায় গতাসু হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একখানি তা কলিকাতাস্থ কোন আধুনিক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট বন্দক ছিল। ইঁহা সহিত হরিহরের কেবল মহাজন আর খাতক সম্বন্ধ নয়, সম্বন্ধেও ই হরিহরের ভায়রাভাই হইতেন। হরিহর চিরদিনই অতি সরল তির লোক, সহজেই যে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন ; বিষয়খানি বন্ধক দিবার সময়, আত্মীয়ের সহিত বিশেষ কিছু পাকা

লেখা পড়া করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, এই আত্মীয় ব্যক্তিটী একজন
‘বকা’ ধার্ম্মিক। কেবলি হরিহরের নয়,—অনেক গুলি নিরীহ ভদ্রলোকের
সম্পত্তি ইনি ছলে কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন। ইঁহার বাহিরের
আচার ব্যবহার বড়ই সৌজন্যতা পূর্ণ; তাই অতি অল্প দিনের মধ্যে ইনি
অনেক নিরীহ ভদ্রলোককে ‘দেউলে খাতায়’ নাম লিখাইয়া আপন স্থূলোদর
পূর্ণ করিয়াছেন। হরিহরের পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্রগণ
অনেক ‘সাধ্যসাধনা কান্না কাটী’ কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন, কিন্তু “বাজে
বাঙালী কয় কথা বাবু-ই না দেয় কাণ”—সুতরাং তাহাতে কোন ফল
দর্শে নাই।

উপস্থিত মহাদায়ে পড়িয়া আনন্দময়ী স্বয়ং শৈলেন্দ্র সমভিব্যাহারে
তাঁহার বাটীতে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের অনেক অনু-
রোধ উপরোধে অবশেষে যেন ভিক্ষার স্বরূপ (অবশ্য খতে লেখা পড়া
হইয়া) তিনি দুই শত মাত্র টাকা দেন। আনন্দময়ী পুত্র শৈলেন্দ্রকে
উপলক্ষ করিয়া আনন্দাশ্রুনীরে ভক্তিমাখাকণ্ঠে তাঁহাকে যথোচিত কৃতজ্ঞতা
প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু বাকী দুই শত টাকারই বা উপায় কি? মাতা
পুত্রে অর্দ্ধ হৃষ্ট অর্দ্ধ উদ্বিগ্ন চিত্তে বাসা-গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনেক বাদানুবাদ, চিন্তা ও সদ্‌যুক্তিতে শেষে এই স্থিরীকৃত হইল যে,
...র বিবাহের পূর্ব্বে ইতিমধ্যেই ধীরেন্দ্রের বিবাহ হইলে কিছু টাকা পাওয়া
...ব, সুতরাং সেই টাকায় অনায়াসে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইতে
...র। আনন্দময়ীর পিতৃব্য সম্পর্কীয় সেই আত্মীয় লোকটীই কলিকাতা
...তলীর মধ্যেই এক সম্বন্ধ স্থির করিলেন। আজ কালের বেটা
...দের বিবাহের জন্য বড় একটা বেশী অনুসন্ধান করিতে হয় না, সুতরাং
...চেষ্টাতেই পাত্রী স্থির হইল। আনন্দময়ী ধীরেন্দ্রকে চিঠি লিখাইয়া
...দিন হইতে কলিকাতায় আনাইলেন এবং বাচনিক আদ্যোপান্ত বিবরণ
...তে করিলেন। আপনাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ
... এতবিষয়ে সম্মতি দিতে একটু ‘ইতস্তত’ করিলেন, কিন্তু উপ-
...রায় উদ্ধার জন্য তাঁহার সে ‘কিন্তু’ ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।
...তঃ ভগ্নীর বিবাহ সম্পন্ন হইবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া

তিনি অনিচ্ছা সত্বেও ইহাতে বাধ্য হইলেন। স্নেহময়ী মাতা পুত্রকে অনুমতি করিলেন, মাতৃবৎসল পুত্রও জননীর আজ্ঞা—আত্মবন্ধু বান্ধবের অনুরোধ—নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলেন। শুভদিনে—শুভক্ষণে শুভ উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

ধীরেন্দ্রের বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাপ্য হইতে দুই শত টাকা হেমাঙ্গিনীর বিবাহার্থে প্রদত্ত হইল। বরপক্ষীয়দিগের ‘রফা’ পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল, তাঁহাদের ‘ফুরণের’ থোক্ চারি শত টাকা লইয়া তবে তাঁহারা ‘বরের হাতে সুতা’ পরাইলেন। বাপ, হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি!

শুভলগ্নে নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইল, আনন্দময়ীর প্রাণের যেন একটা বোঝা নামিল; ধীরেন্ শৈলেনের মনের উদ্বেগও থামিয়া গেল, আত্ম বন্ধু বান্ধবগণ সুখী হইলেন।

বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, আজ সকলেরই অন্তর উৎফুল্ল। আনন্দময়ী পুত্র কন্যা জামাতা—আত্ম কুটম্ব কুটম্বিনীদিগকে লইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন, মনে কত আশার কথা তুলিয়া বুক বাঁধিতেছেন,—কিন্তু হায়, নির্ম্মম গ্রহের কুলাল চক্র তাঁহাকে অধিকক্ষণ সে সুখ উপভোগ করিতে দিল না। বর্ষা অবসানে শরতের আকাশ—প্রকৃতির বিচিত্র লীলাময়ী দৃশ্যে সকলেই উৎফুল্ল—উল্লাসিত, কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হইতে ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন মেদিনী—ভীষণ অশনিপাতের ভীম নিনাদে বিকম্পিতা হইয়া মহাপ্রলয়ে লীন হইবার উদ্যোগ করিল। জল স্থল ব্যোম যেন ভীষণ সংহার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া আশ্রিত জীবগণের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। হায়,—‘এই আছে—এই নাই’—এরি জন্য এত রে! দুঃখিনী আনন্দময়ীর ভাগ্যে “হরিষে বিষাদ” হইল। তাঁহার অদৃষ্ট-পটের অন্য এক দৃশ্য প্রদর্শিত হইল, হৃদয়-যবনিকা উত্তোলিত হইয়া জীবন নাটকের আর দৃশ্য আবির্ভূত হইল, ঘটনা-স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত আরও প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতে লাগিল। সে দৃশ্য বড়ই শোচনীয়—বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, সহৃদয় পাঠক, আমাদের অনুসরণ কর, সমস্তই বুঝিতে পারিবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি নৈসর্গিক পদার্থে ও পঞ্চভূতময় প্রকৃতির কার্য্য কলাপে কোন ইতর বিশেষ পক্ষপাত ভাব নাই, ভেদ দৃষ্টি নাই, উঁচু নীচু ‘মুখ চাওয়াচাওয়ি’ বিচার নাই। ইহার সম্বন্ধ অটুট, অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যম্ভাবী। রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী—সকলের প্রতিই ইহার সমান অধিকার, ইহাতেও সকলের অধিকার সমান। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপ, বর্ষার অবিশ্রান্ত জলধারা, হিমানীর দুর্দ্দমনীয় শৈত্য—তোমার আমার পক্ষে যেরূপ ক্লেশপ্রদ, সপ্ত সসাগরাধিপতি অতুল সম্রাট হইতে পথের ভিকারীরও সেইরূপ অনুভূত হয়। ভীষণ অশনি-পাত, মহা বন্যা, প্রবল ভূমিকম্প সকলকেই সমান বিপদগ্রস্থ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আবার মলয় মারুত, চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণ, জ্যোৎস্নার মধুর হাসি, ভূলোকে নন্দন কানন শোভা—বিচিত্র রাম-ধনু—তোমার আমার প্রাণে যেমন আনন্দোৎপাদন করে, আপামর জন সাধারণের পক্ষেও সেই রূপ হয়। সূর্য্য কিরণ রাজ প্রাসাদে যতটা পতিত হইবে, তোমার আমার—‘রাম শ্যাম’ —দীন দুঃখীর কুটীরেও সেই পরিমাণে [প্র]বেশ করিবে। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন ;—ইহা আবাহমান [কা]লি পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে—চিরদিন হইবেও ; ইহাতে দেশ কাল পাত্র [illegible]-বিচার নাই। সকলেই ইহার গতিতে আকৃষ্ট, ইহাও সকলের সমান [illegible]র স্বাধিকারে। তবে এই দিন,—এই অতীত নিশির স্মৃতি প্রভাত—[illegible]দ্রাতরও পক্ষে ‘সু’—আর কাহারও পক্ষে বা ‘কু’ হইয়া থাকে। সেটা [illegible]র সর্গ প্রকৃতির দোষে নয়, আপন আপন অদৃষ্ট ও কর্ম্ম ফলে। দুঃখিনী [illegible]ন্দময়ীর ভাগ্যে আজ ‘কু’ প্রভাত হইল। হাস্যমাখা বালার্ক কিরণ [illegible] হইত না ফুটিতে তাঁহার হৃদয় কপাট তামসীর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন [illegible]হল।

[illegible]ক প্রভাত হয় নাই,—অর্দ্ধ আলো অর্দ্ধ আঁধারে ব্যোমদেশ সমাচ্ছন্ন। [illegible]দয় জ্যোতির্ম্ময় মহান্ বিরাট মূর্ত্তি ধীরে ধীরে চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত [illegible]তেছেন। তাঁহার আগমন দেখিয়া বিহঙ্গম কুল সুললিত মধুররবে

প্রভাতী গানে দিগ্‌মণ্ডল বিকম্পিত করিয়া তুলিল ; মহীরুহগণ তাঁহার পাদদেশ বিধৌত করিবার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা ভাবে নত মস্তকে মুক্তা বিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিল ; সুস্নিগ্ধ মলয় পবন তাঁহাকে ব্যজন করিবার অভি-প্রায়ে নানাজাতীয় সুস্নিগ্ধ কুসুমের আঘ্রাণ আনিয়া মৃদু মন্দ ভাবে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। গভীর নিশীথের মৃদু গম্ভীর ‘প্রণব ওঁকার’ রব তখনও সুদূর নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতের শেষ তান-লয়ের ন্যায় এক একবার অতি মৃদুস্বরে শ্রুতিগোচর হইতেছে। গাঢ় নীলিমাময় অনন্ত আকাশের মধ্য হইতে দেব-যোগীর পূজোপকরণ—অপূর্ব্ব ঘণ্টারব মধ্যে মধ্যে মন প্রাণ পবিত্র করিয়া সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত করিতেছে !

ঠিক এই সময়ে দুঃখিনী আনন্দময়ীর কপাল ভাঙ্গিবার সূত্রপাত হইল। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুবোধের বিসূচিকা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বিশ পনর মিনিটের মধ্যে ‘দ্যাথ দ্যাথ’ পড়িয়া গেল। যাহাকে প্রকৃত ‘ওলাউঠা’ বলে—তাহা এই। কোথাও কিছু নাই, রাত্রি দ্বিপ্রহর একটা পর্য্যন্ত বেশ আমোদ আহ্লাদ করিয়াছে,—ভগ্নীর বিবাহের আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়াছে,—বরযাত্রীদের সহিত একত্রে আহারাদি করিয়াছে, প্রদোষকালেই এই দুর্ঘটন !

মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কলিকাতা সিমলায় বাসা বাটি। সেই বাটী হইতেই বিবাহ হইয়াছে। ‘বর ক’নে’ লইয়া সকলে মহা বিপদে পড়িল। ‘বাসী বিবাহের’ বাদ্য বাঁশী অর্দ্ধ গীতাবস্থায় নিস্তব্ধ হইল ; পুরনারীদি[গের] হাতের শাঁক হাতেই রহিল ; ‘হুলুধ্বনির’ গভীর রোল—হাস তামাসার গা[ন] মুহূর্ত্ত মধ্যেই লীন হইল। হাসি-খুসি মুখের পরিবর্ত্তে সকলেরই মুখে বিষ[াদের] ভয়-আতঙ্গের ছায়া পড়িল। আত্ম কুটম্ব কুটম্বিনীগণ যে যা’র পথ দে[খিতে] লাগিল। কেবল একটি বিশেষ আত্মীয় এই সময়ে বর ক’নে কোন [illegible] বিদায় করিলেন। বিশেষতঃ এ রোগ সংক্রামক,—যাহাদের ছেলে [illegible] ছিল, তাহারা ত আর পশ্চাৎ ফিরিয়াও চাহিল না ; পাল্কী, গাড়ী, পদব্রজে—যাহার যেরূপ সুবিধা হইল, সে সেই মত প্রস্থান করিল। যাহাকে ‘[illegible]য়িত’ করিতে আসিয়াছে, সেই অভাগিনী আনন্দময়ীর দশা কি হইবে, এ ভাবিতেও কাহার অবকাশ হইল না। তবে ‘বর’ ভায়াকে ‘অল[illegible]

'অপয়া' প্রভৃতি বিশেষণে অলঙ্কৃত করিতে কেহ ত্রুটি করিলেন না। কি শিষ্টাচার! এরেই ত বলি—'আপ্যায়িত' করা!

হৈ চৈ গণ্ডগোলে আরও এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। শীতকালের বেলা ৮টা বাজিল। ধীরেন্দ্র শৈলেন্দ্র দুই জনেই ডাক্তারের উদ্দেশে দুই দিকে ছুটিলেন। কি দুর্দ্দৈব! সিমলার অলি গলিতে ডাক্তার,—কিন্তু সে সময় কি একজনকেও পাওয়া গেল না রে! কেহ 'কলে' বাহির হইয়াছেন; কেহ স্নান আহারাদিতে ব্যস্ত, কেহ কেহ বা পাড়ার আস পাশে এ বাড়ী সে বাড়ী বেড়াইতেছেন। চলিত সংস্কার আছে, যাহার পরমায়ু শেষ হয়, তাহার চিকিৎসার্থে ঠিক যথা সময়ে ডাক্তার বৈদ্য পাওয়া যায় না। কোন না কোন একটা কাযে তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন। ঈদৃশ সংস্কারে শৈলেন্দ্রের বড় বিশ্বাস। তাঁহার মনে হঠাৎ কেমন একটা খট্‌কা লাগিল যে, সুবোধ এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না। এ দুশ্চিন্তা যেমন মনে উদয় হওয়া, অমনি তিনি ভগ্ন-হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার চক্ষের হতাশ দৃষ্টি ও আকার ইঙ্গিত যেন আপনা হইতে জননীর নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, "মা, সুবোধ বাঁচিবে না!" আনন্দময়ী উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিলেন,—"কৈ, ডাক্তার আসিল না?" শৈলেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—পাঁচ সাত জনের বাটীতে যাইলাম, কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না। এক আহার করিতেছেন, বেহারা দ্বারা খবর দিলেন, শীঘ্র আসিবেন। আমি দের বাসার ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

আনন্দময়ী,—"ধীরেনও ত এখনও ফিরিল না। হা পোড়া কপাল! কতা সহরেও সময়ে ডাক্তার মিলিল না রে!" মায়ের কোমল প্রাণ ই বুঝিয়াছিল, পূর্ব্ব হইতেই তিনি বিবিধ অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে-ন, হৃদয়ের শোণিত খরতর বেগে বহমান হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় হইতে নানা রে বহির্গত হইতেছিল। পলে পলে সে দীর্ঘ শ্বাস, সে স্থির পলকহীন চক্ষের তীব্র কটাক্ষ, কর্ণের একাগ্রতা—কোথায় কে কি বলাবলি ছে, কোথায় কি অস্পষ্ট স্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে, এই সকল অতি —ক্ষুদ্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তিনি প্রতিপদে অমঙ্গল আশঙ্কা ছিলেন। এই সময়ে গৃহ সংলগ্ন পুরাতন প্রাচীর কোটরে বিকট রবে

পেচক ডাকিতে লাগিল; ছাদের নলের উপর বসিয়া একটা দাঁড় কাক কর্কশ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল; গৃহের দ্বারদেশে একপাল কুক্কুর জুটিয়া তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল। অদূরে শবদাহকারীদিগের মুখে "বল হরি—হরি বোল!" বিকট রবে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইল। এই সময় আনন্দময়ীর হৃদ্‌পিণ্ড দরু দরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয়ের শোণিতস্রাব তাড়িতবেগে ছুটিতে লাগিল, সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু যেমন গৃহের বাহির হইবেন, অমনি দ্বারদেশের চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া গেলেন। মস্তকে বিলক্ষণ আঘাত লাগিল, একটু একটু রক্ত বিন্দুও দেখা দিল।

শৈলেন্দ্রনাথ এতক্ষণ একদৃষ্টে সুবোধের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রোগীর আকার প্রকার বিশেষরূপ দেখিয়া তাঁহার অমঙ্গল চিন্তা আরও বলবতী হইল। তিনি নির্ব্বাক—নিস্পন্দভাবে সহোদরের পাণ্ডুবর্ণ মুখপানে চাহিয়াছিলেন এবং মনে মনে ভবিষ্যতের কি একটা ভীষণ দৃশ্য কল্পনা করিতেছিলেন। সহসা জননীর এ দশা দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। "একি!" বলিয়া ত্রস্তভাবে জননীকে ভূমি হইতে উঠাইলেন। আনন্দময়ী কাতর কণ্ঠে "আ" "উ" করিয়া কহিলেন,—"আঃ! আমার মরণ নেই রে! পোড়া যম, কোথায় তুমি?"

শৈলেন্দ্র,—"ও! বিপদের উপর বিপদ! মা, বড় কি লেগেছে?" উত্তর আর অপেক্ষা করিতে হইল না, দেখিলেন, আঘাত গুরুতর হইয়া রক্ত বিন্দু অল্পে অল্পে কেশ রাশি সিক্ত করিতেছে।

"ইঃ! তাই ত। মা,——"

সুবোধের যে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া গেল। ক্ষীণ কহিল,—"মা, বড় জল তৃষ্ণা পেয়েছে। দে মা,—একটু জল দে!"

আনন্দময়ী মস্তকের গুরু বেদনা ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, "ছি বাবা, তুমি ত আর আমার অবোধ নও; ব্যামো সারুক, পর জল খেও। এই নাও—একটু বরফ খাও।

"না মা, জল দে। তোর পায়ে পড়ি মা,—একটু জল দে; বড় তৃ

শৈলেন্দ্র,—"আচ্ছা দিচ্ছি দাদা!" চটের ভিতর হইতে খানিকটা বরফ কাটিয়া একটা পাত্রে রাখিলেন। বরফ গলিয়া যাইলে একটা কাচের গেলাসে করিয়া সেই জল টুকু সুবোধের মুখে দিতে না দিতে প্রবলবেগে এক ভেদ—এক বমি!

শৈলেন্দ্র,—"একি, আবার!"

আনন্দময়ী,—"ওরে ছোঁড়া দেখিস্ কি, আগিয়ে দ্যাখ, ডাক্তার এলো কি না। হা নারায়ণ!"

ঊর্দ্ধশ্বাসে শৈলেন্দ্র নীচে নামিলেন। বাটীর বাহির হইতে না হইতে দেখিলেন,—গাড়ী হইতে ডাক্তার ও ধীরেন্দ্রনাথ নামিতেছেন।

শৈলেন্দ্র,—"আসুন মহাশয়, শীঘ্র আসুন।"

উৎকণ্ঠিত ভাবে কম্পিত স্বরে ধীরেন্দ্র কহিলেন,—"কেন, সুবোধ কেমন আছে রে?" "দেখ্‌বে এস,—সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

দ্রুতপদে সকলে উপরে উঠিলেন। দেখিলেন, সত্য সত্যই রোগীর অবস্থা বড় শোচনীয়। ডাক্তার বাবু অনেক্ষণ তাপমান-যন্ত্র দ্বারা নাড়ীর গতি দেখিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া পুনরায় হাত চাপিয়া নাড়ীর গতি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন; শেষে একে একে মুখ, চ'খ জিহ্বা সমস্ত পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখে উৎসাহের ভাব দেখা গেল না। শৈলেন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে রোগীর অবস্থা জানিতে চাহিলেন; ডাক্তারবাবু ইংরাজীতে কহিলেন, "নাড়ী নাই"। একটু পরেই কি ঔষধ দিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন। বলিলেন,—"ভয় নাই, এই ঔষধটা আনিয়া প্রয়োগ করান, রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে দ্বার দেশে আর একখানা গাড়ী থামিল। শৈলেন্দ্র নীচে নামিয়া দেখিলেন, আর এক জন ডাক্তার;—ইনি আহার করিতে বসিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র তাঁহাকেও উপরে আনিলেন। দ্বিতীয় ডাক্তারের প্রবেশ মাত্র উভয়ের চারি চক্ষু এক হইতে না হইতে প্রথম ডাক্তার বাবুটী সহকারে ধীরেন্দ্রকে কহিলেন,—"দিন ম'শায়,—আমার ভিজিট

ধীরেন্দ্র,—"যে আজ্ঞা, দিতেছি।"

প্রথম ডাক্তার দ্বিতীয় ডাক্তারটিকে কহিলেন, "তা আপনি—আপনি,—তা—তা—"

২য় ডাক্তার। "আজ্ঞা না, আপনি দেখিতেছেন দেখুন। আমার আর দেখিবার আবশ্যক নাই।"

১ম ডাক্তার।—"হ্যাঁ, আ-আমিও তা-তাই ব-ব-লি।"

বিনা বাক্যব্যয়ে প্রথম ডাক্তার বাবুটী চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, শৈলেন্দ্রনাথ দুইটি টাকা লজ্জিত ভাবে তাঁহার হাতে দিতে গেলেন। প্রথম ডাক্তার বাবুটী বড় ভদ্রলোক,—মান্‌সেতার কতক ধার রাখেন, দ্বিতীয়টির মত নিতান্ত দুই চ'খে চস্‌মা দেন নাই। তিনি কহিলেন,—"আ মশায়, ও কি করেন, কি করেন! রাম—রাম!" তিনি শৈলেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। ১ম ডাঃ দ্বারা আনন্দময়ীর মস্তকের আঘাতটাও পরীক্ষা করা হইল, তাহারও একটা ব্যবস্থা পত্র দিলেন। এই সময়ে আর এক খানি গাড়ি থামিল। শৈলেন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়বন্ধু সুদিন নামিতেছেন। হাসিমুখে সুদিন গাড়ী হইতে নামিয়াই শৈলেন্দ্রের হাত ধরিলেন, কহিলেন,—"ভাই, ট্রেণ্ মিস্ হওয়ায় কাল পৌঁছিতে পারি নাই। সমস্ত রাত্রি ষ্টেশনে থাকিতে হইয়াছিল, আজ মর্ণিং ট্রেণে এই আসিতেছি। তা'র পর;—সব খবর ভালত? হেমের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে?"

"আর ভাই!" গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে শৈলেন্দ্র কহিলেন,—"সে ভাই! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এস উপরে এস, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

সুদিন,—"সে কি হে, কি হয়েছে?" দুই জনে উপরে উঠিলে পর ডাক্তার বাবু প্রস্থান করিলেন।

বস্তুত তেজস্কর ঔষধের গুণে এক ঘণ্টার মধ্যে রোগের অনেক উপশম হইল, রোগীর অবস্থা সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইল। সুবোধ শয্যা উপর উঠিয়া বসিল, চাঁদ মুখে কত সোহাগের কথা বলিতে লাগিল। আনন্দময়ী আনন্দে দ্বিগুণ বল পাইলেন, মস্তকের ক্ষত স্থানে যে প্রলেপ দিতেছিলেন তাহা আর ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। সুবোধকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—"বাবা আমার, সোণার চাঁদ—মাণিক ধন

সুবোধ,—"কেন মা, আমার এমন কি হয়েছিল মা!" আনন্দময়ী,—"আর বাবা, সে কথা তোর শুনে কায নি।"

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। সুবোধ এ যাত্রা রক্ষা পাইল ভাবিয়া সকলে এতক্ষণে আহারাদি করিলেন। আনন্দময়ী সামান্য ফল মূল মাত্র ভক্ষণ করিলেন। ডাক্তার বাবুও স্ফীতবক্ষে ডবল ভিজিট লইয়া গোঁফে 'তা' দিতে দিতে মনে মনে কহিলেন,—"কেমন লোকের হাতে রোগী পড়েছিল!"

ঔষধের গুণে সব হইল বটে, কিন্তু রোগীর কিছুতেই ঘুম আসিল না।

সুদিনচন্দ্র কিন্তু এ আনন্দে সুখী হইলেন না। তিনি বুঝিলেন,—"এত হাসি কিছু নয়। শেষে "যত হাসি তত কান্না" না হ'লে বাঁচি। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রোগী সুস্থ হয় নাই, ঘোর বিকারগ্রস্থ হইয়াছে।" ডাক্তার অপেক্ষা রোগীর সেবকদিগের পীড়ার লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অধিক।

একি, ফলেও কি ঠিক তাহাই হইল! কোথাও কিছু নাই, দেখিতে দেখিতে একি,—ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এ আবার কি হইল! আর একবার ভেদ—এক বার বমি। মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল, শরীর হিমাঙ্গ হইয়া আসিল এবং মুখের আকৃতি কখন নীল, কখন জরিদ্রা কখন বা পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল। চক্ষের দৃষ্টি ক্রমশ স্থির হইয়া আসিল; মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিল। আনন্দের মাঝে আবার গভীর বিষা-দ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সকলে "একি একি" করিয়া উঠিল। আনন্দময়ী ...র অন্তিম কাল দেখিয়া "একি রে বাবা!" বলিয়া সন্ত্রস্থে কাঁদিয়া উঠি-... দ্রা...। অমনি "চুপ চুপ" করিয়া সকলে তাঁহাকে অন্য ঘরে লইয়া ...। অবশিষ্ট আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যেও দুই এক জন এই সময় চলিয়া ... না।

...ডাক্তার আসিল, তাপমান যন্ত্র বাহির করিতে না করিতে আনন্দময়ীর ...পুতলি সোনারচাঁদ শিশু সুবোধের প্রাণ-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ...নের মত উড়িয়া গেল। সুবর্ণ-দীপ নির্ব্বাণ হইল, তীরে উত্তীর্ণ ...হী-জাহাজ জলমগ্ন হইল। আনন্দময়ীর জীবন নাটকের ...র ...ঙ্ক অভিনীত হইতে চলিল।

এইবার গগনস্পর্শী হাহাকার উঠিল। সে গভীর রোলে বিষয় বিভবোন্মত্ত বিলাসী ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইল, নারকীর 'শেষ দিনের কথা' মনে পড়িল, পরস্বপহারী খল ও নিরীশ্বরবাদীর দাম্ভিকের অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

"ও বাবা সুবোধ রে! তুই কোথায় গেলি রে!" বলিয়া উন্মাদিনী বেশে আনন্দময়ী শবের উপর আসিয়া পড়িলেন। সুবোধের মৃতদেহ দৃঢ়রূপে বক্ষে ধারণ করিলেন। সুদিন সজোরে তাঁহার হস্ত ছিনাইয়া শব কাড়িয়া লইলেন। আনন্দময়ী শোক-বিহ্বল চিত্তে, উন্মাদিনী বেশে সুদিনের পা জড়াইয়া ধরিলেন। মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দোহাই বাবা তোদের, আমার সোণার ইন্দুরকে ছেড়ে দে!" আবার-পর মুহূর্ত্তে জ্ঞান সঞ্চার হওয়ায় অমনি "ও বাবা—সুবোধ রে!" বলিয়া পাষাণ ভেদী ক্রন্দনে সে স্থান বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। সুদিন—ধীরেন্ ও শৈলেন্‌কে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"এখন কান্না রাখ, দেখ্‌ছ কি, আর এক মহা বিপদ উপস্থিত! —মা বুঝি উন্মাদিনী হইলেন" ডাক্তার বাবুটী ক্ষুণ্নমনে এদিক ওদিক চাহিতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির অবসর বুঝিয়া সুদিনকে কহিলেন,—"ম'শায়, আ... আমার ভিজি- টে-র—ট—"

সুদিন,—"ওঃ! আপনি সেই জন্য এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? বলি একখানা চস্‌মায় ত দেখ্‌ছি কিছু হয় না,—আর একখানা চস্‌মা ধরুন, চক্ষু লজ্জাটা যদি একটু বৃদ্ধি হয়!" ডাক্তার বাবুটীর চক্ষে চস্‌মা ছিল।

ডাক্তার,—(লজ্জিত ভাবে ঈষৎ হাসিয়া) আজ্ঞে—আমাদের ব্য-ব্যবসা; তা'কি জানেন, লজ্জা কর্‌লে এসব কায চলে না, তাই,—ত...

সুদিন,— "হ্যাঁ, তা' জানি, মুদ্দফরাস আর আপনাদের এই ... মুখে হাসি দেখা দেয়।" এই বলিয়া বিরক্তিভাবে কক্ষান্তরে ... করিয়া দুইটি টাকা ডাক্তার সাহেবের হাতে দিলেন স্মিতমুখে ভীষণ... মস্তক কুণ্ডয়ন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বলিহারি মা... হায় রে পয়সা!

সুদিন পুনর্ব্বার আনন্দময়ীকে শবের নিকট হইতে টানিয়া

লেন। আনন্দময়ী শোকপূর্ণ হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ওরে নারে—না সুদিন! আমি পাগল হইনি রে—পাগল হই নি! ওরে বাবা, আমি রাক্ষসী রে রাক্ষসী; আমি সয়তানী রে সয়তানী! আমি আমার সুবোধকে খেয়েছি রে বাবা!" মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সে ভাব পরিবর্ত্তন হইল! উন্মাদিনী আনন্দময়ী বিকট হাস্য করিয়া পুনরায় শবদেহ বক্ষে আলিঙ্গন করিলেন এবং মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"ও বাবা কথা ক'! সুবোধ রে, বাবা, রাগ করেছ? ছি বাবা, ছি! মায়ের উপর কি রাগ কত্তে আছে?" এই বলিয়া মৃতপুত্রের পাংশুবর্ণ কপোলে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কখন হাসি—কখন কান্না, ক্ষণে চেতন —ক্ষণে অচেতন,—আহা! অভাগিনী—উন্মাদিনী আনন্দময়ীর সে দৃশ্য বড়ই শোচনীয়—বড়ই মর্ম্মস্পর্শী! ধীরেন্দ্রনাথও স্ত্রীলোকের ন্যায় বিহ্বল চিত্তে রোদন করিতেছেন। তাঁহার প্রকৃতি বড় কোমল। শৈলেন্দ্র গলা ছাড়িয়া কাঁদিতেছেন না বটে, কিন্তু তিনি সেই যে একস্থানে করলগ্ন কপোলে দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছেন, সে শোকের পারিণাম বড়ই ভীষণ। সকলেই শোকে মগ্ন, সুতরাং কে কাহাকে সান্ত্বনা করে? তাঁহাদের মাতুল গোষ্ঠীর কয়েক জন স্ত্রী-পুরুষ এ সময় ইহাঁদিগকে ত্যাগ করেন নাই—এই রক্ষা, নচেৎ সেই ভীষণ শ্মশান-পুরীতে যে সে দিন কি বিনাশ হইত, তাহা বলা যায় না!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ীর নিকট হইতে কোন প্রকারে শবদেহ ছিনাইয়া লইয়া সুদিন, শৈলেন্দ্র এবং আরও জনৈক আত্মীয় লোক দ্রুতপদে নীচে নামিলেন। উন্মাদিনী আনন্দময়ী আবার চৈতন্য লাভ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এ সময় ইহাতে যোগ দেওয়ায় সাক্ষাৎ শোকের জীয়ন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিল। "আমার চাঁদকে কে নিয়ে যায় দেখি রে! ও বাবা সুবোধ রে, দাঁড়ারে

বাবা—দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে যাই!" বলিয়া আনন্দময়ী বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। এদিকে সুদিন, শৈলেন্দ্র এবং সেই আত্মীয় লোকটি শবদেহ লইয়া পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আর এক জন লোকের অভাব। উদ্ভ্রান্তবেশে শৈলেন্দ্রনাথ পথিমধ্যে পরিচিত অপরিচিত যে কোন লোক দেখিতে পান, সাশ্রুনয়নে তাঁহারই চরণে সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহই তাঁহার কাতরোক্তিতে দয়া প্রকাশ করিল না। সন্ধ্যা হইল, আর চেষ্টা করা বৃথা দেখিয়া তাঁহারা তিন জনেই শবদেহ লইয়া নিমতলার শ্মশান-ঘাটে উপনীত হইলেন।

চিতা প্রজ্বলিত হইয়াছে, শবদেহ জ্বলিতে আরম্ভ করিল। শৈলেন্দ্রের হৃদয়-বহ্নিও এইবার প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সে ক্রন্দন থামিয়া গেল। এই সময় সেই শ্মশানের স্রোতস্বতী তীরে বসিয়া জনৈক সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী আপন মনে সংসারের নশ্বরতা সম্বন্ধে গান করিতেছিলেন। মর্ম্মস্পর্শী সংগীতে শৈলেন্দ্রের হৃদয় চমকিত হইল, প্রাণে বৈরাগ্যের ছায়া পড়িল। পূত-সলিলা ভাগীরথীর কল কল নিনাদে, গগণস্পর্শী চিতা-বহ্নির সুগম্ভীর ধু ধু রবে কণ্ঠ মিলাইয়া শৈলেন্দ্রও সেই সময়োচিত গান ধরিলেন। গাহিতে গাহিতে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। প্রাণের মায়া মমতা বিদূরিত হইল। শোকে দুঃখে হৃদ্‌পিণ্ড বিসর্জ্জন করিবার উদ্দেশে তিনি আপন মনে একবার শব চুল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনে মনে কি কৃতসঙ্কল্প করিয়া তিনি জ্বলন্ত আগুনে একবার হস্ত স্পর্শ করিলেন। কিন্তু সে সর্ব্বগ্রাসী ব্রহ্মতেজ তাঁহার সহ্য হইল না। ভাবিলেন, ইহাপেক্ষা আর এক অতি প্রিয়তর রমণীয় স্থান আছে, সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে পারিলেই সকল জ্বালা মিটিয়া যাইবে। সুদিন ও আত্মীয় ব্যক্তিটি এ সময়ে স্থানান্তরে ছিলেন।

যেমন মনে উদয় হওয়া, অমনি হতভাগ্য শৈলেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ঘাটের সোপানাবলী অতিক্রম করিতে লাগিলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর ঊর্দ্ধ লক্ষ্যে কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দুই চারি ফোঁটা অশ্রু ফেলিলেন। হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে কহিলেন,—"মা জগজ্জননি দুর্গতিনাশিনি, কলুষহরা—অভয়ে, অপরাধ নিস্‌নে মা! পূত-সলি

ভাগিরথি, মা, তোর শান্তিময় ক্রোড়ে অভাগা পুত্রকে স্থান দে মা!” তদনন্তর আর একবার চিতাবহ্নির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শ্মশানকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “প্রেমশিক্ষাদাতা শ্মশান, তুমি পবিত্র—মহান! তুমি পাপীর একমাত্র সুহৃদ; তুমিই আমার প্রাণে বৈরাগ্য আনিয়াছিলে, তোমাকে শত শত নমস্কার! বন্ধো! আমি মহাশ্মশানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলাম। মা!— মা!!—” বলিয়া শৈলেন্দ্র যেমন জলে ঝম্প প্রদান করিবেন, অমনি চকিতের ন্যায় সুদিন কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। মিষ্ট ভৎসনা করিয়া কহিলেন,—“ছি ভাই, তোমার এই কায, আমাকে অবিশ্বাস!”

শৈলেন্দ্র,—“কেও সুদিন, পরম হিতকারী বন্ধু! ভাই, তুমি চির সুহৃদ্ হইয়া কেন আজ এমন শত্রুর কায করিলে? আঃ! মাগো, কোথায় তুমি?—দেখা দাও মা!” ভক্তি প্রাণ শৈলেন্দ্রর কণ্ঠরোধ হইল।

সুদিন,—“শৈলেন, এই কি তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান? এই কি ‘সর্ব্ব-মাঙ্গলে’ বিশ্বাস? ছি ভাই, বড়ই ক্ষোভের বিষয়! ভাবিয়া দেখ দেখি, পৃথিবীতে তোমার এখনও কত কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে!”

শৈলেন্দ্র,—“ভাই আর আমাকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিও না। চল তোমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছি।”

সুদিনের মনে পূর্ব্ব হইতেই শৈলেন্দ্রের সম্বন্ধে অমঙ্গল আশঙ্কা জাগিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহে আসিয়াছিলেন; ভাবিলেন, শৈলেন্দ্রকে একা রাখিয়া আসিয় ভাল কায করি নাই। অমনি তথা হইতে ... রিলেন, চিতা সম্মুখে শৈলেন্দ্রকে না দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ আরো বৃদ্ধি ... ল। এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে পরম্পরায় অবগত হইলেন যে, ... ন ঘাটের দিকে আসিয়াছেন, তাই তিনি হতভাগ্য শৈলেন্দ্রকে এ যাত্রা ... করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে এই সময়ে সভয়ে দেখিলেন, ... উন্মাদিনী উর্দ্ধশ্বাসে সেই শ্মশান-ঘাটে আসিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে, ... ানীর দিব্য গ্যাসালোক সাহায্যে ইঁহারা ভীত-বিস্মিতনেত্রে চিনিলেন, ... াদিনী আনন্দময়ী;—পতি-পুত্র-শোকাতুরা অভাগিনী আনন্দময়ী! ... বোধের মৃতদেহ শ্মশান-ঘাটে আনীত হইলে আনন্দময়ী অস্থির

হইয়া উঠিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ ত পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিয়া অস্থির হইতেছিলেন;—কিছুক্ষণ পরে অন্যান্য সকলে একটু অন্যমনস্ক হইলে তিনি একাকী বাটী হইতে বহির্গত হন। প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করা তাঁহার অভ্যাস ছিল, এজন্য এ পথও তাঁহার কতক কতক জানা ছিল।

দ্রুতপদে সুদিন ও শৈলেন্দ্র আনন্দময়ীকে ধরিয়া ফেলিলেন। শৈলেন্দ্র বিস্মিতভাবে কহিলেন,—“একি মা, তুমি এখানে!”

আনন্দময়ী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল,—“ওরে, তোরা আমায় ছাড় রে—ছাড়! আমি আমার প্রাণ গোপাল নীলমণিকে দেখতে এসেছি রে! বাবা সুবোধ রে! ও বাবা!” উর্দ্ধশ্বাসে হস্ত ছিনাইয়া উন্মাদিনী চিতা সমক্ষে উপনীত হইল। শৈলেন্দ্র ও সুদিন পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন; কিন্তু সে উগ্রামূর্ত্তি দেখিয়া কেহই তাঁহাকে ধরিতে সাহস করিল না। চিতাবহ্নি তখনও নির্ব্বাণ হয় নাই, বরং এই সময় শুষ্ক কাষ্ঠের সাহায্যে আরো কিছু অধিক পরিমাণে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। শবদেহ তখন অর্দ্ধদগ্ধ; শব-চুল্লীর দৃশ্য তখন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভীষণ। উন্মাদিনী আনন্দময়ী সেই প্রজ্বলিত চিতা মধ্যে পতিতা হইবার উদ্যোগ করিলেন, সুদিন ও শৈলেন্দ্র আবার তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিলেন।

“ওই যে আমার বাবা, ওই যে আমার সোণার চাঁদ!—আহা, অমন ননীর পুতলিকে তোরা কেমন ক’রে পোড়াচ্ছিস রে! ওরে তোদের কি একটু দয়া মায়া নেই রে! বাবা সুবোধ! তবে দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে যাই, আমি জীয়ন্তে পুড়ে মর্ব। দাঁড়া বাবা দাঁড়া, যাই—যাই। ও... ছেড়ে দেরে, তোদের পায়ে ধরি!” উন্মাদিনী জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিল। এই সময়ে সুদিন শ্মশান-ঘাটস্থ কতকগুলি লোকের সাহায্যে আনন্দময়ীকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শবদেহ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল, চিতাবহ্নিও ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া আসিল। যথারীতি গঙ্গাজলে চিতা বহ্নি বিধৌত করা হইল। কিন্তু আনন্দময়ীর হৃদয়ের শোক-বহ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না। পতিতপাবিনী ভাগীরথী সলিলে স্নান করিয়া সকলে ভগ্ন হৃদয়ে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। সুদিন পূর্ব্বোক্ত লোকগ...

সাহায্যে 'জোর জবরদস্তি' করিয়া এক খানি ঠিকা গাড়িতে আনন্দময়ীকে উঠাইলেন। আনন্দময়ীর হৃদয়-প্রতিমা আজ চিরদিনের মত বিসর্জ্জিত হইল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলে বাসা বাটীতে উপনীত হইলেন।

দুঃখের রজনী প্রভাত হইতে যেন কিছু সময় লাগে; ভুক্তভোগী মাত্রেরই এ ভাব উপলব্ধি হয়। রাত্রি যেন যায় যায়—যায় না। ইঁহাদেরও সেই কাল-রাত্রি অতিবাহিত হইয়াও যেন হয় না! প্রত্যুষে আনন্দময়ী স্বভাব-সিদ্ধগুণে একাকী উঠিয়াছেন,—কিন্তু সুদিন ও শৈলেন্দ্র পূর্ব্ব রাত্রি হইতে অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রযুক্ত তিনি আর স্থানান্তরিত হইতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ঘরে—যে ঘরে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বের জীবন-দীপ চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, সেই চক্ষুর শূল স্বরূপ অমঙ্গল গৃহের পানে তিনি 'ফ্যাল্ ফ্যাল' করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে সে দৃষ্টি আরও ভয়ঙ্কর হইল। ভয়-বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে কম্পিতস্বরে তিনি কহিলেন,—

"কে রে সুবোধ! এতক্ষণে কি তুই এলি রে বাবা!"

শৈলেন্দ্র,—"মা, ও কি প্রলাপ বকিতেছ? এস—এদিকে এস, ও ঘরের দিকে আর চাহিও না।" বলিয়া জননীর হাত ধরিলেন।

আনন্দময়ী,—"ওরে না রে না! (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ওই যে আমার বাবা আস্‌ছে! আয় বাবা আয়, অনেকক্ষণ কিছু খাস্‌নি,—আয় বাবা খাবার খাবি আয়!" বলিয়া আনন্দময়ী শৈলেন্দ্রের হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন।

শৈলেন্দ্র ও সুদিন পুনরায় তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিলেন। ঈষৎ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"আঃ! ও কি কর মা?"

"তোদের কি রে হতভাগারা! আমার বাছাকে ঐ কে ধ'রে উপরে নিয়ে যাচ্চে, আমার বাছা ঐ কাঁদ্‌ছে। ভয় নেই বাবা,—আমি তোকে নিয়ে আস্‌ছি। দাঁড়া ত রে ড্যাক্‌রা মিন্‌সে!" বলিয়া উন্মাদিনী আনন্দময়ী বেগে শৈলেন্দ্র ও সুদিনের হাত ছাড়াইয়া সবলে তাঁহাদিগকে ফেলিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। একটা কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল অমনি ভীতভাবে 'ও ম্যাও' রবে গৃহ হইতে পলায়ন করিল। আনন্দময়ী গৃহে প্রবেশ

করিয়া উন্মত্তভাবে যেমন দেয়াল ভেদ করিতে চেষ্টা করিবেন, অমনি সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাতিতা হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পতন কালীন মস্তকে আবার গুরুতর আঘাত লাগিল; সুতরাং পূর্ব্ব ক্ষত স্থান হইতে প্রবল বেগে রুধির-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে স্থান 'রক্ত-গঙ্গা' হইয়া উঠিল। শৈলেন্দ্র ও সুদিন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ধীরেন্দ্র প্রভৃতি আরো দুই চারি জন স্ত্রী-পুরুষ দৌড়িয়া আসিল। কোমল প্রাণ ধীরেন্দ্রের ভ্রাতৃশোক বড়ই বাজিয়াছিল; তদুপরি জননীর এই আকস্মিক প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনিও মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। বিপদের উপর দ্বিপদ! কে কাহার শুশ্রূষা করে,—কে কাহাকে প্রবোধ দেয়?

শৈলেন্দ্র ও সুদিন এক খানি বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আনন্দময়ীর ক্ষত স্থান বাঁধিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া সুদিন ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে ডাক্তার আসিল। তিনি উত্তম রূপে ক্ষত স্থান 'ব্যাণ্ডেজ' করিয়া একটা আরকের প্রলেপ দিলেন; তাহাতে রক্ত বন্দ হইল এবং কোন দ্রব্য-গুণ আঘ্রাণে তাঁহাকে চৈতন্য করাইলেন। অবশেষে তাপমান যন্ত্র দ্বারা নাড়ীর গতি দেখিলেন,—নাড়ী অতি মৃদু ভাবে বহিতেছে।

এই সময় অভাগিনী আনন্দময়ী একবার চক্ষু রুন্মীলন করিলেন। সম্মুখে পর পুরুষ দেখিয়া লজ্জিতা হইলেন এবং পার্শ্ব ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে, ডাক্তার বাবুটি বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন,—"মা, এ সময় লজ্জা নিয়ে আমাকে সন্তান তুল্য ভাবিবেন।" এই সদাশয় ডাক্তার বাবুটি পাঠক পরিচিত,—গত কল্য দুর্ঘটনার দিন ইনি 'দ্বিতীয় ডাক্তার' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

শৈলেন্দ্র ডাক্তার বাবুকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয় কি রূপ বুঝেন? রোগীর অবস্থা ত মন্দ নয়?"

তিনিও ইংরাজীতে উত্তর করিলেন,—"হাঁ, বিশেষ ভয়ের কারণ হইলেও একেবারে নিরাপদ নয়। খুব হুঁসিয়ার থাকুন,—যেন রে

পূর্ব্ব স্মৃতি না জাগিয়া উঠে। সে বিষয় একটু চিন্তা করলেই আবার মূর্চ্ছিতা হইতে পারেন। আর নাড়ীর গতি বড় দুর্ব্বল; বোধ হয় অনা-হার বশতঃ আরো এরূপ হইয়াছেন। যা' হোক, কোন গতিকে যদি একটু দুধ খাওয়াইতে পারেন, ত বড় ভাল হয়। আমি এখন উঠিলাম, যখনি দরকার হ'বে—ডাক্‌বেন।"

শৈলেন্দ্র সুদিনকে কি ইঙ্গিত করিলেন; সুদিন কক্ষান্তরে যাইয়া দুইটি টাকা ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে গেলেন। কিন্তু বস্তুত তিনি তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—"মহাশয়, বলেন কি? ব্যবসা করিতে বসিয়াছি বলিয়া কি আমাদের মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছে? কাল আপনাদের এই বিপদ গেল,—সে বিপদ না যেতে যেতে আবার এই সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত,—আমি ভিজিটের টাকা লইব!" শৈলেন্দ্র ও সুদিন মহা কৃতজ্ঞতা ভাবে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। সুদিন গত কল্যের কথা ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন, মনে মনে বলিলেন,—"এক ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে এক জনের ব্যবহার দেখিয়া সে শ্রেণী সকলকে ঘৃণা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। দৈত্যকুলেও ত প্রহ্লাদ ছিল বটে!"

ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহে যে কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছিল, একে একে তাহা সমস্তই নিঃশেষিত হইল। কলিকাতা যায়গা,—কথায় বলে, এখানে 'জল আগুন' কিনে খেতে হয়। তাহাতে আবার রোগীর ঔষধ পথ্য সমস্তই যোগাইতে হইতেছে; সুতরাং তাঁহারা দেশে ফিরিলেন। আনন্দ-ময়ী আর পিত্রালয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া পুত্রগণকে এ কথা বলি-লেন; ধীরেন্ শৈলেন্ও ইহাতে অনুমোদন করিলেন। ভাবিলেন, বাস্তু ভিটা ত্যাগ করা মঙ্গলের চিহ্ন নয়। তাঁহারা আপন বাটিতে উঠিলেন!

কিন্তু এখানে আসিয়া যে 'হা হা' সেই 'হা—হা-ই' হইল। এমন কি এক আধ্ দিন সপরিবারের 'গায়ের উপর দিয়া' উপবাস পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। আনন্দময়ী অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ও মস্তকের 'ঘা' ভাল হয় নাই, মধ্যে মধ্যে পুত্রশোক সম্পূর্ণ রূপ ...য়া উঠিলে এক আধ্ বার 'বায়ের ব্যায়রাম' (হিষ্টিরিয়া) হইত। 'নূতন উপসর্গের' সহিত আবার মাঝে মাঝে একটু আধ্‌টু জ্বরও হইত।

এই জ্বর টুকুই সর্ব্বনাশের মূল হইল। মধুপুরে ডাক্তারের অভাব নাই,—কিন্তু তাহার পয়সা জোগায় কে? ইঁহাদের আত্মীয় একটি নেটিভ্ ডাক্তার অনেক যত্নে তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগ্রে পথ্য—পরে ঔষধ। বিশেষতঃ এ পীড়ার মূল কারণ—মানসিক কষ্ট। সেই মানসিক কষ্টই যখন প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন রোগ সারিবে কিরূপে? যথারীতি পথ্যের অভাব ও মানসিক দুশ্চিন্তায় দিন দিন তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল।

ধীরেন্দ্রনাথের এই সময়ে স্বগ্রামের একটি জমিদার-সরকারে কার্য্যের সুবিধা হইল; কিন্তু চাকরি স্বীকার করিলে তাঁহাকে মফঃস্বলে যাইতে হয়। অথচ উপস্থিত দুর্ঘটনা দেখিয়াই বা তিনি কিরূপে তথায় গমন করেন! মহা বিপদ আর কি!

শৈলেন্দ্র সেইরূপই আছেন; বরং চক্ষের উপর এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মানসিক কষ্ট আরোও বৃদ্ধি হইয়াছে। বন্ধু সুদিন এই সময় সকল রকমেই প্রাণপণে তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। শৈলেন্দ্রের আরও একটি বন্ধু এই সময় তাঁহাদিগকে বিশেষ আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এ জগতে পরের সাহায্যে কয়দিন চলিয়া থাকে? নিজে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে, অন্যের সাহায্যে ভগ্ন পদ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে কয়দিন বিচরণ করিতে পারা যায়? সুতরাং এ সময়ে তাঁহাদের কষ্টের আর অবধি রহিল না।

মণীন্দ্রনাথের মনোভাব এ সময় একটু বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দানবী স্ত্রী মাতঙ্গিনীর প্রতি এ সময় তাঁহার একটু ঘৃণা ও বিদ্বেষ ...র হইয়াছিল। তাহার কারণ, মনিবের সহিত কি একটু 'কথার ফে... মণীন্দ্রনাথের চাকরি যায়। সাধারণত পল্লীগ্রামের লোকের চাকরি যাই... অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা থাকিতে হয়। ঘরে বসিয়া থাকি... মনে সঙ্কীর্ণতা আসে,—যত সব 'তুচ্ছ' বিষয়ে নজর যায়। কে কোথায় ... বলিল, কে কোথায় কি একটু অন্যায় কায করিল, কাহার স্বভাব ... কিরূপ, কে বেশী খায়, কাহার লোক-লৌকিকতা কেমন—এই সকল ... বিকার চর্চ্চা ও তৎ সমালোচনা করিতে মন তৎপর হইয়া থাকে ...

মেজাজটা ও কিছু রুক্ষ হয়। দেহ ও মনে 'স্বস্তি' থাকে না,—অধিকন্তু স্বভাবটাও কিছু 'খিট খিটে' হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার মণীন্দ্রনাথের 'প্রয়সার পথ' বন্ধ হইয়াছে, সুতরাং এ অবস্থায় মাতঙ্গিনী সদৃশা স্ত্রী-রত্নের সহিত তাঁহার কেমন মনের মিল আছে, তাহা পাঠক পাঠিকা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথম একটু কম কথাবার্ত্তা,—একটু কম মন-খোলাখুলি,—যত্ন ও সেবা শুশ্রূষার একটু ত্রুটী, একটু উপেক্ষাভাব,—একটু কথার অবাধ্যতা,—এইরূপে একটুর পর একটু করিয়া মাতঙ্গিনী স্বামীর বিরাগ ভাজন হইতে লাগিলেন। এখন ত আর মণীন্দ্রনাথ গণ্ডা গণ্ডা টাকা পয়সা আনিয়া তাঁহাকে দিতে পারিতেছেন না, সুতরাং তাঁহার মন পাইবেন কেন? তাঁহার অর্থের যতই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ততই পরিবারিক সুখ অন্তর্হিত হইতেছে। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বচসা—বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল, শেষে প্রকাশ্যভাবে রীতিমত কলহ চলিতে লাগিল। এতদিনে মণীন্দ্রনাথের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ীর পরমায়ু দিন দিন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি [...]ন সম্পূর্ণ শয্যাগত হইয়াছেন,—উঠিয়া বসিতে কষ্ট হয়,—কথা কহিতে [...] ছাড়েন। তাঁহার বাঁচিবার আশা আর নাই। ধীরেন্ শৈলেন্ ইহা [...]লেন, বুঝিয়া চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। সংসারে তাঁহাদের [...] মাত্র 'মা' অবলম্বন,—আনন্দময়ীর ন্যায় অতুল গুণসম্পন্না মা অবলম্বন, [...] মা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া যাইবেন! আজ এক মাস হয় নাই—[...]ণের ভাই গিয়াছে, এরি মধ্যে আবার স্নেহময়ী মা যাইবেন? [...]ণীন্দ্রনাথ পৃথক্ করিয়া দেওয়া অবধি এই দুই তিন বৎসর ইঁহাদের [...]ন যে সকল উৎকট কষ্ট গিয়াছে, তাহা তিনি একদিনের জন্যও [...]ন্ধান লন নাই;—এমন কি, এ দীর্ঘকাল মধ্যে পরস্পরের কথা বার্ত্তাও

অতি অল্পই হইয়াছে। হেমাঙ্গিনীর বিবাহ সময় মণীন্দ্রনাথ বা জগদীশের পরিবার মণ্ডলী কেহ একবার চক্ষের দেখাও দেখে নাই। তার পর তাহাদের এই মহা বিপদ,—আহা পথের পথিকও ফিরে চায়,—অথচ এক বাটীর ভিতর থাকিয়া এ নিদারুণ সময়ে একবার কেহ তাহাদিগকে দুটো মিষ্ট কথায়ও সান্ত্বনা করিল না রে!

সম্বলের মধ্যে 'বাস্ত ভিটার' অংশ টুকু। কিন্তু মান সম্ভ্রমের ভয় যাহাদের অধিক,—বিশেষতঃ বনেদী—ধনী হইতে যাহারা একেবারে ফকির—পথের ভিকারি হইয়াছে, পেটের দায়ে হাতে করিয়া 'ভিটে' বিক্রয় করা তাহাদের পক্ষে যে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট, ভুক্ত ভোগী বিনা তাহা অন্যে বুঝিতে অক্ষম। আর যদি বা ধীরেন্দ্র ও শৈলেন্দ্রের শেষে তাহাই করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল, কিন্তু শরিকান বাটী পার্টিসন না হওয়ায় তাহা ক্রয় করিতে বা বন্দক রাখিয়া টাকা দিতে কেহই সহজে সম্মত হইল না। ধীরেন্দ্রনাথ আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া এইবার মণীন্দ্রনাথের নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন। মণীন্দ্রনাথের মন এ সময় একটু গলিল। কিন্তু এখন তাঁহার যে যে কিছু নগদ টাকা ছিল, সমস্ত নিঃশেষিত হইয়াছে। অথচ এতদিন পরে বিষম বিপদগ্রস্থ হইয়া ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়াছে,—তাহা না দিলেই বা কেমন দেখায়। যে—যে বিষয়ে গর্ব্বিত সেই বিষয়ের জন্য তাহার শরণাগন্ন হইলে, সে প্রাণপণে তাহা সমাধা করিয়া থাকে। ইহা মানব প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব নিয়ম! সন্ধ্যা[...] পর গোপনে—মাতঙ্গিনীর অগোচরে তাঁহার একখানি অলঙ্কার বন্ধক [...] মণীন্দ্রনাথ ধীরেন্দ্রকে ১০৲ দশটী টাকা দিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ [...]র কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং দুই এক দিনের মত মায়ের পথ্যের সংস্থান হইল ভাবিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে মণীন্দ্রনাথ যখন মাতঙ্গিনীর অলঙ্কার বন্দক দেন, সেই জগদীশের কনিষ্ঠ কন্যা—ব্রজসুন্দরী তাহা জানিতে পায়। খলের স্বভাবই এ[...] আপনার স্বার্থ থাক বা না থাক—অন্যের অনিষ্ট করিবার সুযোগ পাই[...] তাহা সাধন করিবেই। মণীন্দ্রনাথ ও মাতঙ্গিনীর মধ্যে এখন মনের 'গরমিল' চলিতেছে, তাহা ইহার অবিদিত ছিল না। জ্বলন্ত অ[...]

ঘৃতাহুতি দিবার এই উপযুক্ত সময় বোধ করিয়া সেই পাপিষ্ঠা—মাতঙ্গিনীকে এ কথা জ্ঞাত করিল। বাঘিনী মাতঙ্গিনীর হিংসাবৃত্তি এখন দ্বিগুণ রূপে জ্বলিয়া উঠিল। একে স্বামীর সহিত 'খুটিনাটী' চলিতেছেই, তার উপর আবার তাঁর চিরশত্রু সৎ শ্বাশুড়ীর রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁহারই অলঙ্কার বন্দক দিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছে,—সুতরাং পাঠক সহজে বুঝিতে পারিতেছেন, এ সময়ে তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইল। আঘাত প্রাপ্তা ভীষণ কাল সাপিনীর ন্যায়, মাতঙ্গিনী আততায়ী স্বামীকে দশংন করিতে উদ্যত হইল। প্রথমে ত আনন্দময়ীর উদ্দেশে মর্ম্মভেদী শ্লেষ উপহাস দ্বারা খুব এক দম বলিয়া লইল; অন্তিম সময়ে আনন্দময়ীর এ শেল প্রাণে বড়ই বাজিল। তা'র পর ভীমা দানবী মূর্ত্তিতে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া 'অকথ্য কুকথ্য' যাহা মুখে আসিতে লাগিল, তাহাই বলিল। মণীন্দ্রনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কিছু রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"তা অমন কচ্ছ কেন? গহনা ত আর তোমার পাপের বাড়ীর নয়,—আমার জিনিস আমি বন্দক দিছি, তা আর কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে?" বলি ও সব ন্যাকরাম আমার ভাল লাগে না। জিনিস এখন দেবে কি না বল? নইলে আমি এখনি ঘর দোরে আগুন দিয়ে বেরিয়ে যাব।"

"হ্যাঁ, তুমি তা পার!"

"এখন কি বল? চুপ ক'রে রইলে যে! গলায় দড়ী দাও,—মাগ্ ছেলের গহনাপত্র বন্ধক দে পুরুষার্থ ফলাবার চেয়ে তার মরাই ভাল!"

"দ্যাখ্, মুখ সাম্‌লে কথা ক বল্‌ছি। নইলে জুতিয়ে মুখ ভাঙ্‌ব।"

"হোঃ, মার অমনি প'ড়ে রয়েছে। কৈ, একবার গায়ে হাত তুলে না! কোম্পানীর রাজ্যি,—মেরে দ্যাখ্ দেখি— কেমন মজাটা! হাগ্‌বেন—আবার চোকও রাঙাবেন!' আমি রাঁড় হ'লে খাব? কিছু কি রেখে যাচ্ছ?"

মণীন্দ্রনাথ ক্রমেই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি আরক্ত তীব্রস্বরে কহিলেন,—"দ্যাখ, কেন বল মিছে রাগ বাড়াচ্ছিস। আমার সাম্‌নে থেকে দূর হয়ে যা, নইলে তোকে এখনি যমালয়ে পাঠাব।"

মণীন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল।

মাতঙ্গিনী ব্যঙ্গচ্ছলে আবার কহিল, "হোঃ, সোহাগের রস যদি উথ্‌লেই উঠ্‌বে, তবে গুণধরী মাকে 'ভেন্ন' বা করে দে ছিলে কেন? ও কালামুখ আর লোকালয়ে দেখিও না! ধিক থাক!"

"হারামজাদী, আবার!" বলিয়া মণীন্দ্রনাথ সবলে মাতঙ্গিনীর বক্ষে পদাঘাত করিলেন। মাতঙ্গিনী ভূমে নিপতিতা হইল।

"ও বাবারে, তোরা দেখ্‌বি আয় রে—আমায় খুন ক'ল্লে!" বলিয়া মাতঙ্গিনী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। অমনি "কি—কি" বলিয়া হরসুন্দরী ব্রজসুন্দরী প্রভৃতি সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মণীন্দ্রনাথ কর্কশস্বরে কহিলেন,—"না কিছু নয়,—তোমাদের এখানে আস্‌তে হ'বে না।"

ব্রজসুন্দরী,—"বলি মাগের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আবার আমাদের উপর পড়্‌তে এলে কেন?"

মণীন্দ্রনাথ বিরক্তি ভাবে কহিলেন,—"বেশ ক'রেছি;—যাও—যাও,—এখন তোমরা এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।"

হরসুন্দরী চিবন চিবন স্বরে কহিলেন,—"তা বাপু না ব'লেও থাক্‌তে পাল্লেম না। বলি, মানুষের ঘরে মানুষ এলে কি এই রকম ক'রে শ্যা কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে হয়?"

মণীন্দ্রনাথ—"হ্যাঁ—হয়।"

মাতঙ্গিনী ভূমে অঙ্গুলি মুচ্‌ড়াইয়া মণীন্দ্রনাথের প্রতি মৃদু গম্ভীর কহিলেন, "ত্বরায় নিপাত যাও;—যেন আজকের মধ্যেই আমার হা বালা খুল্‌তে হয়।" তার পর রাগে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে পতি মাতঙ্গিনী (?) কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

মণীন্দ্রনাথ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"এতদিন পরে আমা বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।"

ব্রজসুন্দরী—"কি বুঝেছ?"

মণীন্দ্রনাথ। "বুঝেছি এই, তোমারই পাঁচজনে মিলে আমার সংসারটা ছারখার কর্‌লে।"

ব্রজসুন্দরী—(নাকে হাত দিয়া) "এ্যা! হ্যাঁ মণি, তুই এ কথা বল্লি কেমন করে! হা ধর্ম্ম! কথায় বলে,—'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর!' এ যে ঠিক তাই হ'ল।"

মণীন্দ্রনাথ মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"আর গুণ ব্যাখ্যায় কায নেই যাও,—

তারপর তিনি দন্তে দন্তে কর্ষণ করিয়া মাতঙ্গিনীর উদ্দেশে কহিলেন,—" কি বল্‌ব, আমি ফুলের মালা ভেবে কাল সাপ কণ্ঠে ধারণ ক'রে ছিলেম, তা'রি রি ফল ভোগ কচ্ছি! পিশাচী স্ত্রীর বশ হ'লে যা' হয়, আমার ভাগ্যে তাই হয়েছে!"

বলা বাহুল্য; পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে মাতঙ্গিনী একথা শুনিয়াই আবার মণীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হইল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—" কেন, আমি তোমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি? নয় তুমি মর—নয় আমি মরি! এ রকম কেলেঙ্কারী আর বরদাস্ত হয় না। (হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীর প্রতি) ওগো তা নয়, আসল কথাটা হয়েছে কি জান,— (কাণে কাণে কহিয়া) এখন সেই রস উথ্‌লে পড়্‌ছে! তা বাপু আর এ সব কেন—সেই ভাইদের নিয়ে আবার একত্র ঘর সংসার কল্লেই ত হয়! আমি বাপু ন বাপের বাড়ী গে উঠি। (ব্যঙ্গচ্ছলে) আহা, অমন গুণধরী মা!"

কথাপ্রসঙ্গে মণীন্দ্রনাথের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি হইল। স্ত্রীর মুখে—নীদিগের সমক্ষে এরূপ শ্লেষ উক্তি শুনিয়া তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। র মাতঙ্গিনীর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া পাঠক পাঠিকে,—বলিতে লজ্জা হয়—ন মাতঙ্গিনীর পৃষ্ঠদেশে পাদুকা প্রহার করিলেন। ক্রোধে কাঁপিতে তে উন্মত্তপ্রায় কহিলেন,—"এত ক'রেও কি তোমার মনস্কাম পূর্ণ হয় আর তা'দের রেখেছ কি? অনাহার—উপবাস—দুঃখ শোক যন্ত্রণী-সকলি ত তাহাদের ভাগ্যে হ'য়েছে। আর বাকী কি! পিশাচি, পরামর্শেই ত আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ক'রেছি। নিরপরাধী মা আমার তোর ষড়যন্ত্রেই ত আজ এই বিপদগ্রস্থ! কথায় কথায় আবার

বাপের বাড়ীর 'বুটানি' দেখান্! আ মলো—আমি যেন আর কিছু জানি না—কিছু বুঝি না। দূর হ—আমার বাড়ী থেকে তুই এখনই বেরিয়ে যা।"

মহা গোলযোগ শুনিয়া এই সময় ধীরেন্দ্র শৈলেন্দ্র প্রভৃতি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ও সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে নিরস্ত করিলেন।

মণীন্দ্রনাথ হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া আবার কহিলেন,—"এই যে দুটি 'রাম-বাঘিনী'—এদের হতেই এ ভিটের যত অমঙ্গল হচ্ছে। কি বল্‌ব—আপনার বোন্ নয়,—নইলে (দন্তে দন্তে কর্ষণ করিয়া) এখনই দু'জনের দুটো মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেল্‌তেম।"

ধীরেন্দ্র—"আঃ, দাদা, থাম থাম। যেতে দাও ও কথা।"

হরসুন্দরী—"গাঁজাখুরির রোক্ দেখাতে বুঝি আর যায়গা পাও না?"

ব্রজসুন্দরী—"আয় রে বউ, তুই এখান থেকে উঠে আমাদের ঘরে আয়, দেখ চিস না—মদ খেয়ে এয়েছে! বলে,—'আতাল দাঁতাল মাতাল, এদের বিশ্বাস নাই কোন কাল!' আয় উঠে আয়, নইলে তোর জন্যে কি আমরাও মার খেয়ে মর্‌বো?"

মণীন্দ্রনাথ বেগে উঠিয়া যাইতে না যাইতে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি আরক্ত নয়নে কহিলেন,—"হ্যাঁ, আমি মাতাল!"

মাতঙ্গিনী, হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

মাতঙ্গিনীর মূর্ত্তি তখন বড়ই ভয়ঙ্করী। তখন আর তিনি কাঁদিতেছে না, কিন্তু মনে মনে কি ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্প করিতে ছিলেন। দুটি আরক্ত বর্ণ—পলক হীন, নিশ্বাস স্থির,—মধ্যে মধ্যে এক একবার গ ভাবে পড়িতেছে। হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরী কি পরামর্শ করিয়া মাতঙ্গিনীর নানা কথায় সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

এ দিকে আনন্দময়ীর জ্বরের প্রকোপ টা আজ কিছু অধিক পরি হইয়াছে, ডাক্তারও আজ দেখিয়া যাইবার সময় মুখ বিকৃত করিয়া ছেন। এ দীর্ঘ জ্বর মধ্যের সময় একটা বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা তাঁহার জীবনের আশা আর অতি অল্প। ধীরেন্দ্রনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ বুক বাঁধিলেন। আনন্দময়ী ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন,—"ধীরেন শৈলেন, সব ভাই বোনে মিলে আমার কাছে ব'স্। মধুসূদনকে ডাকিস,

সকল বিপদে রক্ষা কর্‌বেন। এ সময়ে বিন্দুকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। আ! বাবা সুবোধ রে!—” আনন্দময়ীর চক্ষে জলধারা পাড়িতে লাগিল। শৈলেন্দ্র অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন,—“মা,আর সে কথা তুলোনা। যা হবার হ'য়ে গেছে, সে'কথা ভেবে আর কি হ'বে মা!”

আনন্দময়ী—“তোদের কি সব খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে? হাঃ! আর—কোথা বা পাবি—আর কেই বা 'ক'রে ক'ম্মে' দেবে! বিন্দুকে 'তারে' খবর দে, মরণ কালে যেন তারে একবার দেখ্‌তে পাই।”

শৈলেন্দ্র—“মা, এই গরম দুধ টুকু চুমুক দে খাও।”

আনন্দময়ী—“বাবা আমি ঢের খেয়েছি, এ পেটে আর জায়গা নেই। আমি আমার সোণার সুবোধকে খেয়েছি!” শৈলেন্দ্রের অনেক অনুনয় বিনয়ে তিনি দুগ্ধ টুকু পান করিলেন।

আরও দু' এক দিন কাটিয়া গেল। আনন্দময়ীর অবস্থা ক্রমেই অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। ডাক্তার জবাব দিয়াছেন—বড় জোর এক সপ্তাহ কাল জীবিত থাকিতে পারেন।

শৈলেন্দ্র, ভগিনীপতি জ্ঞানেন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাম করিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপঃ—“বড় বিপদ! মা'র জীবনে আশা নাই; তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা; শীঘ্র সপরিবারে রহনা হইবেন।” কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা যথা সময়ে উপনীত হইতে পারিলেন না।

আজ পূর্ণিমা—বৃহস্পতিবার; অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় অভাগিনী আনন্দ... আজ "পূর্ণিমা—বৃহস্পতিবার; অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় অভাগিনী আনন্দময়ী, দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট আনন্দময়ী," শোক-...ময়ী, পতি-পুত্র শোকাতুরা আনন্দময়ী, দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট আনন্দময়ী, সরলা স্নেহময়ী স্বধর্ম্ম প্রতিপালিকা আনন্দময়ী ...াদ-উন্মাদিনী আনন্দময়ী, সরলা স্নেহময়ী স্বধর্ম্ম প্রতিপালিকা আনন্দময়ী ...জ চিরদিনের মত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন। অভাগা পুত্রগণকে কাঁদাইয়া, পাড়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের ... ক্ষুণ্ণ করিয়া, শত্রুর চক্ষেও জলধারা রাখিয়া বিষাদিনী আনন্দময়ী আজ ...শ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। লেখনি, কাঁদ কেন? ধৈর্য্য ধর—স্থির হও; ...ার আরো কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। আহা, অভাগিনী আনন্দময়ীর ...ন-নাটকের আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি অবধি কি শোচনীয়—কি গভীর ...র্ম্মস্পর্শী দৃশ্য! আজ তাঁহার দেহ-মুক্ত নির্ব্বাণ-জীবন “সংসার আশ্রমে”

স্মৃতি মাত্র রাখিয়া দিল; ভরসা করি, এই স্মৃতি হইতে বঙ্গের অনেক জীয়ন্তে-মৃতপ্রায় শ্মশান সদৃশ “সংসার আশ্রম” প্রীতি-শান্তি-সলিলে বিধৌত হইয়া নব-জীবন লাভ করিবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

“বিপদ কখন একা আসে না”—অশুভ গ্রহের প্রকোপটাও শীঘ্র অন্তর্হিত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গভীর বিষাদের মাঝে যে অল্প মাত্র আনন্দ লাভ হয়, তাহা শুভপ্রদ নয়; আর অনন্ত গগণ ব্যাপী ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন তমোরাশির মধ্যে তাড়িতবেগে নয়ন ধাঁধিয়া—প্রাণ মন চমকিত করিয়া যে বিজলী-প্রভা খেলিতে থাকে,—পরিশ্রান্ত পথভ্রষ্ট পথিকের পক্ষে সে আলোক-জ্যোতি সুবিধাকর নহে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, একাদশ পরিচ্ছেদে আমরা আনন্দময়ী ও শৈলেন্দ্রের তৎকালীন মনোভাব অবলম্বন করিয়া এ বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলেও কি ঠিক তাহাই হইল! আনন্দময়ীর হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ পুত্র-শোক-শেল-বাজিল; শেষে অভাগিনী তাহারই নিদারুণ যন্ত্রণায় চিরদিনের মত কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিল। আর শৈলেন্দ্রনাথও জীয়ন্তে, মৃতপ্রায় হইয়া দাবা... দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় অপ্রসন্ন রহিলেন। তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় গুলি মানসিক স্ফূর্ত্তির অভাবে দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয়ে বল ... মনে আশা নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, আহার নিদ্রায় 'স্বস্তি' নাই, জী... লক্ষ্য নাই, সুতরাং এ অবস্থায় মানুষের যাহা ঘটিয়া থাকে, শৈলেন্দ্রনাথের অদৃষ্টেও তাহাই হইল। বলা বাহুল্য, প্রিয়তম বন্ধু সুদিন এখন ইঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক যত্ন লইতেছেন।

পাঠক, মণীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্তের সূত্রপাত মাত্র দেখিয়াছ, এখন পরিণাম প্রত্যক্ষ কর। মাতঙ্গিনী যে দিন স্বামীর নিকট যৎপরে...

অপমানিত হইয়াছিল, সেই দিনই সে সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃত সঙ্কল্প হয়। নারী জনোচিত প্রতিহিংসা-বৃত্তির বশীভূত হওয়ায় পাপীয়সীর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। হৃদয়ের জ্বালা মিটিবার কোন উপায় মিলিল না দেখিয়া হতভাগিনী শেষে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে মনস্থ করিল। গোপনে কোন লোকের দ্বারা বাজার হইতে দুই ভরি অহিফেন ক্রয় করিয়া আনাইল এবং সেই তীব্র হলাহল সেবনের অবসর খুঁজিতে লাগিল। ইতি মধ্যে আনন্দময়ীর মৃত্যু হয়; সুতরাং গোলমালে দুই একদিন কাটিয়া যায়। আবার স্বামীর সহিত কলহ হয়; এবারকার বিবাদটি কিছু গুরুতর। হরসুন্দরী ব্রজসুন্দরীর এবারও লাঞ্ছনার বাকী রহিল না।

কুটীলবুদ্ধি হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীর অবিদিত নাই যে, মাতঙ্গিনীর নিকট সর্ব্বক্ষণই সেই বিষ থাকে। তাহারা দুই ভগিনী মিলিয়া সন্ধ্যার পর মাতঙ্গিনীর কাছে বসিল। কত রকম কথার 'ভনিতা' করিয়া শেষে মাতঙ্গিনীকে মিষ্ট বাক্যে কহিল,—"এ বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? 'চোরের উপর রাগ ক'রে মাটীতে ভাত খেলে' আর চোরের কি হ'লো? জাননা কি, আত্মহত্যা কর্‌বো মনে কল্লে অপঘাতে ভূত সঙ্গ নেয়? ও পাপ জিনিস আর—"

মাতঙ্গিনী—"আর দিদী, আমার মনের জ্বালা কি চিতেয় না উঠ্‌লে যাবে?"

ব্রজসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"অবুঝ আর কারে বলে? আত্মঘাতিনী হ'লে ত সব ফুরিয়ে গেল!—আর্ লোকের তাতে আর যাবে [illegible] কাঁদ্‌বে কি? লাভে থেকে ইহকালও যাবে—পরকালও যাবে! "শত্রুর [illegible] ঘায়ে নুনের ছিটে' না দিলে আর কি হলো!" মাতঙ্গিনী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পাপিষ্ঠা ব্রজসুন্দরী আবার কহিল,—"এখন এক কাজ কর—শোন।" পাপীর অন্তরাত্মা মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখে—পশ্চাতে—আস্‌পাশে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাতেও সন্দেহ ভঞ্জন না হওয়ায় জ্যেষ্ঠা ভগিনী হরসুন্দরীকে কহিল,—"দিদি, একবার এ ঘর ও ঘর আস্‌পাশ চার্‌দিক দেখ্‌ দেখি; কেউ যদি আড়াল থেকে শুন্‌তে পায়, তবে শেষে বড় আপদে পড়্‌তে হ'বে।"

[illegible] না,—এমন সময় আর কে কোথায় আছে!" বলিয়া হরসুন্দরী

একবার চারিদিক দেখিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—'বড় বউ, এক কার্য কর,—আমাদের কথা শোন। আজ রাত্রি—" ব্রজসুন্দরী তাহাকে কি সঙ্কেত করিল, হরসুন্দরী আর কোন কথা কহিল না।

মাতঙ্গিনী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"আ—আ—র!" তারপর আবার নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুণ্ণমনে বলিল,—"আর দিদী! তোমরা আমাকে ভাল বাস, তাই আমায় মত্তে বারণ কচ্ছ। কিন্তু বল দেখি, বেঁচে থেকে আমার আর সুখ কি!" কলহের পর হইতে অহিফেন প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এখনও হাতের মধ্যে ছিল, একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার প্রতি দেখিয়া কহিল,—"এখন কি আর একে ছাড়্‌তে পারি!"

ব্রজসুন্দরী—"কেন, এখন কেন আর এক কায কর না! তা হ'লে ত সকল দিক বজায় থাকে!" পাপীয়সী আর একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল।

মাতঙ্গিনী—"কি!"

"পার্‌বে কি? বড় শক্ত কায!" ব্রজসুন্দরী মাতঙ্গিনীর কাছে আরো একটু সরিয়া বসিল।

মাতঙ্গিনী একটু আগ্রহ দেখাইয়া কহিল,—"কি, বল না!"

"বড় শক্ত কায! পার্‌বে কি না—তাই ভাব্‌ছি।"

এই বার মাতঙ্গিনীর একটু অধিক কৌতুহল জন্মিল। সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ পার্‌বো,—কি বল।"

পাপিষ্ঠার হৃদয় আরো একবার চমকিত হইল। সাহসে ভর করি[য়া] কহিল,—"যার জন্যে মত্তে বসেছ, আগে তাকে কেন মার না[?]"

মাতঙ্গিনীর দুর্দ্দমনীয় অভিমান ও প্রতিহিংসাবৃত্তি মুহূর্ত্তের জন্য অন্ত[র্হিত] হইল। হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল।

দুষ্টা বুদ্ধি ব্রজসুন্দরী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিকৃত একটু হাসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ বুঝিছি, তোমার অত দূর সাহস কুলোচ্ছে না কিন্তু আমি বলি,—'নাচ্‌তে উঠে আর ঘোম্‌টা কেন?' যখন উঁচিয়েচ, তখন ভাল করেই কোপ্‌ মার। কি ভাবছ?" মা[তঙ্গিনী] শুষ্ককণ্ঠে জড়িত স্বরে কহিল,—তুমি কি বল্‌ছ—আমি ভাল ক'রে

যাচ্ছিনা।” তার পর শিহরিয়া আপন মনে কহিল,—“বিষ খাইয়ে মারব?”

ব্রজসুন্দরী—“হ্যাঁ, শত্রুকে মার্‌বার সময় আর অত ধর্ম্মজ্ঞান কল্লে চলে না। কি বল, রাজী আছ ত?”

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর। ব্রজসুন্দরী আবার কহিল,—“মর্ ছুঁড়ি, আপনার পথে কণ্টক রাখিস কেন? এখন দেখ্‌চিস না—তুই চক্ষুঃশূল হয়েচিস! তার যা কিছু গহনাপত্র আনে, ও একে একে সব খুইয়ে যাবে। এর পর তোমায় ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে!”

মাতঙ্গিনী কি একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—“তা—কি কত্তে বল?”

ব্রজসুন্দরী—“বল্‌ব আর কি—একেবারে কর্ম্ম শেষ কর। (ক্ষণপরে) তা যদি একান্তই না নিজের হাতে কত্তে পার—ত বল, আমরা আছি।” তারপর হরসুন্দরীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি সহকারে ইঙ্গিত করিয়া কহিল,—“কেমন রে দিদি, পার্‌বি ত?”

হরসুন্দরী—“তা আর একবার বল্‌তে! শত্রুরে মার্‌বার জন্যে মেয়ে মান্‌ষে সব পারে!”

ব্রজসুন্দরী—“তবে তাই-ই ঠিক হ'লো। দুধের সঙ্গে—বুঝ্‌লি ক না—!” মাতঙ্গিনীর মনের অবস্থা এখন অতি ভয়ঙ্কর। এখন সে দুই নৌকায় পা' দিতেছে। তাহার মনের ভিতর একটা তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। পাপকার্য্যের প্রলোভনে ‘সুমতি’ ও ‘কুমতির’ কলহে অনেক সময় কুমতিরই জয় হয় হইয়া থাকে। মাতঙ্গিনী এ দুইটার কোনটা স্থির করিতে না পারিয়া অধোবদনে গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল; সুতরাং ...নে ধরিয়া লইতে হইবে, মৌনে সম্মতির লক্ষণ। কিন্তু বস্তুত তা নয়, পিশাচী ...দরী তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে এক নিভৃতকক্ষে লইয়া ... এবং পূর্ব্ব অপমান লাঞ্ছনার কথা তুলিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তির উত্তেজনা ...তে লাগিল। হরসুন্দরী এই অবসরে তাহার নিকট হইতে কৌশলে ...হফেনের কৌটাটি লইল। মাতঙ্গিনী মন্ত্রমুগ্ধ সর্পিনীর ন্যায় কিংকর্ত্তব্য ...ঢ়া হইল। ব্রজসুন্দরীর পরামর্শে—অবশ্য মাতঙ্গিনীর অজ্ঞাতে হরসুন্দরী ...ময়ে গৃহের বহির্দ্দেশ হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভীষণ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ ...ল গেল। আনন্দময়ীর মৃত্যুর পর মণীন্দ্রনাথ অবশ্য রীতিমত হবিষ্যান্ন

ব্যবহার করিতেছেন, রাত্রেও ফল মূল দুগ্ধ আহার করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাটি এই সকল প্রস্তুত করিয়া যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিত। হরসুন্দরী অহিফেন টুকু উত্তমরূপে গুলিয়া কৌশলে মণীন্দ্রনাথের দুগ্ধের বাটীতে ফেলিয়া দিল এবং পাছে মুখে দিলেই দুগ্ধ বিস্বাদ বলিয়া অনুভূত হয় এজন্য তাহাতে বেশী করিয়া একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া দিল। মণীন্দ্রনাথ কিছু অধিক রাত্রে নিদ্রা যাইতেন। তিনি রাত্রি প্রায় এগার টা সময় জলযোগ করিয়া শুইতে গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মণীন্দ্রনাথের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, মুখে গাঁজা ভাঙ্গিতেছে, সর্ব্বশরীর বিষাক্ত—নীলবর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। মণীন্দ্রনাথ কাতরকণ্ঠে জড়িতস্বরে কহিলেন,—“ও! অ-অবিশ্বাসিনী দা-দানবী স্ত্রী! এ-ত দি-দিনে আ-আমার পা-পাপের প্রা-প্রায়শ্চিত্ত-অ-অ হলো। ওঃ স-সতীর অ-অভিশাপ এ-এত দিনে পূ-পূর্ণ হলো। ম-মা—আ! কো-থা তু-তুমি দে-দেখা দাও! মা মা- আ-ন-ন্দ ম-অ———ওঃ হো হো!” আর কথা কহিবার সামর্থ্য হইল না। গোঁ গোঁ শব্দের সহিত প্রতি নিশ্বাসে মণীন্দ্রনাথের প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হইল না; দেখিতে দেখিতে হতভাগ্য মণীন্দ্রনাথের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া আসি জীবন-দীপ চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইল।

চারিদিকে হাহাকারের রোল পড়িয়া গেল। এমন সময় এক উন্মাদিনী রক্তাক্ত কলেবরে অট্টহাস করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হইল। মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত—স্তম্ভিত হইল। সকলেই চিনিল, এ উন্মাদিনী মাতঙ্গিনী। উন্মাদিনী মাতঙ্গিনী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল,—“আমি ঘাতিনী—পিশাচী, আমি রাক্ষসী—আমি সয়তানী! যারা আমার পাপ মতি লইয়েছিল, স্বহস্তে তাদের দুর্দ্দশা করেছি: এখন আমার মহা প্রায়শ্চিত্ত করি। আর আমার খেদ নাই! হাঃ—হাঃ—হাঃ!” উন্মাদিনী মাতঙ্গিনী একবার মাত্র স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া হস্তস্থিত অস্ত্রদ্বারা আপন কণ্ঠদেশ ছেদন করিল। প্রবলবেগে রুধিরধারা ... লাগিল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সকলে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকাগণের ক্রন্দনে সে স্থান অতি ভীষণ দৃশ্যে পরিণত হইল।

সারারাত্রি মাতঙ্গিনীকে কুপরামর্শে উত্তেজিত করিয়া হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরী কু অভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার সাহায্য অপেক্ষা ঝরিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই দুগ্ধে যে বিষ দিয়াছে, তাহা তাহার নিকটে প্রকাশ করে নাই। হাজার হোক—স্ত্রী ত বটে! গভীর রাত্রিতে একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার পর লোক জনের কোলাহলে বুঝিতে পারিল যে, বিষপানে স্বামী মৃত্যুমুখে উপস্থিত প্রায়। অমনি পাপ সহচরীদিগের প্রতি তাহার ঘৃণা জন্মিল, আপনার জীবনের প্রতি ধিক্কার দিয়া তখনই সে—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মনস্থ করিল। দেখিল, সম্মুখে একখানি সুতীক্ষ্ণ 'রাম দা' ঝুলিতেছে, ক্ষীণ দীপালোকে এক এক বার সেখানি হাসিয়া উঠিতেছে; প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থে অবসর পাইয়া অমনি ঘুমন্ত অবস্থায় হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীরর নাক কাণ কাটিয়া লইল। ভাবিল, ইহাদের প্রাণে মারা হইবে না। যেমন কায তাহার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করুক। তারপর উন্মাদিনী মাতঙ্গিনী সেই অস্ত্র হস্তে স্বামীর অন্তিমকাল দর্শনার্থ দরজা ভাঙ্গিয়া সবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

অনতিবিলম্বে পুলিস আসিল। পুরুষ স্ত্রী যাহাকে সম্মুখে পাইল—ধিতে লাগিল। তদনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে অর্দ্ধমৃত—সদ্য নাসিকা কর্ণ হীনা হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরীকে বিশেষরূপে বাঁধিয়া লইয়া দুইটা লাস সমেত সকলকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান দিল। এত দিনে কর্ম্মের ফল বাতাসে নড়িল।

এই সকল দুর্ঘটনার পর শৈলেন্দ্রনাথ সংসার-বিরাগী হইয়া বাটী হইতে দেশ হইলেন। যাইবার সময় বন্ধু সুদিনকে মাত্র এক খানি পত্র রাখিয়া রাখিয়া যান। সুদিন চন্দ্র নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না। ধীরেন্দ্রনাথ দুঃখে শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া প্রকারে ছোট ভাই ভগিনী—অনাথ ভ্রাতষ্পুত্র তাঁহার কন্যা গুলিকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুরের যত্নে

এক্ষণে তাঁহার একটি বেশ চাকরি জুটিয়াছে। শৈলেন্দ্রের উদ্দেশে তিনি এক মর্ম্মে সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন,—"ভাই শৈলেন, আর অধিক কিছু বলিবার নাই;—প্রাণে বাঁচিয়া আছ কিনা জানিতে ইচ্ছা করি!" সুদিন দেশে দেশান্তরে বন্ধুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শৈলেন্দ্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কখন পদব্রজে, কখন নৌকারোহণে—কখন বা ট্রেণ গাড়িতে বরাবর কামরূপ তীর্থে উপনীত হন। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি সেখানে এক মহাপুরুষের কৃপা দৃষ্টিতে পতিত হন। ইনি বাহ্যিক আকারে সন্ন্যাসী নহেন,—কিন্তু সংসারে যদি কেহ যোগী থাকেন, তবে ইনি তাহার মধ্যে একজন। শৈলেন্দ্রের যৌবনেই সংসারে বিরাগ দেখিয়া এবং তাঁহার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া সেই আত্মচিন্তা নিরত মহাত্মা হতভাগ্য শৈলেন্দ্রকে চরণ প্রান্তে স্থান দেন এবং পুত্র সম স্নেহ সহকারে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার চিত্ত-সংযম অভ্যাস করাইতে থাকেন। তদ্ব্যতীত শৈলেন্দ্র ইহাঁর নিকট যাবতীয় পুরাণ, তন্ত্র সংহিতা, প্রভৃতি প্রচুর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। এইরূপে প্রায় দুই বৎসরকাল কাটিয়া যায়। এই সময় তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শৈলেন্দ্র তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া কহিলেন,—"গুরুদেব, অকৃতী সন্তানকে চরণে ঠেলিবেন না! দেব, আর কিছু চাহিনা, কেবল এই বর দিন, যে জীবনে মরণে কখন 'সর্ব্বমাঙ্গল্যে' বিশ্বাস হারাইতে না হয়।"

গুরুদেব—"শৈলেন্দ্র, তুই ধন্য! তোর নবীন বয়সে এ কঠোর সন্ন্যাস বিস্মিত দেখিয়া হইয়াছি। কিন্তু বৎস, যাও—গৃহে যাও। এখন তুমি বালক; 'কামিনী কাঞ্চনের' আকাঙ্ক্ষা অজ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তোর হৃদয়ের অন্তস্থ স্পর্শ করিয়া আছে। বাসনার তৃপ্তি সাধন পরিমাণে সঙ্গতও বটে। তবে অতি সাবধান, বিষয় মদে উন্মত্ত হ কখন পরকাল বিস্মৃত হইও না।"

"গুরুদেব, ক্ষমা করুন, সংসারে যাইতে আমাকে আর অনুমতি করিবেন না।"

"সে কি কথা! ধর্ম্মশাস্ত্র প'ড়ে কি শেষে তোমার এই জ্ঞান জন্মে "সংসার আশ্রম" অপেক্ষা আর কোন আশ্রমের মাহাত্ম্য অধিক?

সংসারী অপেক্ষা যোগী-শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে আর কে? হিংস্রজন্তুর আবাস দেখিয়া সে স্থান ভয়ে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রাজ প্রাসাদে আশ্রয় লইলে, তাহাতে আর বাহাদুরী কি! সর্প ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করাই ত পুরুষার্থ!"

"গুরুদেব, কি সুখে আর কাহার জন্য সংসারে প্রবেশ করিব? এ ভগ্ন হৃদয় লইয়া কোন্ কার্য্য সমাধান করিতে পারিব? আর এত অত্যাচার—এত "বিভীষিকা জানিয়া আপনি আবার সেই পাপ স্থানে যাইতে আমাকে অনুমতি করিতেছেন?" গুরুদেব ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন,—অজ্ঞান শিশুর মত ও কি কথা কহিতেছ? তুমি কি মনে কর, কুসুমশয্যায় শয়ন করিলেই নিরাপদ হওয়া গেল? তাহাতে কি কণ্টকের ভয় নাই? আর বিশেষতঃ এই-ই ত সংসারের পরীক্ষা,—এই সহ্য করাই ত কঠোর সন্ন্যাস! যাও—পিতা মাতা কাহারও চিরদিনের জন্য থাকে না। যে যাহার কর্ম্মফল ভোগ করিতে এ সংসারে আসিয়া থাকে, সুতরাং তাহার জন্য আর পরিতাপ কি!"

এই সময়ে একখানা মসলা বাঁধা খবরের কাগজে তিনি ধীরেন্দ্রের সেই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করেন। শৈলেন্দ্রও তাহা দেখিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই সুদিনস্ত্রও অকস্মাৎ সেই স্থানে উপনীত হইলেন। আজ দুই বৎসর পরে শৈলেন্দ্রের পূর্ব্বস্মৃতি গুলি একে একে সমস্ত জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আজ তিনি কাঁদিলেন।

শৈলেন্দ্রের বিদায় কালীন গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হিলেন,—"যাও বৎস, সুস্থ দেহে—প্রফুল্ল মনে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ র। আর বাটী গিয়া দেখিতে পাইবে, তোমাদের পৈত্রিক বিষয়ের প্রায় র্দ্ধিক অংশ উদ্ধার হইয়াছে।" গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শৈলেন্দ্র সজল নয়নে বিদায় লইলেন।

উপসংহার।

বৃদ্ধ জগদীশ রায় এখন বৃন্দাবন বাসী হইয়াছেন; তাঁহার মনের সঙ্কীর্ণতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রশস্ত হইয়াছে; অন্তিমে 'গোবিন্দ জী' তাঁহার সদ্গতি করিয়াছিলেন।

হরসুন্দরী ও ব্রজসুন্দরী নিজ মুখে স্ব স্ব দুষ্কৃতির কথা স্বীকার করায় তাহাদিগের যাবজ্জীবন কারাবাস-দণ্ড বিহিত হইয়াছে। হতভাগিনী দ্বয় মর্ত্তের সেই জীয়ন্ত নরকে অনুতপ্ত হইতে লাগিল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাতামহী-প্রদত্ত সম্পত্তি পাইয়াছেন এবং শেষ অবস্থায় 'ধর্ম্মে মতি ও নামে ভক্তি' সার করিয়া সরলা স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর সহিত সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্য সম্পত্তিও সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং উপস্থিত নানারূপ রোগেও মনোকষ্টে দিন যাপন করিয়া থাকেন।

দুই জমিদারের পরস্পরের কলহ উপস্থিত হওয়ায় রায়েদের অনেক গুলি 'দেবোত্তর' জমি বিনা আয়াসে হস্তগত হয়। জগদীশ ৺বৃন্দাবন যাত্রা কালীন স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পুত্রগণকে না দিয়া ভ্রাতৃষ্পুত্রদিগের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাছে, তাঁহার উদ্ধত পুত্রগণ আবার তাহাদিগকে উৎপীড়িত করে, এই আশঙ্কায় ভ্রাতৃষ্পুত্রগণের হাতের মধ্যে তাহাদিগে রাখিয়া গিয়াছেন। মণীন্দ্রনাথের নাবালক সন্তান সন্ততিগণের রক্ষণাবেক্ষ তাহাদের লেখা পড়া শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই, সুধীর ধীরেন্দ্রনাথ স করিয়া থাকেন।

অনেক দিন পরে শৈলেন্দ্রনাথ বাটী আসিলেন, ভ্রাতৃবৎসল ধীরে প্রাণ হর্ষ-বিষাদে পূর্ণ হইল। তিনি সুদিনের নিকট যথোচিত কৃত প্রকাশ করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ, ও সুদিনের অনেক অনুরোধে শৈলেন্দ্রনাথ বিবাহ করিলে তিনি দেবোত্তর বিষয়ের আয় হইতে একটি অতিথি ও তৎ সংলগ্ন একটি মন্দির নির্ম্মকরাইলেন। তাহাতে অষ্টধাতু আনন্দময়ী অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া নাম রাখিলেন,—"মা আনন

মন্দির!” মন্দিরের আর এক পার্শ্বে একটি দাতব্য বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ এই সময়ে একটি দেশ হিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বিলক্ষণ পুরস্কৃত হন ও তাঁহার মান, সম্ভ্রম, পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়।

শেষ নিবেদন।

সাধারণতঃ আজ কালের উপন্যাসে প্রথমটা দুঃখ—শেষটা সুখ, অথবা প্রথমটা সুখ শেষটা দুঃখ—এই রূপ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমাদের মিলন-প্রাণ দেশে আবাল বৃদ্ধ বণিতা—সকলেই শেষটা মিলন দেখিতে ভাল বাসেন। কিন্তু আমাদের এ “সংসার আশ্রম” আগাগোড়া ‘কান্নাকাটী’ ‘মারামারী’ ‘হা হুতাশ’ ও হাহাকার পূর্ণ! মিলন প্রিয় সুন্দরী পাঠিকাগণ অগ্রেই চটিয়া যাইবেন;—কিন্তু কি করিব নাচার। গল্পের বাঁধুনির দিকে দৃষ্টি রাখা অপেক্ষা গ্রন্থের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাই যুক্তি সঙ্গত। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে এই “সংসার-আশ্রমের” সৃষ্টি, অদৃষ্ট ও কর্ম্ম ফল অনুসারে চরিত্র অঙ্কনও সেই রূপ হইয়াছে। এখন সহৃদয় পাঠক পাঠিকার বিচারাধীন!

সমাপ্ত।

ফুলের সাজি।

সাধন সঙ্গীত।

পুরবী—একতালা।

কে রে কাল কামিনি!
বাস পরিহারিণি!
চরণ তরুণ অরুণ নিকর নখর নিভাতি নিন্দি' নিশাকর
উরু তরু রম্ভা নাভি মনোহর নূকর কটিতে কিঙ্কিনী।
পীযূষ পূরিত পীন পয়োধর পানে পুলকিত সুরাসুর নর
করে শোভে অসি মুণ্ডাভয়বর (বামা) নরমুণ্ডমালিনী।
তড়িত জিনি' হাস্য কমল বদনে খঞ্জন গঞ্জন সুচারু নয়নে
শিশু শব সব সুশোভিত কর্ণে কিবা আধ শশী ভালিনী।
হেরে কাল কান্তি এলো কুন্তলে কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে
বামা গঙ্গাধর হৃদি হ্রদ-জলে শোভে যেন নীল নলিনী॥

৺গঙ্গাচরণ সরকার।

পাতা।

পাতা! দোল্‌রে আবার।
নির্জ্জন বনের মাঝে, গম্ভীর প্রকৃতি রাজে,
গম্ভীর হৃদয় তন্ত্রী বাজেরে আমার;
পাতা! দোল্‌রে আবার।

তোর দোলা দেখে, পাতা, মনে পড়ে সেই কথা
যে কথায় প্রাণে বাজে সে কথার তার;
পাতা দোল্‌রে আবার।

ও তো তোর দোলা নয়   কে যেন কি মোরে কয়,
মনে হয় হয়—ফের হয় না আবার;
এই যে আলোক হেরি আবার আঁধার।

তোর দোলা মনে হলে   কি যেন কোথায় দোলে,
সে দোলা বিষম দোলা—থামা নাহি তার;
সে দোলায় এই হেথা—কোথায়—আবার!

সে দোলায় দোলে বিশ্ব,   দোলে রে অনন্ত দৃশ্য,
বায়ু-কণা হ'তে দোলে হিমাদ্রির ভার;
ভানু শশী এই দোলে কাতারে কাতার।
মানব তো ছার!
পাতা! দোলরে আবার।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বিরহ-গীতি।

নং ১— খাম্বাজ—মধ্যমান।

(স্থায়ী ই) বুঝি আমার সে এলো
অন্তর অন্তরে নহিলে এমন হলো।
চন্দ্রালোকে মৃদু ছায়া   যেন নব দেব কায়া
হেরিলাম—হারালাম এমন কপালো।
কাঁপিতেছে কুঞ্জবন   কাঁপিতেছে সমীরণ
কাঁপিতেছে মন প্রাণ অঙ্গ শিহরিলো॥

নং ২— ঝিঁঝিট—ঠুঁরি।

আগে যদি জানিতাম এত হ'বে অদর্শনে।
তবে কি সই অবহেলি আমার জীবন ধনে।
কালি সখি নিশি ভোরে   অচেতন নিদ্রাঘোরে
সে যেন ডাকিল মোরে   'প্রিয়ে' বলি সম্বোধনে।
পোড়া মান উপজিল   কতই সাধিতেছিল
কাল কোকিল কুহরিল [illegible] সেই ক্ষণে।
(সেই অবধি)   আমি যে আর আমি নয়   জীবনে হ'ল সংশয়
সখি তোমায় করি বিনয়   আনি দেহ প্রিয় জনে॥

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সুন্দরী।

কোমল মৃণাল বাহু যুক্তা সিমন্তিনী,
আর্ত্তের আশ্বাস তব বলয়ের ধ্বনি;
জলদ প্রতিম কেশ তাপিতের ছায়,
পূত-হৃদি-পদ্ম-গন্ধ ভুবন ভুলায়;
তুলিকা লিখিত ভুরু, ন্যায়ের সুধনু,
শাণিত কটাক্ষে মৃত, অধর্ম্ম, অতনু,
অপাঙ্গে প্রণয় সুধা দৃষ্টি সঞ্চালনে,
প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা পাষণ্ড জীবনে;
নির্ম্মলতা সুললাট অধর মধুত্ব,
মুখানি সন্তোষ, লাজ, কপোলে আরক্ত;
যৌবনের কান্তি তব মন্দাকিনী ধারা,
পাপীর অন্তরে শুদ্ধি, আধি ব্যাধি হরা;
রসনে সঙ্গীত বাস সুকণ্ঠে কোকিলা,
বিনয়ের সিঁথী চারু শিরে চারুশীলা;
এ হেন সুন্দরী তুমি বিধির সৃজনে,
ভুলিও না রূপ-গর্ব্ব, রেখ মনে মনে!!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বিবিধ প্রসঙ্গ।

৺ তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজ মাধবগিরির সম্বন্ধে আবার একি কথা শুনি! সর্ব্বনাশ! এই সে দিন—চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, 'এলোকেশী' সম্বন্ধে কেলেঙ্কারী লইয়া কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! সপরিশ্রম জেল—ঘানি ঠেলা! লজ্জাস্কর কাহিনী ঢাকিতে না থাকিতে আবার একি পাপ কথা শুনিতে পাই! জনরব [illegible] যখন চারি দিকে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, তখন যে একেবারে মিথ্যা, তাই বা বলি কেমন ক'রে? 'যা রটে তা বটে এখন সব 'বটে' না হক—কিছু ত বটে! আমরা এ সংসাদে স্তম্ভিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী যুবতী সুন্দরী রূপবতী। সুতরাং মোহান্ত মহারাজের মস্তক ঘুরিয়া গেল। যাই হ'ক সাধ্বী স্ত্রী আপন সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ...ই যথেষ্ট। ঘটনাটি এখন আদালতে গড়াইয়াছে, ঘটনা সত্য হ'ক আর মিথ্যা হ'ক—আমরা বলি মোহান্ত মহারাজ এখন বিদায় লউন। বৃদ্ধ বয়সে হিমালয়-কন্দরে অবস্থিতি করাই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত উপায়। গৃহস্থ ঘরের ঝি বউ তীর্থ স্থানে যাইবে, তাহাতে যদি এমন বিষম অন্তরায় থাকে, তবে ...র ৺ তারকনাথের [illegible] রক্ষা হইবে কি রূপে?

* *
*

ইতিপূর্ব্বে আমরা "জমিদার পঞ্চায়ৎ" সভা সম্বন্ধে দুই এক কথা ...লিয়াছিলাম। দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই অল্প দিনের মধ্যে সভার ...ত সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ... দেখিলাম, বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থানেরই জমিদারগণ ইহাতে যোগ ...ছেন। আমরা একান্ত মনে "জমিদার পঞ্চায়ৎ" সভার মঙ্গল প্রার্থনা ...।

...হোপ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায়ের বিশেষ উদ্যোগে দেশীয় ...দিগের টাকায়ও কেবল মাত্র দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানে তার-...র হইতে দশঘরা বা ধনিয়াখালি হইতে মেমারি পর্য্যন্ত একটি রেল লাইন ...বার প্রস্তাব হইতেছে। আমাদের ভরসা আছে, অমৃত বাবুর ন্যায় ... ব্যক্তি ইহাতে সফল হইবেন। পর মুখাপেক্ষী বাঙ্গালীর ইহাপেক্ষা ...দের বিষয় আর কি আছে?

দ্বিতীয় বৎসর, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১২৯৬।

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

" তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বরবিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ "

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১। মাধবী বল্লরী ... শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার ... ১৯৩
২। বউ কথা কও ... শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৯
৩। তেগ্ বাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ... ২...
৪। ফুলের সাজি (কবিতা ও গান) ... ২...
রাস লীলা ... শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত ...
প্রেম উপহার ... শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...
ভাবে ভুল ... শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...
মা ... শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ...
৫। সাহিত্য-সংবাদ ... সম্পাদক ...
৬। আগমনী—ভক্তের রোদন (গান) সম্পাদক ...

জনৈক মহানুভব, বিদ্যোৎসাহী, বদান্য ভূপতি মহোদয়ের
অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, " কর্ণধার " কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY NUNDO MOHUN BANERJEE & CO.
AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,
No. 4, Garstin's Place.

OUR NOTICE

OF

THE NATIONAL PAPER

AND

The Municipal Intelligencer.

All communications to the EDITOR *are to be addressed to B Nabogopal Mitter, Managing Editor, No. 10, Cornwallis S*

Business communications are to be addressed to the Manager, at School Book Depository, No. 10, Cornwallis Street.

All Advertisements intended for publication in the "National Pape should be sent on or before 12 o' Clock in the forenoon of Tuesday prec ding the date of each of our issue.

Our Travelling correspondents are Baboos Bholanath Bose, Behary Lall Mitter and Ramchandra Chatterjee who will be deputed on any spot their services will be required to report on cases of especial interest in the Mofussil. But person requiring their services should deposit before hand the necessary expenses.

We have also Reporters in our Staff who will do the like service in tion on deposit of expenses.

Our Rates for Subscription are Rupees ten per annum in advance; ne Rupee per Mensem for montuly Subscribers. Half rates for udents.

Advance Subscriptions may be made quarterly and halfyearly. But very advance made quarterly no odd sum shall be received.

Our Rates for Casual Advertisements will be as follow :—

Per Column	... ...	Rs. 12	0	0
Half Column	... ...	,, 8	0	0
Quarter Column	... ...	,, 5	0	0
Inch	... ...	,, 1	0	0
Per Line	... ...	,, 0	2	0

For Standing Advertisements great allowances will be made by our Manager on application to him.

হারাণ বাবুর নূতন উপন্যাস

সংসার আশ্রম।

প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ কর্ণধারের ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য।

কর্ণধার কার্য্যাধ্যক্ষ।

মাধবী বল্লরী।

প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইল, "সংস্কৃত চন্দ্রিকা" নামক সংস্কৃত পত্রিকাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি জাতীয় সর্ব্বোচ্চ ভাবে স্বর্গীয় ভাষায় গীত। কবিতাটি স্ত্রীলোকের লেখা। বাঙ্গলায় অনেক পুরুষ কবির এত উচ্চ—এত মধুর কবিতা পাঠ করি নাই। কবিতার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া সেই সময়ে আমার মন্তব্য লিখিয়া রাখি। মনে করিয়াছিলাম, কোন জ্ঞানী সমালোচক ইহার সুন্দর সমালোচনা করিবেন। তখন আমারও অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে।

দেশের দুর্ভাগ্য, কেহ আজও রত্ন আদর করিতে শিক্ষা করে নাই। আজি কাল যাঁহারা কবি নামে পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই সমালোচক মহাশয়দিগকে ঘুষ দিয়া "কবি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। বঙ্গ সাহিত্যে এই গাছড়াগুলির দৌরাত্ম্যে সুন্দর ফুলের চারা বড় একটা উঠিতে পায় না।

যে কারণেই হউক, কেহ সমালোচনা করিলেন না দেখিয়া আমরা অপারগ হইয়াও যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই আজ "কর্ণধারের" পাঠক পাঠিকা দিগকে উপহার দিলাম।

কবিতাটি এইঃ—

"মাধবী বল্লরী।*

১। নূতন বাসন্ত্যাদ্য সুহাস্যে,
কুড্মল ফুল্লে শ্যামল পত্রে
কিন্ত্বভিধেয়ং তে সুলভে হি,
শান্তিময়ি! ত্বং মাং কথয়েদম্।

---

* শ্রীমতী সরোজমোহিনী দেবী,
কাশীপুর।

২। সৌরভপূর্ণে মন্দ সমীরৈ
ঘূর্ণিতদেহে শীর্ণসুকায়ে
মাধবি কস্মাৎ এষি সুসাধ্বি !
শান্তময়ি ! ত্বং মাং কথয়েদম্ ।

৩। ফুল্লপ্রসূনৈর্নিত্যমুর্ষসি
শোভিনি ! কস্মৈ পূজয়সি ত্বম্
শুভ্রতুষারৈ সাশ্রুসুনেত্রা
শান্তিময়ি ! ত্বং মাং কথয়েদম্ ।

৪। বল্লরি ! কিং মে ত্বিন্দ্রিয়চিত্তম্
সুন্দরি ! প্রাপ্স্যাত্যু ত্তমরূপম্
সুস্মিতবক্ত্রে দেবি সুসীমে
শান্তিময়ি ত্বং মাং কথয়েদম্ ।

৫। ইহ মর্ত্ত্যতলে সুঘনে সুঘনে
সলিলে বলিসদ্মঋভুসদনে
শিশিরাস্র সুচন্দ্রমসঃ কিরণে—
চপলা সুতড়িত্যনলে পবনে

৬। ক্ষিতিভৃৎশিখরে তটিনীপুলিনে
মরুভূমিতপোবনপদ্মবনে
অতলে জলধৌ গহনে বিজনে
নবনীলময়ে বিমলে গগণে ।

৭। দীপ্তিবিহীনং, মূর্ত্তি বিহীনম্
চিত্তবিহীনং নাম বিহীনম্
পারবিহীনং সম্বিত তীতম্
কুত্রলাতে প্রাপ্স্যামি তমীশম্ !

৮। তং পরমাত্মানং পরমেশম্
মোহিতচিত্তে জ্ঞান প্রদীপম্

নাথমনন্তং ভাস্করনেত্রম্
সুন্দরি ! কিং প্রাপ্স্যামি তমীশং ।

৯। তদিতু ভুবনে বৈ তৎসমা চারুশীলা—
কুহুকদূরিতপূর্ণে নাস্তি প্রেয়ান্মুমত্তা
সকলসমকপ্রাণোর্নির্বিকল্পস্য তস্য
বর কুসুমসুকেশি ! ত্বং হি ধন্যা ধরণ্যাম ।”

ভাব ও ভাষা লইয়াই কবিতা। জড়জগতে শক্তি (force) যে ভাবে কার্য্য করে, অন্তর্জগতে কবিতাও সেই ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। সুন্দর ভাব সুন্দর ভাষায় পরিস্ফুটিত হইলে জড় বস্তুও জীবিত পদার্থের শক্তি প্রাপ্ত হয়। সেই জীবন্ত ভাবে মনুষ্যের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। সুন্দর ভাব অন্তরে অনুভব করিয়া কবি দেখিতে পান্, জড় ও অন্তর্জগৎ রূপ দুই শাখা বিস্তার করিয়া ভগবান বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন

যেরূপ একটি বৃক্ষের সহিত তাহার অতি ক্ষুদ্র পত্রেরও সম্বন্ধ আছে, সেইরূপ এই বিশাল শরীরী ব্রহ্মাণ্ডের সহিত প্রতি পদার্থের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই সমস্ত দেখিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন,—

“তব নিঃশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোঽখিলং জগৎ,
বিশ্বভূতানি তে পাদঃ শীর্ষোদ্যৌঃ সমবর্ত্তত ॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতি,
চন্দ্রমা মনসোজাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্য স্তব প্রভো ॥
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতা স্তুতিঃ স্তব্য ইহ ত্বমেব
ঈশ ত্বয়া বাস্যমিদং হি সর্ব্বং নমোস্তু ভূয়োঽপি নমোনমস্তে ॥”

এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে কবির ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে ‘প্রণয়, নাম দিতে হয়। মণিমালায় আবদ্ধ রাখিয়াছে যেমন সূত্র, অনন্ত জীব জন্তু পরিপূরিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড একত্রিত রাখিয়াছে—সেই রূপ প্রণয়। কবিত্ব এই সম্বন্ধ দেখাইবার শক্তি (Power of interpretation)।

“মাধবী বল্লরী” র ভাব ও ভাষা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভাষার কথা আমরা বলিব না। ভাব লইয়া আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

হৃন্মর্ম্মে প্রবেশ করিলে, আমরা দেখিতে পাই, এক জাতির সহিত আর এক জাতির যতই কেন সাদৃশ্য থাকুক না, নানা কারণে এক এক জাতির এক একটি বৃত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। অন্য কোন জাতির দুই এক জনের এই রূপ বৃত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই পরিপুষ্ট ভাব অন্য কোন জাতির আপামর সাধারণের এত প্রিয় হয় না। এই যে আজ এই ঘোর অরাজকতার দিনে আমাদের জাতীয় সুচিহ্নিত ভাব ধীরে ধীরে জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, বিজাতীয় রাজার আধিপত্যে বিজাতীয় ভাব সমূহ অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া জাতীয় ভাবকে মলিন করিতেছে; রাজার কৌশল অধিক, শাসন দুরূহ,—এজন্য বিজাতীয় চিন্তা স্বভাবের বিরোধী হইয়াও সমস্ত জাতীকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিতেছে, যেন আমরা কি এক মহামূল্য রত্ন হারাইতেছি, অথচ ভাল করিয়া বুঝিতেছি না, আমাদের কি অপহৃত হইতেছে;—এই ঘোর বিপ্লবের দিনে যদি কাহারও মুখ হইতে আমাদের পিতৃ পিতামহাগত সেই জাতীয় ভাবের কথা শুনিতে পাই, যদি কোন ক্ষমতাবান অথবা ক্ষমতাবতী কবিকে সেই জাতীয় ভাব মধুর ভাষায় ধ্বনিত করিতে শুনি, তখন আমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হয়?—

কিরূপ হয়, মুখে তাহা বলা যায় না, ভাষায় তাহা সঙ্কুলন হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের সহিত বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ প্রাণে প্রাণে জড়িত। যদি এই স্থূল জগৎ ভেদ করিয়া অন্তঃর্জগতের অন্তস্তলে আমরা প্রবেশ করিতে পারি, সেখানে দেখিতে পাই—সৌন্দর্য্য। স্থূল জগৎ সৌন্দর্য্যের আবরণ মাত্র। সৌন্দর্য্য-জগৎ জগদান্তরে বিরাজিত। কিন্তু সৃষ্টির এমনি কৌশল, যেন বাহ্যজগতে শত শত দ্বার এই সৌন্দর্য্য জগতের জন্য উন্মুক্ত। এই উন্মুক্ত পথে নিরন্তর মধুর ধ্বনি উঠিতেছে। কে যেন কোন কালে সেই স্থূলজগতের মূলে দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজাইয়া গিয়াছে। যেন সে বংশী এখনও অনন্ত রন্ধ্রে, অনন্ত জীবের নাম লইয়া, অনন্ত জীবকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। ভক্ত বলেন, পরমাত্মা এমনি করিয়াই জীবাত্মাকে ডাকিতেছেন।

এক সময়ে বৃন্দাবনে এই মুরলী শ্রুত হইয়াছিল। ষষ্ঠীসহস্র আত্মা

এই বংশীধ্বনি শুনিয়া আত্মহারা হইত। ষষ্ঠী সহস্র গোপিনী উন্মত্তা হইয়া বলিত, "হায়, কাহার বাঁশী, এত মধুর রবে কেন আমায় ডাকিতেছে?" এ স্থূল গৃহ তাহার ভাল লাগিত না, এ সংসারে তাহার মন বসিত না, সে সংসারে কাজ করিত ভোলা মনে; সুতরাং কাজ আর ভাল হইত না। সে কাজ করিতে করিতে সব ফেলিয়া দিয়া শুনিত, বুঝি বাঁশী আবার ডাকিতেছে। কোকিলের রব শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিত, রজনীর নিস্তব্ধতায় সে অস্থির হইত, সে অস্থির আত্মা কেবল সময়ের অপেক্ষা করে; যখন সংসার সুপ্ত, তখন অতি ধীরে, অতি সংগোপনে, অতি নীরবে সংসার ফেলিয়া বাহির হইত। যখন বুঝিত, কেহ দেখিল না, তখন কাতর পদে সেই বাঁশরী পানে ছুটিত। হায়, যে একবার সেখানে গিয়াছে, যে একবার একাধারে সেই অনন্ত রূপ—অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, যে একবার দেখিয়াছে, কোথা হইতে সেই মধুর বংশী অনন্ত জীবের নাম লইয়া অনন্ত ভাবে বাজিতেছে, যে একবার সেই ত্রিভুবন সন্তাপহারী, ত্রিভঙ্গ মুরারী, বংশীধারীর হস্তে ত্রিভুবন মোহন বংশী দেখিয়াছে, হায়! আর কি তাহার সংসার ভাল লাগে? আর কি সে সেসঙ্গ ত্যাগ করিতে চায়? ইচ্ছা, তাঁর চরণের নুপুর হইয়া নিরন্তর সেই বাঁশরী শুনিতে পায়।

এক দিন গোপবধূ সেই বংশীধ্বনি শুনিয়াছিল, এক দিন রাধা (প্রধান ভক্ত) সেই উন্মুক্ত পথে ছুটিয়াছিল। এখনও সেই সকলি আছে,—সেই বৃন্দাবন আছে, সেই তমাল রাছে, সেই গোপবধূ আছে, সেই মুরলী আছে; অনন্ত রন্ধ্রে অনন্ত নাম লইয়া নিরন্তর সেই ভাবে ডাকিতেছে। কিন্তু হায়, গোপবধূ (জীবাত্মা) আর সে বংশীধ্বনি শুনেনা,—হায়! আজ সমস্ত জাতির অন্তর মরুভূমির মত পড়িয়া রহিয়াছে। আর এ হৃদয় ভক্তিপ্রেমে মজিয়া উঠেনা, আর এ জাতি জগৎ ভরিয়া বিশ্বনাথের মোহনমূর্ত্তি দেখিতে পায় না। ভারত ভরিয়া আজি হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র অশান্তি, সর্ব্বত্র অরাজকতা। এক সময়ে কত সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিতাম; ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেমে হৃদয় পূর্ণ ছিল। এখন ইহাদের বিরহ অনুভব করিতেছি। এক সময়ে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ দেখিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি।—

"নমে হিয়া শংসতি কিঞ্চিদীপ্সিতং
স্পৃহাবতী বস্তুষুকেষু মাগধী।"

পড়িয়া মনে বড় আমোদ হইত। এখন আর তাহা নাই। এক সময় স্বামী স্ত্রীকে দেবী সম্বোধন করিতেন, স্ত্রী স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলিয়া ডাকিতেন; স্বামী গৃহে আসিলে স্ত্রী উপচারাঞ্জলী ক্ষিপ্তহস্তা, পরিপ্লুত নেত্রা হইয়াও সম্ভাষণ করিতেন; তখন মনে বিশুদ্ধ আনন্দ হইত। এখন দেশ ভরিয়া কোথাও ইহা দেখিতে পাই না। আজ আদর্শের অভাব হইয়াছে। যাহা ভাল, যাহা সুন্দর, যাহা পবিত্র—তাহার অভাব। শুদ্ধ অভাব নয়—বিরহ। পূর্ব্বে আমাদের ছিল, এখন গিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা গৃহে গৃহে অর্জ্জুনের কথা শুনিতাম। এক বৎসর ধরিয়া উত্তরাকে শিক্ষা দিয়াছেন, বালিকা, হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছে; কিন্তু অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে উত্তরাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেছেন; অগ্রজ অনুরোধ করিতেছেন—উত্তর আগ্রহ জানাইতেছেন, রাজা উপবাচক হইয়াছেন,—কিন্তু যাহাকে শিক্ষা দিয়াছি, সে যে কন্যা। তাহাকে বিবাহ করিব কিরূপে? হায়, এ প্রবৃত্তির উপর অধিকার আর ত দেখিতে পাই না। হায়, যাহাকে উর্ব্বশী—স্বর্গীয় অপ্সরা হইয়াও প্রলোভন দেখাইতেছে, হাসিতে হাসিতে সে উত্তর দিতেছে,—

"কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীন্দ্রানী,
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে জানি।
* * *
কুলের জননি! ক্ষমা করিবে আমারে।"

হায়, এ শিক্ষা এখন কোথায়?

এইরূপে যে দিকে দেখি, সেই দিকেই বিকার। এক সময়ে সকলি ছিল; স্বামী স্ত্রী, শিক্ষক ছাত্র, অগ্রজ, কনিষ্ঠ, পিতা পুত্র; ইহাদের পরস্পরে দেবতা মনুষ্য সম্পর্ক ছিল। এখন ইহারা অন্তর্হৃত হইয়াছে। এক সময়ে ধনধান্য ছিল, সুখসম্পদ ছিল; এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। এক সময়ে উচ্চভাবে কবি গান গাহিতেন, গ্রন্থকার গ্রন্থ

লিখিতেন, শিক্ষক শিক্ষা দিতেন, এখন তাহার বিরহ। এক সময়ে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে নিস্বার্থভাব ছিল, অতিথি পুত্রাপেক্ষা আদৃত হইত, এখন আর তাহা নাই। এক সময়ে লোকের উচ্চ প্রবৃত্তি সতেজ ছিল, হৃদয় বর্ষাকালের নদীর মত সৎপদার্থে পূর্ণ ছিল। এখন তাহার বিরহ। তাই যদি কেহ কাঁদে, "কত দিনে ঘুচুব গুরুয়া দুঃখভার" তখনি হৃদয় বড় কাঁদিয়া উঠে। অমনি প্রকৃত কথা স্মরণ হয়। এখন যে আর চাঁদ চকোরে কেলী করেনা, ভ্রমর কমলে মিলিত হয় না, তড়িৎ মেঘে খেলা করে না। স্মরণ হয়, আর যে বিধবা ঈশ্বরে মিলিত হয় না, আর যে সধবা স্বামীর জন্য আত্মহারা হয় না, আর যে কবি প্রকৃতির জন্য উন্মত্ত হয় না, আর যে হৃদয় মুখে সমতুল হয় না, আর যে ধর্ম্মে মানুষে দেখা হয় না। হায়, এখন ভারতবাসী প্রকৃতই বুঝি ইহাদের বিরহ অনুভব করিতেছে। এইজন্য দেশ মলিন স্ফূর্ত্তিবিহীন। দেশ শ্মশান হইতেছে, দিন দিন অল্পে অল্পে সোণার ভারত পুড়িতেছে। চারিদিকে আগুন লাগিয়াছে, কেহ উপকারার্থ আসিতেছে না। কেহ সাহায্য করিতে পারিতেছে না। যাহারা আসিতেছে, তাহারা দুর্ব্বল। জ্বলন্ত চিতা হইতে টানিয়া আনিবার শক্তি তাহাদের নাই! মাথার উপরে গৃহ পুড়িতেছে—স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আজ সকলেই গৃহে আবদ্ধ। গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না, মধ্যে মধ্যে দগ্ধ গৃহ হইতে, অগ্নিখণ্ড গাত্রে পড়িতেছে,—স্ত্রী পুত্র সহ ভারতবাসী হাহাকার করিয়া উঠিতেছে;—হায়! এ যাতনা সহ্য হয় না। আজ যে ইহারা অসহায়, অতি নিরুপায়—নানা অভাবে চক্ষের উপর স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ কুলত্যাগ করিতেছে—আর ত ইহা দেখিতে পারি না। চারিদিকে হাহাকার। সকলেই গৃহে একেবারে আগুন লাগিয়াছে—আজ যে আগুন দিয়াছে, বিপন্ন ভারত তাহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে,—হায়, তাহারাই যে শত্রু!

তাই বলিতেছিলাম, জীবন ত গিয়াছে। কতকগুলা দেহ, গলিত-ঘৃণিত কৃমি কীট পরিব্যাপ্ত প্রবৃত্তি লইয়া স্বার্থে ডুবিয়া রহিয়াছে।—চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। হায় মা! এ সময়ে—এই গভীর দুর্যোগে—শব সাধন করিয়া কে আর তোমায় উদ্ধার করিবে?"

কিন্তু কি বলিতেছিলাম—সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য আর কেহ দেখে না। যাঁহারা ও দেখেন, তাঁহাদের সংখ্যা দুই একটি। এই দুই একটির মধ্যে "মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী একজন।

দেখিয়াছিলেন, ওয়ার্ড্‌স্ ওয়ার্থ, দেখিয়াছেন, "মাধবীবল্লরী রচয়িত্রী। বঙ্গসাহিত্যে দুই এক জন যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নাম এখানে নিষ্প্রয়োজন। সমুদ্রতীরে কত শঙ্খ পড়িয়া থাকে, শঙ্খ তুলিয়া কর্ণের নিকট ধর, শুনিবে, সেই গভীর সমুদ্র গর্জ্জন শঙ্খের প্রাণে প্রাণে জড়িত। এক সময়ে সেই বিশাল সমুদ্র নিনাদ শঙ্খের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ শঙ্খ সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে; তুমি ভক্ত, একবার ভক্তির কাণ পাতিয়া শুন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে সেই গভীর সচ্চিদানন্দ ধ্বনি শুনিতে পাইবে, —শুনিতে পাইবে "সোহং"। ওয়ার্ড্‌স্ ওর্থ য়ম্ তাহাই শুনিয়া ছিলেন,— তাই বলিলেন, "Such a shell is this universe to a ear of faith." মাধবীবল্লরীর কথা পরে বলিব।

তাই বলিতেছিলাম, যদি কেহ সেই সৌন্দর্য্য দেখে, আর যাহা দেখিয়াছে, তাহাই দেখাইতে চায়, তখন মনের অবস্থা কিরূপ হয়?

ঠিক করিয়া বলা যায় না—কিরূপ হয়।

যাহা জগতে সুন্দর দেখিয়াছি, যেন একসঙ্গে সকল ভাব ফুটিয়া উঠিতে চায় সে ভাব ব্যক্ত হয় না—যদি বলি সুযোযিত বল্লকী নিপুন যন্ত্রীর কোমল অঙ্গুলি স্পর্শে যেমন নাচিয়া উঠে, মধুমাতল শত শত মধুকরের এককালীন ঝঙ্কারের ন্যায় যেমন ঝঙ্কার দিয়া উঠে আমাদের আত্মাও সেইরূপ উন্মত্ত ভৃঙ্গের ন্যায় ঝঙ্কার করিতে থাকে তবুও যেন সব বলা হইল না বোধ হয়। যদি বলি নিদাঘে রজনীশেষে গঙ্গা শৈকতশায়ী, প্রভূতবলশালা উন্মত্ত মাতঙ্গ সমীপে তৎপ্রবোধনার্থ মদপটু রাজহংস সমূহের মধুর গীতি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে যেমন হয়—যদি বলি সেই সমুদ্রতটে গোকর্ণ নিকেতনে দেবাদিদেব মহাদেবের সমীপে বীণাহস্তে, অপ্সরাপ্রথিত পারিজাত পুষ্পখচিত দিব্যমাল্য সহিত, ভগবান্ প্রেমে উন্মত্ত দেবর্ষি নারদকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিলে যেমন হয়—তবুও যেন সব বলা হইল না বোধ হয়।

"মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী সেই জাতীয় ভাব স্পর্শ করিয়াছেন,—আর্য্যঋষিদিগের যাহা বড় সাধনার ধন, বড় আগ্রহের সামগ্রী, যাহা প্রচারের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া ছিলেন, যাহা সমগ্র জাতির চরিত্র গঠিত করিয়া ছিল। সেই জাতীয় চরিত্র কি? সমস্ত হিন্দু জাতির পৈতৃক সম্পত্তি এই "সাত্বিক ভাব।"—যাহার জন্য নারদ উন্মত্ত, চৈতন্য পাগল, যাহার জন্য মহাদেব বর্ষণোন্মুখ জলপূরিত অথচ নিস্তব্ধ মেঘের ন্যায় কোটি কোটি জীবজন্তু লুক্কায়িত, অথচ অচঞ্চল তড়াগের ন্যায় ধ্যানস্তিমিত, যাহার জন্য আর্য্যঋষি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, এ সেই সাত্বিক ভাব। কবি সেই জাতীয় চরিত্রে ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, সাত্বিক ভাবপূর্ণা মুগ্ধা মুনিকন্যার মত মাধবীবল্লরী দেখিয়া আলাপ করিতেছেন! তোমার আমার চক্ষে কত মাধবীবল্লরী পড়িয়াছে, কত মাধবী ফুল ফুটিয়াছে, কিন্তু মাধবীবল্লরী আমাদের আছে সেই লতিকা মাত্র; সেই সুখদুঃখ বিরহিতা, মনুষ্যপ্রণয়প্রত্যর্পণ-অসমর্থা সামান্য লতা। কারণ আমরা দেখিতে জানি না, হৃদয় হইতে সেই মসৃণ, সেই কি-জানি-কি পদার্থ তুলিয়া লতিকাকে স্নাত করিয়া সুখদুঃখ গ্রাহী করিতে জানিনা, নিজের প্রাণ দিয়া তাহাকে সজীব করিতে পারি না, তাই সে আমাদের চক্ষে শুধু লতিকা। শুধু ফুল ফোটে, শুধু গন্ধ ছোটে, এই মাত্র জানি। এইজন্য আমাদের দর্শন সুখ বা আঘ্রাণ সুখ ক্ষণিক। কিন্তু "মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী দেখিতে জানেন। প্রথম বসন্তাগমে সদ্য মাধবী অল্পে অল্পে ফুটাইতেছে, শ্যামলপত্র পরিয়াছে, মধুর হাস্য করিতেছে; কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সুলতে, শান্তিময়ি! তোমার নাম কি?"

প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা। তোমার আমার কাছে এটা এক অসম্ভব কথা। মাধবীলতা একটা অচেতন পদার্থ—ইহার নাম জিজ্ঞাসা বাতুলতা। কালিদাসের যক্ষ বুঝি এই বাতুলতা করিতেছিল।—রামগিরির আশ্রমে পবিত্র সরোবর—তাহার তীরে স্নিগ্ধচ্ছায় তরুতলে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল,—দিন যায় মাস যায়, ভাবনা ফুরায় না—ভাবিতে ভাবিতে শরীর অবস হইল—হস্তস্থিত বলয় খসিয়া পড়িল—হঠাৎ এক দিন দেখিল—নির্ম্মিত শৃঙ্গের উপর একখানা মেঘ আসিয়া যেন ক্রীড়া করিতেছে।

অন্তর্বাষ্প সেই যক্ষ মেঘাগমে অস্থির হইল—মনে করিল, ইহার দ্বারা সংবাদ পাইব—তখন তাহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল।—জিজ্ঞাসা করিল, ভালয় ভালয় আসিয়াছ ত? পাছে লোকে বাতুলতা মনে করে, এই ভাবিয়া কালিদাস সন্দেহ মিটাইতে বসিলেন—তোমার আমার মনের কথা আমাদিগকে মুখে প্রকাশ করিতে না দিয়া বলিলেন, "ধূম জ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্বমেঘঃ সন্দেশার্থাঃ ত্বপটুকারণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াই তৌৎসুক্যাদ পরিগণয়ম্ গুহ্যকস্তং যথাচে অগ্র কামার্ত্ত হি প্রকৃতি কৃপণা শ্চেতনা চেতনেষু।" কালিদাস দেখাইলেন, প্রণয় উত্তেজিত অন্তঃকরণে চেতনাচেতন বিচার করে না। একটু ঘুরাইয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, যখন "কো জানে কাহে আকিসিঞ্চই" এই বলিতে বলিতে হৃদয় কাতর হয়, যখন সংসারের আদর্শের বিকার দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, যখন সংসারের গর্হিত আচরণ দেখিয়া পবিত্র উন্নত হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ হয়, সমস্ত সৎবৃত্তি স্ফূরিত হইয়া হৃদয়ভূমি অতিক্রম করিয়া উছলিয়া পড়ে, তখন ত কেহ অচেতন থাকে না; সেই আবেগ জলে সমস্তই স্নাত হইয়াছে, যাহা দেখি—তাহাই সজীবতা লাভ করিয়াছে, সকলেই আমার হৃদয় লইয়া আমি যাহা দেখিতে চাই, তাহাই দেখাইতেছে। তখন আমার হৃদয় শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমারই প্রশ্নের উত্তর দিতেছে। আমি যাহা চাই, সংসারে তাহাত পাই না;—পাইনা বলিয়াই হৃদয় ব্যাকুল—ব্যাকুল বলিয়াই হৃদয় সুন্দর বস্তু দেখিলেই তাহাকে সজীব করিয়া লয়—তাহার মনের কথা জিজ্ঞাসা করে। "মাধবী বল্লরী" রচয়িত্রী তাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তোমার নাম কি?"

এইখানে কবিদিগের একটু শক্তির কথা বলা আবশ্যক। তুমি যদি কখন কবির অবস্থায় পড়, তবে তুমিও তাহাদের অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে পারিবে।

"মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী নবম শ্লোকে "সংসারের" একটি মাত্র বিশেষণ দিয়াছেন। কবি সংসারকে বলিতেছেন—"কুহুক দূরিতপূর্ণ।" সংসার কুহুক দূরিতপূর্ণ। আইস পাঠক, একবার অনুভব করিয়া বল, সংসার কুহুক দূরিতপূর্ণ। তাহাহইলে তুমিও মাধবীর সহিত কথা

কহিতে পারিবে, তুমিও আত্মহারা হইতে পারিবে; আত্মবিস্মৃতিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যে মুহূর্ত্তে হৃদয় হইতে "কুহুক দূরিতপূর্ণ" কথা আপনা আপনি বাহির হইবে, সেই মুহূর্ত্তে দেখিবে, তোমার আত্মা উন্নত হইয়াছে। তোমার আত্মা সংসার-সংকল্প ছেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তুমি সংসারে ডুবিয়া থাকিলে কিরূপে বুঝিতে, সংসার ভাল কি মন্দ? পশু নিজের পশুত্ব বুঝিতে পারে না। পশু হইতে উন্নত—মানব তাহা বুঝিতে পারে। তবে মনুষ্য নিজের মনুষ্যত্ব বুঝিবে কিরূপে? যখন মানুষ নিজের নিজত্ব বিস্মৃত হয়, নিজের ক্ষুদ্র জগৎ ভুলিয়া উপরে উঠে, সেই উচ্চস্থান হইতে দেখিতে পায়, পূর্ব্বে কি ক্ষুদ্র ছিল। এই আত্মবিস্মৃতি মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। এই আত্মহারাই বুঝি জগতে প্রকৃত সুখ।

এই শক্তি আছে (Thought contranscent) এই জন্যই মনুষ্য Spiritual. যখন এই উচ্চ জগতে যাইবে, তখন দেখিতে পাইবে, সংসার কুহুক দূরিতপর্ণ।

যদি ইহা অনুভব করিতে পার, তবে আইস, একসঙ্গে বলি, একটি বিশেষণে অন্তরের কতখানি ব্যাকুলতা, কতখানি উচ্চতা প্রকাশ পাইয়াছে।

* * *

সংসার মায়া ও পাপে পূর্ণ! আমি ইহাতে ডুবিয়া থাকিতে চাইনা। আমার হৃদয় চায়, সরলতা—পবিত্রতা। ইহাও কোথাও দেখিতে পাই না, যাহাদিগকে পবিত্র মনে করি, যাহাদিগকে সরল মনে করি, যাহাদিগকে উন্নত ভাবি, কৈ ব্যবহারে ত তাহা দেখিতে পাই না। শতবার ভাবিলাম, শতবার প্রতারিত হলাম। আবার আশা—হয়ত আবার দেখিতে পাইব। আবার ভাবি, আবার প্রতারিত হই। কি অশান্তি! যুড়াইবার স্থান নাই। দেখি সংসার কি এক স্বার্থে ডুবিয়া রহিয়াছে। নীচতা, কপটতা ক্ষুদ্রত্বের উপর সারল্যের একটা আবরণ দিয়া লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসার প্রবৃত্তির পূজা করিতেছে। ইহাতে ত অন্তর তৃপ্ত হয় না।

সংসারের সকল কার্য্যেই যখন হৃদয়ে এইরূপ অশান্তি, তখন কিন্তু কবির চক্ষে সংসার কি সুন্দর! প্রাণ যাহা চায়, তাহা পায়। এখানে একটি মাধবী বল্লরী পড়িয়াছে। তাহা দেখিতেছি,—প্রাণ ভরিয়া হাস্য—সারল্যের

প্রতিকৃতি—শান্তির আধার—ইহাকে কেন জিজ্ঞাসা করি না? এত শান্তি, এত হাসি, এত সরলতাও এ সংসারে আর নাই, কবি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই অশান্তির রাজ্যে তুমি "শান্তিময়ি! তুমি বাসন্তি, সুলতে,হাস্যময়ি,—কিন্ত্বভিধেয়ং।" কি সুন্দর—কি মধুর—কি প্রাণারাম সম্বোধন!

প্রথমে নাম, পরে ধাম। "সুসাধ্বি! শান্তিময়ী মাধবি! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সুমন্দ সমীরণে তোমার দেহযষ্টি ঈষৎ হেলিতেছে, তোমার পবিত্র শরীরের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতেছে, তুমি কি এই পৃথিবীর? সাধ্বি!—এই কপট ব্যভিচার সঙ্কুল পৃথিবীতে তুমি আসিলে কোথা হইতে, তাহা কি আমায় বলিবে না?

কি জিজ্ঞাসা! বুঝি এই অপবিত্র রাজ্যের পরে আর একটি রাজ্য আছে—বুঝি সে রাজ্যে তোমার মত সকলেই সুসাধ্বী। যেমন দূরাগত একটি সংগীত শুনিয়া কিম্বা অপরিচিত একটি পথিক দেখিয়া কি এক স্বপ্ন রাজ্যের কথা মনে পড়ে, যেন কখন সেখানে ছিলাম, যেন ইহাদের মত সেখানে কিছু দেখিয়াছি, মনে এইরূপ কত কথা জাগিয়া উঠে,—তাই মন আগ্রহের সহিত জানিতে চায়, বলিয়া উঠে "কস্মাৎ এষি।"

প্রথমে নাম, পরে ধাম, পরে কার্য্য। শোভিনি! তুমি কি এক অপূর্ব্ব ক্রিয়ায় নিযুক্ত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নব নব ফুল ফোটাইয়া, তুমি কাহাকে পূজা করিতেছ? তোমার চক্ষে এ শুভ্র তুষারাশ্রু কেন? শোভিনি! অশ্রুপূর্ণলোচনে কুসুমরাশি লইয়া কাহার পদে অর্ঘ্য দিতেছ, আমায় কি বলিবে না? আর, সংসারের লোক কি ক্রিয়ায় ব্যস্ত।

ইহার নাম তন্ময়ত্ব কি? যে ভাবে ভক্ত বলিয়া উঠেন, "আত্মা নম্যত্মনন্তব লোকয়ন্তং" সে ভাব ভক্তের হৃদয়ে বুঝি অধিকক্ষণ থাকে না। Caird সাহেব বলেন, Religion is the elevation of the finite spirit in to the communion with the infinite. জলবিন্দু অনন্ত সমুদ্র অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াও দেখিতে পায়, নিজে কত ক্ষুদ্র ছিল। সেই Communion অবস্থায় পড়িয়াও পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করে। যে মনের কোন বিকৃতি হয় নাই, সেই মন যখন উন্নত ভাব ধারণ করিয়া উন্নত জগতে

চলিয়া যায়—যত অল্পসময় সেখানে থাক না কেন—আত্মবিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই যেন পূর্ব্বস্মৃতি আসিতে থাকে। এই পূর্ব্ব অবস্থার সহিত আধুনিক অবস্থার তুলনা হৃদয়ের ক্রিয়া নহে, ইহা জ্ঞানের ক্রিয়া। জ্ঞানের ক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, আত্মা আর সেই তন্ময় ভাবে থাকিতে পারে না।

কবি দেখিতেছেন, কৈ মাধবার মত তাঁহার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ত সুন্দর হয় নাই। কবি তখন স্মরণ করিতেছেন, মানবাত্মা অসীম—দেখিতেছেন, মাধবী সুসীম। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুসীমে! শান্তিময়ি! সুস্মিত রন্ধ্রে! তোমার মত সুন্দর চিত্ত ও ইন্দ্রিয় কি আমার হইবে? সুন্দরি! তুমি আমায় এই কথা বল।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য বলিতে পারে, আমি কি ক্ষুদ্র—যে মুহূর্ত্তে বলিতে পারে, আমার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সুন্দর নহে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার আত্মা উন্নত ভাব প্রাপ্ত হয়। উন্নত ভাব প্রাপ্ত না হইলে কখন নিজের নীচত্ব অনুভব হয় না।

যে মুহূর্ত্তে কবি নিজ চিত্তেন্দ্রিয়ের সুন্দর রূপ গাহিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে তিন উন্নত। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া কি এক সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতেছেন। পঞ্চম হইতে অষ্টম শ্লোকে কবিতার পূর্ণতা। ইহাই কবি হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাস।

এখন আর সম্মুখে মাধবী নাই। মাধবী যাহাকে পূজা করিতেছিল, যেন লতিকা কবিকে সেই স্থান দেখাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে—কবি-চক্ষে চরাচর ব্যাপী কি এক অবর্ণনীয় পদার্থ প্রতিভাত হইতেছে। বলিতেছেন,—

"ইহ মর্ত্ত্যতলে সুঘনে সুঘনে
সলিলে বলিসম্মখাতুসদনে
শিশিরাশ্রু সুচন্দ্র সমঃ কিরণে
চপলা সুতড়িত্ত্যনলে পবনে
ক্ষিতিভৃত্ত শিখরে তটিনী পুলিনে
মরুভূমি তপোবন পদ্মবনে
অতলে জলধৌ গহনে বিজনে
নবনীলময়ে বিমলে গগনে।"

এ কি অপূর্ব্ব পদার্থ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহার নাম ত কবি দিতে পারেন না। ভাষা দিয়া ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। লোকে যাহাকে দীপ্তি বলে, কৈ, এ ত তাহা নহে—ইহার মূর্ত্তি নাই, চিত্ত নাই, নাম নাই, পার নাই,—কৈ ইনি যে জ্ঞানাতীত;—কবি-হৃদয় ইহাকে কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইতেছে না। যখন মন ইহা খুঁজিতেছে, তখন ইহা জ্ঞানের ক্রিয়া। সেই চঞ্চল তন্ময় ভাব দেখা দিয়া বিদ্যুতের মত চলিয়া গিয়াছে, প্রকাশ করিবার চেষ্টা মাত্র তাহা অন্তহৃত হইয়াছে।

যখন একবার তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়, তখন কি অপার আনন্দ! দেখিতে দেখিতে সে ত চলিয়া গিয়াছে, অন্তর অতিশয় ব্যাকুল। কবি আবার সম্মুখে দেখিলেন, সেই হাস্যময়ী লতিকা। তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, লতিকে, এই মাত্র যাহাকে তুমি আমায় দেখাইলে, আমি কি তাহাকে পাইব? সেই অতিন্দ্রিয়, সেই সর্ব্বব্যাপী, সেই অজ্ঞান হৃদয়ের জ্ঞান প্রদীপ, সেই পরমেশ্বর, সেই অনন্ত ভাস্কর-নেত্র জগন্নাথ—বল সুন্দরি, আমি তাঁহাকে কিরূপে পাইব? কবি এইরূপে দেখিতেছেন, এইরূপে আলাপ করিতেছেন, কি সুন্দর ভাব! কি বিমল আনন্দ!

দার্শনিকেরা আনন্দের উত্তম অধম বাছিয়া থাকেন। যিনি হিন্দুজাতির এই সাত্বিক আনন্দ একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ আনন্দ বিরাজমান—ইহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ঐ যে বলিতেছিলাম, অন্য জাতির মধ্যে দুই এক জন কবি আছেন—তাঁহারাও এইরূপ সাত্বিক ভাবপূর্ণ। আমাদের ওয়ার্ড ওয়ার্থের কথা মনে পড়ে। যিনি এইরূপ মাধবীবল্লরী দেখিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিতেন। যিনি লতায় পাতায়, ফলে ফুলে, প্রান্তরে কান্তারে, কাহার যেন সাক্ষাৎ পাইতেন। যিনি সেই অস্তমিত সূর্য্যালোকে, উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সলিলে, জীবিত পবনে, মানব-মনে কাহার বাস-ভবনে দেখিতেন, কাহার গতি, কাহার শক্তি, যেন প্রতি পদার্থের মধ্যে। চিন্তাযোগ্য প্রতি বস্তুর মধ্যে তিনি কার্য্য করিতে দেখিতেন। আমাদের কবি হিন্দু রমণী। এই ঘোর বিপ্লবের দিনে, পরমুখাপেক্ষী সেই উন্নত আর্য্য-জাতির এই অবনতির দিনে, সেই জাতীয় সাত্বিক ভাবে গীতি গাহিয়াছেন।

হেগেল, হিরাক্লিটসের একটি পূর্ণগর্ভ পদ গ্রহণ করিয়া তাহাতে নব সমাজের শত সহস্র ঝঙ্কার তুলিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই কবি যদি অন্য কিছু না ও লিখিয়া যাইতেন,—তাঁহার একটি মাত্র কবিতা পাঠে হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর কবি বলিয়া ঘোষণা করিবে সন্দেহ নাই। * * * *

মাধবীবল্লরীর ভাব নূতন না হইতে পারে, কিন্তু ইহাই কবিত্ব। নূতন ভাবের জন্য দর্শন আছে। কবি চিত্রকর। তাঁহার নিকট নূতন ভাবের প্রত্যাশা করিও না, নূতন ভাব সৃষ্টি কবির কার্য্য নহে। কবির কার্য্য নূতন হৃদয়গ্রাহী চিত্র অঙ্কন—"Interpretation of Nature"। পুরাতন ভাব লইয়া অন্তর্নিহিত কি-জানি-কি পদার্থ মাখাইয়া তিনি অতি সুন্দর—অতি মনোহর আলেখ্য আঁকিবেন। তুমি কবির সহিত একবার তাহা তেমনি করিয়া দেখ, তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে কবির ঝঙ্কার শব্দিত হইবে। তুমি দুঃখের সময়ে—বিষাদের সময়ে একবার হৃদয় নাড়িয়া দেখিও, দেখিবে, সেই নিভৃত স্থানে কবির সেই আলেখ্য। কবির নিকট আর কি প্রার্থনা করা যায়। সুন্দর দেখিবেন, সুন্দর আঁকিবেন, ইহাই তাঁহার কার্য্য।—"মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী কবি সুন্দর দেখিয়াছেন, সুন্দর দেখাইয়াছেন। যিনি মাধবীবল্লরীকে বলিয়াছেন,—

"তদিতু ভুবনে বৈ তৎসমা চারুশীলা
কুহুক দূরিতপূর্ণে নাস্তি প্রেম্নানুমত্তা
সকলসমকপ্রাণোর্নির্বিকল্পস্ত ভম্য
বর কুসুমসুকেশি! তং হি ধন্যা ধরণ্যাম্।"

এই কথা তাঁহার পক্ষেও সর্ব্বোতোভাবে প্রযোজ্য। ধরণীতে এইরূপ স্ত্রীলোকই ধন্য।

আর তুমি হিন্দুজাতি! ঘৃণিত পদদলিত জগতের চক্ষে অসভ্য হিন্দু! অধম বঙ্গবাসী!—ধন্য তুমি! ধন্য তোমার জাতীয় মর্য্যাদা! যে জাতির মধ্যে এইরূপ স্ত্রীলোক আছেন—যে জাতির স্ত্রীলোক এই সংস্কৃতদেব-ভাষায় এই গীতি গাহিয়াছেন! সেই সভ্যতাকে ধিক্—যে সভ্যতা এই ভাবের

বিরোধী।—ধিক্ সেই স্ত্রীশিক্ষা, যে শিক্ষা এই সাত্বিক ভাব ভুলাইয়া রাজসিক ও তামসিক রূপ লাবণ্যের জন্য, ক্ষণস্থায়ী শরীরের জন্য, কেবল ব্যবস্থা করিতেছে—বেশভূষায় যত্ন বাড়াইতেছে,—হৃদয়ের পবিত্রতা ভুলাইয়া, পবিত্রতা বিনাশকরিয়াও জীবন ধারণে পরামর্শ দিতেছে! স্ত্রীশিক্ষা দিতে ইচ্ছা হয়, এই রূপে স্ত্রীশিক্ষা দাও। স্বজাতীয় মহৎ ভাবের গাত্রে আঘাত করিও না। রাজসিক তামসিক ভাব প্রবল করিয়া সাত্বিক ভাবের হতাদর করিও না।

যদি দেখিতে পাও, বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, এই সাত্বিক ভাবের পরিপোষক, এই পবিত্র রক্ষার অনুকূল, তবে ইহা বিনাশের চেষ্টা পাইয়া পাপ সঞ্চয় করিও না। সভ্য য়ুরোপ তোমায় অসভ্য বলে বলুক। সাত্বিক ভাব হারাইয়া, জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবে গৌরবান্বিত হওয়া অপেক্ষা জাতীয় বিধান পালন লক্ষ গুণে ভাল ও শ্রেয়স্কর।

উপসংহারে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে পারি, "মাধবীবল্লরী" রচয়িত্রী যদি সমস্ত জীবন ধরিয়া একটি স্ত্রীলোককেও নিজের মত শিক্ষা দিতে পারেন, যদি একটি মাত্র রমণী তাঁহার মত সাত্বিক ভাবে বিভোর হয়, তবে তিনি ধন্য। তাঁহার কবিত্ব শিক্ষা ধন্য! আজিকার দিনে এইরূপ শিক্ষার বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রী রামদয়াল মজুমদার।

বউ কথা কও।

"কে তোর মানিনী তার কিসে এত মান
রে বউ কথা কও।"

বউ কথা কও। ঐ একই কথা; প্রণয়ের এই রীতিই বটে। যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ এমনই ব্যাকুল হয় বটে। সেই মুখখানি দেখিবার জন্য, তাহার সেই সুধামাখা কথা শুনিবার জন্য, প্রাণ এমনই ছটফট করে বটে। তাহার স্মৃতিতেও যেন মনে সুখ হয়। প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে, সুখের তরঙ্গ প্রাণের ভিতর ঘাত প্রতিঘাত করিয়া, হৃদয়ের ভিতর নাচিয়া নাচিয়া, খেলা করিয়া বেড়ায়। যদি সে আমার প্রণয়ের ওজন বুঝিতে পারে, যদি তাহার প্রাণ আমার জন্য ঈষৎ পরিমাণে ও উদ্বেলিত হয়, তাহা হইলে প্রেমে বড় সুখ—সে সুখ অপেক্ষা সুখ বোধ হয় জগতে আর নাই। কিন্তু তাহার হৃদয়ে প্রেমের ছায়াও যদি না দেখিতে পাই, যদি তাহার সহিত এ হৃদয় চিরদিন চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় পৃথক হইয়া থাকে, যদি তাহার মনের গতি দিন রাতের ন্যায় একেবারে পৃথক দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইলে প্রাণে যে আগুন জ্বলে, সে আগুন চিরকাল সমভাবে এ হৃদয় দগ্ধ করিবে। সেই আজীবন হৃদয় দগ্ধকারী আগুন বোধ হয় জগতে আছে। আছে বলিয়াই ক্ষুদ্র পাখী—দিন নাই—রাত নাই,—সময় নাই—আহার নাই—বিহার নাই—তাই কেবলই সেই হৃদয়ের দুঃখের কথা জগতের কাণে বলিতেছে। ঐ শুন, ঐ তমাল কুঞ্জে বসিয়া—মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া পাখী ডাকিতেছে,—"বউ কথা কও।"

পাখীর—অভিমানিনী নায়িকা কে? তাহার এত অভিমানই বা কিসের? স্ত্রীলোকের অভিমান এইরূপই বটে। বনের পাখী—দিন রাত সাধ্য সাধনা করিতেছে, তবু মানিনীর মান ভাঙ্গিল না, তাহার গর্ব্বের একটুও হ্রাস হইল না, কি আশ্চর্য্য! পাখী প্রেমে পাগল, সেই প্রেমের জন্য জগৎ তুচ্ছ মনে করে। এই পাতার হাসি, চাঁদের চুম্বন, নদীর অস্ফুট সঙ্গীত, বায়ুর পঞ্চম রাগিনী তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই কবিতাময়ী জগৎ, সঙ্গীত-প্রাণ প্রকৃতি সতী তাহার হৃদয়ের অপার দুঃখরাশি

ভুলাইতে পারে নাই। কবিতায় মানুষ ভুলে, সুরে কোন মৃগশিশু ব্যাধের কোলে গিয়া পড়ে, পতঙ্গ অগ্নিকে আলিঙ্গন দেয়, কিন্তু আকর্ষণে পাখীর ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু হইতে সেই গভীর, বিরহটুকু দূর করিতে পারে নাই। অনন্ত কবিতাময়ী জগৎ তাহার চরণে পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহার হৃদয় ভুলাইবার জন্য স্রোতস্বতী কুল কুল রবে যে গীত গাইতেছে, তাহাতে জগতের কত প্রাণী—কত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে, কিন্তু ছোট একটা পাখী ভুলিল না। ঐ আবার সেই মর্ম্মভেদী গীতের এক অংশ—অনন্ত পূরাইয়া, অনন্ত মাতাইয়া, অনন্ত কাঁপাইয়া তাহার কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল,—"বউ কথা কও।" পাখীর হৃদয় কি সুন্দর, কি কি প্রেমপূর্ণ, কি পবিত্র! পাখীর সেই কেমন মন-ভুলান মুখ খানিতে ক্ষুদ্র হৃদয় খানি এমনই অধিকার করিয়াছে যে,—পাখী আজ আপনা বিস্মৃত, জগৎ বিস্মৃত; কবিতাময়ী রাজ্যে থাকিয়াও কবিতার সেই হৃদয় প্রফুল্লকারী সুর তুলিয়া—নীলপত্ররাজির মধ্যে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া বিরহ সঙ্গীত গাহিয়া—জগতকে শিক্ষা দিতেছে।

উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নীচে চঞ্চলা নীলমেঘ প্রতিবিম্বিত। তটিনী তর তর বেগে ছুটিতেছে। উপরে মেঘ, চন্দ্র নক্ষত্ররাজির সহিত মধুর প্রেমালিঙ্গন করিয়া, নীচের পার্থিব প্রেমকে বিদ্রুপ করিতেছে; নীচে তরঙ্গময়ী—কুমুদ কহ্লায় ও পুষ্পরাশি সুশোভিত হইয়া চন্দ্র নক্ষত্রদলকে বুকে ধরিয়া মেঘকে ঠেলিয়া দিয়া—কেমন সুন্দর প্রণয়ের চিত্র দেখাইতেছে।—আহা! কাব্য-জগতের এরূপ স্নিগ্ধ কত আলো আছে বলা যায় না। কিন্তু কবিতা আজ ক্ষুদ্র পাখীর বিরহ গীতে ভুলিয়াছে। পাখী ডাকিল, বউ কথা কও। পাখী—কালিদাসের ন্যায় জগত দেখিতে চায় না, যক্ষের ন্যায় মেঘকে আপনার মনের জিনিস খুঁজিবার জন্য দূত পাঠায় না। যে তা পাঠাইতে পারে, যে আপনার অভিমানিনীর রূপ বর্ণনা করিয়া পৃথিবী বেড়াইয়া তাহার সেই হৃদয়ের বস্তুকে খুঁজিতে বলিতে পারে, তাহার আবার বিরহ কিসের? যে রূপটি মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহার আবার বিরহ কি? সেই স্মৃতিই তাহার বিরহ দূর করিবে। কিন্তু পাখী, এমনি তন্ময় হইয়া গিয়াছে যে, সে আর কিছুই বুঝে না

—অথবা বুঝিলেও তাহার সে শক্তি নাই যে—তাহার প্রণয়িনীর রূপ বর্ণন করে। যাহার স্মৃতি এতদূর প্রবল, তাহার বিরহে দুঃখ কি? তাহার বিরহে কষ্ট কি? পাখী বিরহে উদ্ভ্রান্ত।

প্রাণের বিরহ এমনই ভয়ানক বটে। ইহাতে সকলই ভুলাইয়া রাখে। তাহার হৃদয়ে বিরহ, মুখে সেই বিরহের অনুলিপি দারুণ বিরহ-সঙ্গীতের অংশ—"বউ কথা কও।" এত কষ্ট মানুষে সহিতে পারে না; পাখী দেবতা, তাই সহিতেছে। সেই দেবতা—কেবল নিরাশ গীতি শুনাইয়া প্রাণ ধারণ করে। সেই বিরহ গীতি তাহার অন্তরের, সুতরাং স্মৃতির আর কিছুই দেখিতে দেয় না।

জগৎ, আশা ও পূরণ—এই লইয়াই চলিতেছে। যাহার আশা—সব নহে—অন্ততঃ দুই চারিটিও পূর্ণ হইয়াছে—সেই সুখী, সেইই জগৎ সুখের বলিয়া মনে করে, আশায় তাহার দারুণ পিপাসা জন্মে; কিন্তু যাহার একটি আশা ও পূর্ণ হয় নাই, জগতে সেই উন্মাদ হয়। উন্মাদ হয়—তাহার কারণ—তাহার হৃদয় মধ্যে সব ফাঁক;—আশায় ভিত্তি স্থাপনের একটুও স্থান নাই। যেমন সন্ধ্যার সময় রাজবর্ত্মে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্যাসালোক একটার পর আর একটা রহিয়াছে, তাহার পর ক্রমাগতই আলোক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে, সেইরূপ যাহার আশা পূর্ণ হয়, সে ক্রমাগতই পূরণ দেখিতে পায়, তাহার প্রাণে স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু যাহার আশা পূর্ণ হয় নাই, তাহার হৃদয়ের ভিতর কেবল শূন্য; সে যখনই চাহিয়া দেখে, তখনই দেখে, একটা মহাশূন্য তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। সেই শূন্যের ভিতরও আবার অন্ধকার। এই অন্ধকার দেখিয়াই পাখী কাঁদিয়া উঠে, বলে,—"বউ কথা কও।" মানুষ যখন তাহার হৃদয়ের এই ভাব দেখে, যখন হৃদয়ের এই মহাশূন্য, এই নিবিড় সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখিতে পায়—তখন সে তাহার প্রকৃতি হারায়, আবোল তাবোল বলে, সে উন্মাদ হয়। মানুষের মন বড় হাল্‌কা, তাই এই অন্ধকার দেখিয়া পথচ্যুত হয়। কিন্তু যাহার মন পাখীর মত, সে হৃদয়ের সেই অন্ধকার, সে মহাশূন্য দেখিয়া একবার বউ কথাকও পাখীর মত গভীর মর্ম্ম গীতি গাহিয়া থাকে।

বউ কথা কও। এই প্রাণের গীতি কাব্য যে পাঠ করিয়াছে, সেই সংসার তুচ্ছ মনে করে। এই গীতি কাব্য উচ্চশিক্ষাপ্রদ; পাখী সেই নিঃস্বার্থ মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত। গভীর বিষাদের ছায়া হৃদয়ে ধরিয়া সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্তও—কাঁদিয়া কি বিরাম আছে! যখন চন্দ্রালোক বিভাসিত রজনীতে মন্দ মন্দ মলয় হিল্লোল বহিতে থাকে, পাপিয়া যখন পক্ষ বিধূনন পূর্ব্বক সবে মাত্র সাড়া করিতেছে, গৃহস্থের নববধূর নিদ্রাভঙ্গ করিবার উপক্রম করিতেছে,—তখনও তাহার হৃদয়ে সেই বিষাদ-গীতি জাগিয়া উঠিতেছে, তখনও তাহার হৃদয়ের সেই ভয়ানক অন্ধকার, সেই মহাশূন্য ভাব যায় নাই; পাখী ডাকিয়া উঠিল,—"বউ কথা কও।" সে কথা শুনিয়া মনে হয়, যেন এত কাঁদিয়াও সে হৃদয়ের দুঃখ দূর হয় নাই।

বউ কথা কও। রমণীর প্রাণ কি কঠিন! নায়ক এত ক্লেশ স্বীকার করিতেছে;—বিরহে প্রাণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে তবুও তাহার প্রাণ কি একটুও কাতর হয় না? রমণীর প্রাণ কি কঠিন! এই কঠিন প্রাণ লইয়া কি করিয়া তবে কারবার করিব? নরম জিনিষের ভিতর এত কাঠিন্য কেন? যাহার হৃদয় কোমলতায় পূর্ণ—সে একবারও কথা কয় না কেন? রমণী জাতিও স্বভাবতই কোমল হৃদয়া। পাখীর বিরহিণীর প্রাণ কি এ উপাদানে গঠিত নহে? আমাদের বোধ হয়, আধুনিক কোন কোন বঙ্গবধূর ন্যায় পাখীর প্রণয়িনীর প্রাণও কোন কঠিন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে;—নতুবা তাহার প্রাণ কাঁদেনা কেন?

"বউ কথা কও।" পক্ষী আর কাঁদিওনা। যেখানে ক্রন্দনের গভীরতা—পবিত্রতা লোকে বুঝেনা, সেখানে কাঁদিয়া ফল কি? কাঁদিলে যাহার হৃদয় কোমলতায় পূর্ণ হয় না—তাহার জন্য আর কাঁদিও না। কিন্তু পাখী আবার ডাকিল, "বউ কথা কও।" এই বিষাদ সঙ্গীত আর কাহাকে শুনাইতে চাই না। পাঠক পাঠিকে! আজ আমরা বিদায় হই। পাখী আবার ঐ কাণের কাছে ডাকিয়া উঠিল। "বউ কথা কও।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তেগ্ বাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহ।

মহামতি নানক যখন শিখ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন শিখেরা মহাবল বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিল না। সে সময়ে রণক্ষেত্রে তাহাদের পরাক্রম পরিস্ফুট হয় নাই। অস্ত্রসঞ্চালনে তাহাদের দক্ষতা দেখা যায় নাই। অরাতির ব্যূহভেদে তাহাদের কৌশল পরিদৃষ্ট হয় নাই। সে সময়ে তাহারা সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিতেছিল। কিন্তু শেষে তাহাদের এ নিরীহভাব অপসৃত হয়। তাহারা অস্ত্র সঞ্চালনে—বিপক্ষের ব্যূহভেদে অলোকসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়া বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া উঠেন। দুইটি মনস্বী পুরুষের শিক্ষায় শিখদিগের এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়! এই দুই মহাপুরুষ পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে আপনাদের সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে প্রতাপশালী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত করিয়া তুলেন। যে সলিলরেখা সূক্ষ্ম রজত মালার ন্যায় পৃথিবীর দেহের একাংশে শোভা পাইতেছিল, তাহা এই মহাপুরুষদ্বয়ের মহামন্ত্রের গুণে প্রবল আবর্ত্তময়ে মহাতরঙ্গিনী হইয়া ভীষণ তরঙ্গ বাহুর আস্ফালনে অনন্ত জীবলোকের শক্তিকে উপহাস করিতে থাকে।

যখন সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তেগ বাহাদুর শিখদিগের গুরুর পদ গ্রহণ করেন। মোগলেরা অনেক সময়ে শিখদিগকে নিপীড়িত করিত। তেগ বাহাদুর ও এই নিপীড়ন হইতে বিমুক্ত হন নাই। শত্রুর চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া তিনি দিল্লীশ্বরের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। তেগ বাহাদুর বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে যাইবার সময় তেগবাহাদুর আপনার তরবারি স্বীয় তনয় গোবিন্দসিংহের হস্তে দিয়া কহেন,—"পুত্র, শত্রুরা আমাকে বন্দী করিয়া

দিল্লীতে লইয়া যাইতেছে। যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তুমি শোকে অধীর হইয়া কর্ত্তব্য বিমুখ হইও না। এই মৃত্যুর প্রতিশোধ ইতে তৎপর থাকিও। দেখিও, দেহ যেন শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য না হয়।" তরুণ বয়স্ক গোবিন্দসিংহ পিতার এই শেষ আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। তেগ বাহাদুরের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি উপযুক্ত পুত্রের হস্তে উপযুক্ত ভার সমর্পণ করিয়া, দিল্লীতে আনীত হইলেন।

তেগ বাহাদুর সম্রাট সকাশে উপনীত হইলে আওরঙ্গজেব উপহাস সহকারে কোন অলৌকিক কার্য্য দ্বারা আপনাদের ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। তেগ বাহাদুর গম্ভীর ভাবে—নির্ভীকচিত্তে কহিলেন,—"সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা করাই আমাদের এক মাত্র ধর্ম্ম ; তথাপি আমি একটি বিষয় একখণ্ড কাগজে লিখিয়া গলদেশে বাঁধিয়া রাখিতেছি। এই কাগজ খণ্ড গলদেশের যে স্থানে থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সেই স্থান স্পর্শ না করে।" ইহা কহিয়া তেগ বাহাদুর ধীর-ভাবে কাগজখণ্ড গলদেশে বদ্ধ করিয়া ঘাতকের দিকে মস্তক প্রসারিত করিলেন। নিমিষ মধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। নিমিষমধ্যে তাঁহার দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তক ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। শিখ গুরুর এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগ দেখিয়া দিল্লীর সম্রাট বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। ইহার পর যখন সেই কাগজখণ্ড খোলা হইল, তখন ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব গভীর বিস্ময়ে দেখিল, লেখা রহিয়াছে,—

"শির দিয়া আওর শের নাহি দিয়া।"

"মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব দিলাম না।"

১৬৭৫ অব্দে এই অলোক সাধারণ পুরুষ এই ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করেন। ইঁহার অপূর্ব্ব নির্ভীকতা, ইঁহার অপরিমেয় সাহস ও ইঁহার অসাধারণ আত্মত্যাগে শিখদিগের হৃদয়ে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এই শক্তিতে শিখদিগের মধ্যে যে সাহস ও তেজস্বিতার আবির্ভাব হয়, তাহার কখন বিলয় হয় নাই। তাহারা ক্রমে সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও কার্য্যসিদ্ধিতে অনলস হইয়া উঠে। গুরুর আত্মত্যাগে তাহারও আত্মস্বাধীনতার জন্য কিরূপ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়। এই অসাধারণ

আত্মত্যাগে ধর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরধারার এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনীর চিরকাল জনসাধারণকে উপদেশ দিবে।

যখন তেগ বাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দসিংহের বয়স পনর বৎসর। এই তরুণ বয়সেই তিনি পিতার ন্যায় কষ্ট-সহিষ্ণু, পরিশ্রমশীল, এবং কার্য্যতৎপর হইয়াছিলেন। ভোগবিলাসে তাঁহার আসক্তি ছিলনা। সৌখীনতায় তাঁহার আবেশ ছিল না। ধনসম্পত্তিতে তাঁহার দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া আপনার সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য গভীর তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বিলাসী হইলে পাছে তাঁহার মতিভ্রম জন্মে, পাছে তিনি সৌখীন হইয়া কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন হন, পাছে তাঁহার শিষ্যগণ তদীয় দৃষ্টান্তে অলস হইয়া সহপ্রাণতায় জলাঞ্জলি দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি শতদ্রুতে নিক্ষেপ করেন। একদা তাঁহার কোন ধনী শিষ্য পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের দুইগাছি স্বর্ণ-বলয় আনিয়া তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিতে দেন। গোবিন্দ স্বর্ণ-বলয় ধারণে প্রথমে অসম্মত হইলেন। শেষে শিষ্যের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অগত্যা উহা হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পরে তিনি শতদ্রুতে স্নান করিতে যাইয়া একখানি অলঙ্কার জলে ফেলিয়া দিলেন। শিষ্য গুরুর এক হস্ত আবরণ শূন্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দ কহিলেন,—"অলঙ্কার খানি জলে পড়িয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া শিষ্য একজন ডুবুরিকে কহিল, যদি এই আবরণ খানি তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। ডুবুরি সম্মত হইল। অনন্তর, উক্ত শিষ্যই কোন স্থানে অলঙ্কার খানি পড়িয়া গিয়াছে, দেখাইয়া দিবার জন্য, গুরুকে বিনয় সহকারে অনুরোধ করিল। গোবিন্দ শিষ্যের সহিত শতদ্রুতটে উপস্থিত হইলেন এবং ধীর ও গম্ভীর ভাবে অপর হস্ত হইতে আবরণ খানি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন,—"ঐ খানে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য বিস্মিত হইলেন। অনিমিষলোচনে—সবিস্ময়ে গুরুর দিকে চাহিয়া রহিল। আর তাহার

মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মবীরের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, স্বদেশীর জন্য এই নবীন বয়সে ভোগ বাসনায় অসামান্য বিতৃষ্ণা দেখিয়া, আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিলাসে জলাঞ্জলি দিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল এবং সর্ব্ব প্রকার পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় জন্য আত্মস্বাধীনতার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে দৃঢ়ব্রত হইয়া উঠিল।

গোবিন্দ সিংহ এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। তাঁহার শিক্ষায় শিখেরা কষ্ট সহিষ্ণু ও দুরূহ কার্য্যসাধনে অভ্যস্থ হইয়া উঠিল। পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক তাহাদের সমক্ষে যে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, উদ্যমশীলতা ও স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা অভীষ্টসিদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করে। গোবিন্দসিংহের শিক্ষায় শিখেরা প্রবল পরাক্রম মোগলের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হয়। তাহাদের বিজয়ী-শক্তিতে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের হৃদয়েও ভীতির আবির্ভাব হয়। গোবিন্দ যে জন্য কঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, যে জন্য সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখে উপেক্ষা করিয়া কঠোর আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন, সে সকলেই সফল হইয়াছিল। তিনি একদা অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত সম্রাট আওরঙ্গজেবকে কহিয়াছিলেন,—"তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান, আমার শিক্ষায় চটক্ শ্যেন্‌কে ভূতলে পাতিত করিবে। তেজস্বী শিখগুরুর এই তেজস্বিতাময়বাক্য বিফল হয় নাই। তাঁহার মহামন্ত্রে চটক যথার্থই শ্যেন্‌কে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে। এই মহামন্ত্রে শিখেরা বার পুরুষের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের বীরেন্দ্র সমাজের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছে। এই জন্যই রামনগর ও টানিয়াবালার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে; এবং এই জন্যই এই নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রীয় ও নির্জীব ভারতে শিখেরা আজ পর্য্যন্তও সজীব রহিয়াছে। যতদিন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই পবিত্র সুমধুর উদ্দীপন স্বদেশবৎসল কবির রসময়ী কবিতায় নিবদ্ধ রহিবে, যতদিন হিতৈষিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা পাপ ও কুপ্রবৃত্তিতে কলঙ্কিত না হইয়া আপনার মহিমায় জীবলোকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে, ততদিন তেগ্‌বাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহের নাম বিলুপ্ত হইবে না।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

ফুলের সাজি।

রাসলীলা।

(কীর্ত্তন)

মধু বৃন্দাবন পরশই শ্রীচরণ
মধুর পবন বহে মৃদু বেণু বাদন,—
মগ্ন গোপদলে স্বপ্ন সুকোমলে
গোকুল সুপ্ত বিলাসে,
চলে গোপবধূ মধুময় আশে।
যমুনা তট পরি কুঞ্জবিহারি হরি
রাজে নিরঞ্জন প্রেম মূরতি ধরি,
শুদ্ধ প্রেমময় নিত্য সুখোদয়
ভকত চিতে ভয় তামস নাশে,
সুখ সুধাকর কিরণ প্রকাশে।
মধু বংশী রব চকিতে মুগ্ধ সব
মুরলীধর বর-সুন্দর মাধব,
ফুল্ল বদন ঘন বঙ্কিম মোহন
সুর সঙ্গীত উল্লাসে,
সে রস রঙ্গে চরাচর ভাসে।

পুলকে পুলিন বন উজ্জ্বল দরশন
নীরব কোকিল শুনি' আলাপন,
ব্রজ-ললনা কুল বিরহ দুঃখাকুল
উচাটন অতি অনুসরি আসে,
নিশীথ রঞ্জন বিপিন নিবাসে।
কুসুমিত কুন্তল বেণী সচঞ্চল
চীর স্খলিত ভয় কম্পিত কুচদল,
অভিসার সজ্জিত স্বভাব সলজ্জিত
নূপুর ঝন রণ ভাষে,
সুখদ তৃষাতুর প্রেম উদাসে।

আসি মিলিল সব   কেলীবন বৈভব
রাধা হৃদয়-মণি—শোভিল মাধব,
দৃশ্য দীপ্তবর   পূর্ণ চন্দ্র কর
ঢল ঢল নীল আকাশে,
ম্লান বিম্ব সম এ রূপ পাশে।

পবন বিরত চিত   যমুনা প্রফুল্লিত
বহে উজান শ্যাম দরশন হরষিত,
মত্ত ভৃঙ্গ চয়   ঋতু ষড়োদয়
প্রেমোৎসব সব আজি সুহাসে,
প্রেম ঢালে ফুল সৌরভ শ্বাসে।

বাজে মৃদঙ্গ বীণ   বংশী রবে লীন
মত্ত ললনাকুল মধু সাগর মীন,
নাচে সুমণ্ডলে   দেববালা দলে
শিখিনী রূপ ধরি' বরি' পীতবাসে,
শ্রীনিবাস আজ রাজে শ্রীরাসে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত,—ঝামাপুকুর।

প্রেম-উপহার।

বড় সাধ ছিল মনে প্রেমময় নাথ হে!—
না ঝরিতে না শুকাতে না ছুঁইতে অলি,
নির্ম্মল শিশির সিক্ত ফুলগুলি তুলি,
মনমত হার গাঁথি' উপহার দিব হে!

না ফুটিতে কত কুঁড়ি অমনিই শুকা'ল,
কত ফুল-মধু লুটি নিল হে ভ্রমরা,
কত ফুল খেয়ে গেল নিদয় কীটেরা,
আমার মনের আশা মনেতেই রহিল!

দীন দুঃখী আমি নাথ কি দিব তোমায় হে!
আছে প্রেম—উপহার লও কৃপা ক'রে,
শুকাইবে ফুল-হার দিনকত পরে,
জীবনে মরণে নাথ এই প্রেম রবে হে?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

ভাবে ভুল।

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

কি জানি কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছি,
কি জানি কাহার কোলে শুয়ে আছি,
জগতে সকলি ভুলিয়া গিয়েছি,
আছি কি না আছি জানিনা।

নিথর বুকের নিভৃত পাশে,
কি এক মধুর সুর ভেসে আসে,
সেই সুরে কেন ঘুমপোরা প্রাণ—
উঠিল জাগিয়ে, জানিনা।

প্রাণ ভেসে চলে সুরে সুরে,
সুরে গিয়াছে জগত পূরে,
এ সুরে যে এত করুণা মাখান',—
স্বপনেও তাত জানিনা;—

মনে পড়ে শুধু এই সুর নিয়ে,
এক দিন যেন কোথায় ভাসিয়ে
গিয়াছিনু আমি—বিভোর হৃদয়ে,
সে খানের নাম জানিনা;—

আজ সেই সুর প্রাণে বাজিল,
প্রাণও অমনি জাগিয়ে উঠিল,
সুর-লহরীতে ঢেউয়ে চলিল,
কোথায় চলেছে জানিনা।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
"মহাভারত-নাট্যকাব্য" প্রণেতা।

মা।

স্নেহের পরশ লাগে সর্ব্বাঙ্গে মাতার,
বুকে ফুটে ওঠে কত অজানা কি আশা,
বলিবারে—প্রকাশের নাহি পায় ভাষা,
নীরবে আকুলে চুমে বদন তাহার!

কি দরশ-পর্শাতীত আনন্দ আত্মার
রেখেছে লুকায়ে মরি ও ক্ষুদ্র আননে,
পারে না বুঝিতে মাতা চুমি' বারবার,—
আপনারে বাঁধে চির মায়ার বন্ধনে!

ছুটি সে মধুর হাসি, কল কল বাণী
অনন্ত পথেতে যেন নিয়ে যায় ডেকে—
আত্মহারা স্নেহে ভোলা বিবশা মাতাকে,
কি করুণ মধুমাখা শোনাতে কাহিনী!

প্রেমের বিমল উৎস বহিছে ধরায়,
মাতার হৃদয়খানি তাহে ভেসে যায়!

শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

সাহিত্য সংবাদ।

সাহিত্য-মঙ্গল। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-জগতে অপরিচিত নহেন। তাঁহার সম্পাদিত "মালঞ্চ" সাময়িক পত্রে অনেকেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও রচনা চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। উপস্থিত গ্রন্থ খানিতে ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ঘনীভূত সম্বন্ধ ও তদ্‌যুক্তি অতি সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভাবিতে জানেন, ভাব হইতে জানেন; এই গ্রন্থের অনেক স্থলে তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত বিষয়ে সকল স্থলে আমরা একমত হইতে পারিলাম না।

সাতনরী। কারিকরের নাম নাই; তবে আমরা জানিয়াছি, এ কারিকরও উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সাতনরীর গঠন-প্রণালী প্রশংসনীয়। দেশী ছাঁচে বিশুদ্ধ স্বর্ণে সাতনরী নির্ম্মিত; সর্ব্বাংশে সুন্দরীগণের উপযোগী। "কুলীন পত্নী" এবং "বিবি ও বউ" নাম্নী কবিত্ব-ফুল দু'টি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী। উপন্যাস। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। অনেক দিনের পর আমরা একখানি উপন্যাস একাসনে বসিয়া গ্রন্থের আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি অবধি গ্রন্থকারের সাক্ষাতেই আদ্যোপান্ত পড়িয়া শেষ করিয়াছি। গ্রন্থের ভাষাটি বেশ প্রাঞ্জল এবং গল্পটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। চরিত্র অঙ্কনের চেষ্টা অপেক্ষা গল্পচ্ছলে একটা ঘটনা বিবৃত করা বোধ হয় রায় মহাশয়ের উদ্দেশ্য; এবং সেই জন্যই বুঝি কাব্যাংশে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং উপন্যাসের অঙ্গহানি হইয়াছে। তবে গল্পাংশে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ ক্ষমতা উপলব্ধি হয়। গ্রন্থের প্রথম অংশটা বর্ণনাধিক্য প্রযুক্ত কিছু নীরস; কিন্তু শেষ অংশ টুকু বড়ই করুণ-রসাত্মক ও মর্ম্মস্পর্শী। আমরা পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে চক্ষের জল ফেলিয়াছি। শুনিলাম, গল্পটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

রমণী। একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। ইহাতে রচয়িতার নাম নাই। রচয়িতা যিনিই হউন, তিনি একজন সুকবি ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা। ভাব ভাষা ও সৌন্দর্য্য—সকল বিষয়েই গ্রন্থকার ধন্যবাদার্হ। স্বর্গীয় সুরেন্দ্র-নাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—"মহিলা"র আদর্শে "রমণী" গঠিত।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। তিনখানি পৃথক নাটক। ভক্তি-প্রেমের লীলা, ভাবুকের খেলা, রঙ্গ-সাহিত্য ও নাট্যরঙ্গের মেলা। এ আলেখ্য যে একেবারে ধুলা মলা বর্জ্জিত, তাহাও নয়। তবে চিত্রকরের গুরু পরিশ্রম, তুলিকার মনোহর চিত্রাঙ্কন ও দেশী রঙ্গে রঙ্গ ফলাইবার দূরদর্শন—এ সকল ক্ষমতা সত্ত্বেও হঠাৎ যা' তা' দুই একটা কথা বলা ভাল দেখায় না,—উচিতও নয়। তাই আমরা এ সম্বন্ধে "নাট্য-চিত্র" নামকরণ করিয়া ধারাবাহিক রূপে একটি প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। "কর্ণধার" এ স্থানাভাব বশতঃ "অনুসন্ধান" নামক পাক্ষিক পত্রে উহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। তবে কর্ণধারের পাঠকগণ মোট কথা জানিয়া রাখুন যে, এ তিনখানি নাট্য চিত্রই দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। "বিল্বমঙ্গল" কাব্যাংশে, "পূর্ণচন্দ্র" নাট্যাংশে এবং "বিষাদ" এ দুয়ের সংমিশ্রণে সুন্দর ফুটিয়াছে। স্থানে স্থানে যে একটু আধটু সমলতা, চিত্রকরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বত্যয়, চরিত্র সৃষ্টির অঙ্গহীনতা, ভাবে ভুল, সৌন্দর্য্যে কালিমা, গল্পের শিথিল-বন্ধন প্রভৃতি দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তাহাও উক্ত "নাট্যচিত্রে" অঙ্কিত হইবে। দোষ গুণের সমষ্টি ভিন্ন কোনও পদার্থ তোমরা দেখিয়াছ কি?

ধর্ম্ম-বিজয় বা শঙ্করাচার্য্য। দৃশ্যকাব্য। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। এ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু মতামত প্রকাশ করিতে

ইচ্ছুক নহি। যেহেতু আমরাও "শঙ্কর বিজয়" নামক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের একখানি জীবন-চরিত ইতিপূর্ব্বে প্রণয়ন করিয়াছি। গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে স্বয়ং আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন এবং আমাদের বাচনিক মতামত জানিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি, সদুদ্দেশ্য ও গুরু পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পঞ্চম বেদ বা মহাভারত। নাট্যকাব্য। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুসৃত ও প্রকাশিত। আমরা এই নাট্যকাব্য এক-সেট উপহার পাইয়াছি। কিন্তু সমস্তাভাবে সব গুলি পড়িয়া উঠিতে পারি-নাই;—তজ্জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। অনুবাদকের সাধু সঙ্কল্প, উদার কল্পনা, অসীম সাহস ও তীব্র অধ্যবসায়—বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। এত অল্পবয়সে যে ইনি বাজে গল্প উপাখ্যানাদি না লিখিয়া ভগবদ্ভক্তি তত্ত্বের আলোচনা করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, তাহাতে ইঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব কে অস্বীকার করিবে? আমরা ইঁহার "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" ও "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থ দুইখানি পড়িয়া এইটুকু বুঝিয়াছি, নাটক অংশ অপেক্ষা কাব্যাংশে রচয়িতার দক্ষতা অধিক। রসবোধ ও রসবিচার করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। পরী-ক্ষিতের ধর্ম্মভাব, সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকারের ছবি দেখিবার জিনিস বটে। পক্ষান্তরে দুষ্মন্ত শকুন্তলার দাম্পত্য প্রেম, প্রণয় মাধুর্য্য, সখী-গণের স্নেহ সম্ভাষণ ও প্রেম-গীতি অতীব মনোহর। নাট্যাংশে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও চরিত্র পরিস্ফুটনে ইনি এখনও সিদ্ধহস্ত হন নাই। আর এক কথা,—সমুদ্রতুল্য বিশাল ভারত গ্রন্থ—আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি অবধি ধারাবাহিক বিষয়গুলি কোনমতেই নাট্য চিত্রে প্রতিফলিত হইতে পারে না। বোধ করি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও ইহা অবিদিত নাই। দ্বিতীয় কথা, আভিনয়িক থিয়েটারি ছন্দ ও ছাঁদ যে আগাগোড়া—প্রায় পনর আনা অংশই রাখিতে হইবে, ইহার কোন অন্যথা নাই। ইহাতে অনেক স্থলে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অপচয় হয়। তৃতীয় কথা,—ভাষার বিশুদ্ধি বিষয়ে—মূল ব্যাকরণ অলঙ্কারের প্রতি যেন একটু খর দৃষ্টি থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীত রচনায়, প্রফুল্লচন্দ্রের বাহাদুরী অধিক। ইঁহার এক একটি গান যেন এক একটি সুধার খনি। সুর লয় গুলিও অতি দক্ষতার সহিত সন্নি-বেশিত হইয়াছে। উপসংহারে আমরা প্রার্থনা করি, নবীন প্রফুল্লচন্দ্র প্রবীণ ও দীর্ঘজীবি হইয়া প্রফুল্ল-কাব্য-জগতে যশস্বী হউন এবং এই সুকঠিন সাধু উদ্যমে কৃতকার্য্য হইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করুন। তাঁহার ন্যায় বঙ্গমাতার সুসন্তানের নিকট আমরা অনেক আশা করি।

রাসলীলা। গীতিনাট্য। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু প্রণীত। নাটক-কার মনোমোহন সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। ইঁহার "রামাভিষেক," "হরিশ্চন্দ্র," "সতী," "প্রণয়পরীক্ষা" প্রভৃতি নাটক পাঠ করে নাই, বাঙ্গালাদেশে এরূপ লোক বিরল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নাটক অংশ অপেক্ষা কাব্যাংশে বসু মহাশয়ের ক্ষমতা অধিক। সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধেও আমাদের অভিমত তাই। কাব্যাংশে "রাসলীলা"র ভাব স্থানে স্থান অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। কয়েকটি প্রেমভক্তি ও আদি রসপ্রধান গান আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ভক্ত গ্রন্থকারের ভক্তিচ্ছবি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। তবে নাট্য-চিত্রে তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে না এবং একথা প্রয়োজ্যও নয়। বিশেষ নাটকোক্ত চরিত্রবৃন্দের কথোপকথন বড়ই সুদীর্ঘ ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। পড়িতে২ ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। ইহাতে অনেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। ভাষাটি আরও একটু সরল হওয়া ভাল ছিল। তাঁহর 'কালিন্দীর" চিত্র অতি সুন্দর। কিন্তু "সতী" নাটকের "শান্তে" পাগলায় আমরা এ ছবি একবার দেখিয়াছি।

ভারতে গোধন রক্ষা। তাহিরপুর কৃষিকার্য্যালয় হইতে প্রকা-শিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। আমরা এই গ্রন্থখানি অতীব যত্ন ও আন-ন্দের সহিত পড়িয়াছি; এবং পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ গ্রন্থের শেষ অংশটুকু মনোযোগের সহিত পড়িলে স্বদেশ বৎসল গ্রন্থকারের হৃদয় বেদনায় প্রাণ মিশাইতে ইচ্ছা হয়।

গো-তত্ত্ব। এখানিও উক্ত কৃষিকার্য্যালয় হইতে কৃষক শ্রেণী মধ্যে বিতরিত। গোজাতির পালন, রক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে। এখানি কৃষক শ্রেণীর বড় উপকারী।

গো-জীবন। শ্রীযুক্ত মীর মশারক হোসেন প্রণীত। হিন্দু,দেখুন! গ্রন্থকার মুসলমান হইয়াও কিরূপ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। শুধু ইহাই নয়,—ইহার জন্য গ্রন্থকার কোন কোন ক্ষুদ্রচেতা মুসলমানের নিকট লাঞ্ছিতও হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রন্থকারের মহৎ উদ্দেশ্য ও সাধু উদ্যমের প্রশংসা করিতেছি। গোজাতির উদ্ধার কল্পে যিনি যাহা করিবেন, তিনি সমাজের—দেশের—এবং পৃথিবীর একটি মহা উপকার সাধন করিয়া যাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পাহাড়েমেয়ে বা পাপীর আত্মকথা। ডিটেকটিভ পুলিশ প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পাপীর নিজমুখে

পাপের কথা। এ ছবি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—বড়ই লোমহর্ষণ পূর্ণ। গ্রন্থের ভাষা বেশ সরল। এ শ্রেণী গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

নিমাইচাঁদ। "ষ্টার" এজেন্সী হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার যিনিই হউন—তিনি একজন তোখড় লোক। ভাষার উপর তাঁহার ক্ষমতা আছে। তবে বিশেষ কোন সামাজিক-চিত্র অবলম্বন ভিন্ন রঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গকাব্য হইতে পারে না। "নিমাইচাঁদে" ঘটনার বিশেষত্ব ত বড় একটা দেখিতে পাই না। আর গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধেও ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রসিদ্ধ "হুতুমের" আদর্শে ইহা রচিত হইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠায় এক স্থানে কিছুই ত অর্থ হয় না। জানিনা, এ দোষ প্রেস্ প্রেতের—কি নক্সাকারের।

ধর্ম্মচিন্তা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত। "গুরুশিষ্য কথোপকথন" উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থকার ধর্ম্ম ও সমাজের অনেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই নবীন লেখক সাধারণের উৎসাহ পাইবার যোগ্য। ইনি ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে জানেন। গ্রন্থকারের ধর্ম্মভাব, সদুদ্দেশ্য ও চিন্তাশীলতা প্রশংসনীয়। ধর্ম্মচিন্তার ভাষাও বেশ সরল।

আগমনী—ভক্তের রোদন।

(গীতি)

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

পাষাণি, পাষাণ-সুতা! চাহিনা মা তোরে আর।
ফিরে যা এবার উমা (মম) হৃদি যে মা অন্ধকার।
কাঁদিতে জনম গেল না মুছিল অশ্রুজল
অবিরাম শোক-শেল বাজে বুকে অভাগার।
অন্ন বিনা হাহাকার প'ড়েছে মা চারিধার
তুমি ত মা অন্নপূর্ণা করিলে কি প্রতিকার;—
যায় বিশ্ব রসাতল মরে জীব অবিরল
শুন দুঃখ-কোলাহল, "আগমনী" কেন আর।
শ্মশানে শায়িত সুতে ধরে যে মা রবি-সুতে
অভয়ে! রাখ মা পদে বিপদেতে কর্ণধার।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

দ্বিতীয় বৎসর, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন [illegible]

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত সম্পাদিত।

১। পরিণাম—হরিনাম ... সম্পাদক ... ২২৫
২। বিমলা ... শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ২৩২
৩। সুবে বাঙ্গালা ... শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ২৩৯
৪। মহিলা (সমালোচনা) ... সম্পাদক ... ২৪৫
৫। মীরাবাই ... সম্পাদক ... ২৫৩
৬। প্রবাস-পর্য্যবেক্ষণ ... শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ২৫৯
৭। ফুলের সাজি (কবিতা ও গান) ... ২৬২
ভবানী-স্তব সম্পাদক ...
ফুল-নারী ... শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল
প্রেম-গীতি ... শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ
বিদায় ... শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শেষ ... সম্পাদক ...
৮। সাহিত্য-সংবাদ ... সম্পাদক ... ২৬৫

তাহিরপুর—রাজসাহীর আদর্শ-ভূম্যধিকারী
মহানুভব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়
মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে
কলিকাতা,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "কর্ণধার" কার্য্যালয় হইতে
শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সম্পাদকের নিবেদন।

দ্বিতীয় বর্ষের "কর্ণধার" সমাপ্ত হইল। যে সকল সংবাদ ও সাময়িক-পত্র-সম্পাদক কর্ণধারকে কৃপা-চক্ষে দেখিয়া আশাতীত উৎসাহিত করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। শেষ নিবেদন, এই দুই সংখ্যা সম্বন্ধে সকলে আপনাপন মতামত স্ব স্ব কাগজে প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব।

গ্রাহকবর্গের নিকট নিবেদন।

কর্ণধার যথাসাধ্য আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া বর্ষ শেষ করিলেন। দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্ত হইল—তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে। কিন্তু সাধারণের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আপাততঃ ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রেরণ না করেন। কারণ তৃতীয় বর্ষ হইতে কর্ণধার বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইবে; সুতরাং মূল্যও বৃদ্ধি করিতে হইবে। অতঃপর গ্রাহকবর্গের নিকট এক একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন যাইবে, তাহাতে নিয়মাদি সমস্তই লেখা থাকিবে। এক্ষণে কেহ যেন ইহার এক টাকা অগ্রিম মূল্য না পাঠান।

ভ্রম সংশোধন।

২৬৩ পৃষ্ঠায় " প্রেম-গীতি " লেখকের ঠিকানা " চকদিঘী " না হইয়া " শিবপুর—হুগলী " হইবে।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত,
কর্ণধার-সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

১। সংসার আশ্রম (গার্হস্থ্য উপন্যাস, মূল্য ৸৹ আনা), ২। শঙ্কর-বিজয় (ধর্ম্ম-প্রাণ নাটক,ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনী,১৲ টাকা),৩। উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিক (দৃশ্যকাব্য, ৶৹) ৪। আনন্দ-মিলন * (ভক্তি-প্রাণ নাটক), ৫। ফুল * (কবিতা ও গান), ৬। বীণা ও বাণী * (বিবিধ প্রবন্ধ), ৭। ছায়া ও কিরণ * (বিবিধ প্রবন্ধ) ; শেষোক্ত চারিখানি * তারা চিহ্নিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আছে, অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। যে কোন সদ্ব্যবসায়ী পুস্তক-বিক্রেতা বা প্রকাশককে, গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণ একেবারে বিক্রয় করিবেন মনস্থ করিয়াছেন ; যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, কর্ণধার-কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সারস্বত কুঞ্জ।

শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় প্রণীত। [illegible] মূল্য [illegible] আনা, ডাক-

কর্ণধার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বিতীয় বৎসর।

দ্বিতীয় খণ্ড,—১২৯৫-৯৬।

"তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে, পরিহর চিন্তাং নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

মোহমুদ্গর—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত সম্পাদিত।

তাহিরপুর—রাজসাহীর আদর্শ-ভূম্যধিকারী
মহানুভব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়
মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে
কলিকাতা,
১৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "কর্ণধার" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY WOOMA CHURAN CHAKERBUTTY
AT
THE HERALD PRINTING WORKS:
107, Bow-Bazar street, Calcutta.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সূচিপত্র।

	বিষয়।	লেখক।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
১।	আগমনী—ভক্তের রোদন (গান)	সম্পাদক ...	২২৪
২।	আধ্যাত্মিক কৌতুক (পদ্য)	শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়	৯৫
৩।	আমেরিকায় অবস্থান	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়...	১৩১
৪।	কর্ণধার ও আমাদের নিবেদন ...	সম্পাদক ...	১
৫।	করমেতি বাই ...	... শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব ...	৯৭
৬।	তেগ্ বাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহ ...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ...	২১৩
৭।	দাদা ও আমি (সমালোচনা) ...	সম্পাদক ...	৪১
৮।	দু' দিন ...	... শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী	১৩৬
৯।	ধর্ম্মকম্পন ...	... শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী ..	৮৩
১০।	পরিণাম—হরিনাম ...	সম্পাদক ...	২২৫
১১।	প্রবাস-পর্য্যবেক্ষণ ...	... শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	২৫৯
১২।	ফুলের সাজি—নং ১ (কবিতাগুচ্ছ)		১৬
	অঞ্চলের বাতাস ...	... শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল...	
	শৈশব-গান ...	... শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	
	অরণ্যে ...	... শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় ...	
	সুন্দর ...	... সম্পাদক ...	
	প্রেম ...	... শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ...	
১৩।	ফুলের সাজি—নং ২ (কবিতা ও গান)		৩৭
	শক্তির ধ্যান ...	... ৺ রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর	
	বিবাদ-ভঞ্জন ...	... শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়	
	প্রেম-গীতি ...	... শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ...	
	ভ্রান্ত-তারা বা খদ্যোতিকা ...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	
১৪।	ফুলের সাজি—নং ৩ (কবিতা)		৬১
	ভগ্ন-হৃদয় ...	... ৺ হেমনাথ দত্ত ...	
	নিশীথে বংশীধ্বনি ...	... শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৫।	ফুলের সাজি—নং ৪ (কবিতা ও গান)		৮৯
	সাধন-সঙ্গীত ...	... ৺ রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর	
	পাতা ...	... শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় ...	
	বিরহ-গীতি ...	... শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ...	
	সুন্দরী ...	... শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	

১৬। ফুলের সাজি—নং ৫ (কবিতা ও গান) ২১৭

রাসলীলা	...	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত ...
প্রেম-উপহার	...	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাবে ভুল	...	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মা	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

১৭। ফুলের সাজি—নং ৬ (কবিতা ও গান) ২৬২

ভবানী-স্তব	...	সম্পাদক
ফুল-নারী	...	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ...
প্রেম-গীতি	...	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ
বিদায়	...	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শেষ	...	সম্পাদক ...

১৮। বউ কথা কও	...	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৯
১৯। বিবিধ প্রসঙ্গ	...	সম্পাদক	১৪২, ১৯২
২০। বিমলা	...	শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী	২৩২
২১। মনুষ্যত্ব	...	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে ...	১১০
২২। মহিলা (সমালোচনা)	...	সম্পাদক ...	২৪৫
২৩। মাধবী-বল্লরী (সমালোচনা)	...	শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার...	১৯৩
২৪। মীরাবাই ...	...	সম্পাদক ...	২৫৩
২৫। শিশু-যোগী ...	...	শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র পাল ...	১০১
২৬। সঙ্গীত ...	...	সম্পাদক ...	৮৭
২৭। সংসার-আশ্রম (উপন্যাস)	...	সম্পাদক ৭,২৫,৪৯,৭৩,১১৯,১৪৫	
২৮। সংসার না দর্পণ ?	...	শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র সেঠ ...	১২৬
২৯। সন্তপ্তানং ত্বমসি শরণং	...	শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার	৩৪
৩০। স্বপ্নদর্শন—কলিকাতা	...	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত ...	১৩৮
৩১। সাধন ও সাধক	...	সম্পাদক	৬৫, ৯১
৩২। সাধন-সঙ্গীত ...	...	শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ...	২৩
৩৩। সাহিত্য-সংবাদ	...	সম্পাদক ৪৭, ৯৫, ২২০, ২৬৫	
৩৪। সিপাহি যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রধান সেনাপতির কার্য্য-শিথিলতা	...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ...	২০
৩৫। সুবে বাঙ্গালা ...	...	শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ ...	২৩৯

পরিণাম—হরিনাম।

মানব জীবনের গতি পরিবর্ত্তনশীল। প্রতিনিয়তই ইহা বিভিন্ন-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। জীবনের বাসনা অনন্ত—লক্ষ্যও অনন্ত। মানুষ কিছুতেই তৃপ্ত নহে। অতৃপ্তি তাহার সহচর—সদাই নূতন আকাঙ্ক্ষা মানুষকে অহরহ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া থাকে। মনোভাব প্রাতে এক-রূপ—পরক্ষণেই অন্যরূপ; মধ্যাহ্নে একরূপ—অপরাহ্নে ভিন্ন রূপ; সায়াহ্নে একরূপ—গভীর নিশিথে বিভিন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে—পরিবর্ত্তনশীল পার্থিব বিষয়ে—ইহাই মানুষের উন্নতি ও অধঃ-পতনের চরম সোপান। এই পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই এই বৈচিত্র্য-প্রাণ সংসারে মানুষ মোহিনী আশায় বুক বাঁধিয়া বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। ইহার পরিণাম, একপক্ষে উদার ও প্রশস্ত—অন্যপক্ষে ঘোর কুটীল ও বক্র; একপক্ষে সুধা—অন্যপক্ষে হলাহল; একপক্ষে স্বর্গ—অন্য-পক্ষে নরক। এই অনিবার্য্য তুমুল জীবন-সংগ্রামে যিনি জয়ী, তিনি সংযমী—সাধু—মহাজন-পদ বাচ্য; যিনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হন—জলন্ত আগুনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন,—জীবন-প্রবাহে অপদার্থ তৃণের ন্যায় ঘোর নীরয়-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে উদ্যত, তাঁহার পরিণাম অতি শোচনীয়—অতি ভয়াবহ—অতি ক্লেশকর হইয়া উঠে।

সংসারে এই শ্রেণীর লোকেরই আধিক্য। এ শ্রেণী লোকের, পরি-ণাম বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়। প্রতি মুহূর্ত্তে পদস্খলন, লক্ষ্য ভ্রষ্ট, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য, অধীরতা, আবেগ, সুখ দুঃখে উন্মত্ততা যাহাদের সহচর,—সময় ও অবস্থা বিশেষের যাহারা যন্ত্র-পুত্তলি, অনিবার্য্য ঘটনা-চক্রে যাহাদের হৃদয় নিষ্পেষিত করে, ভীষণ জীবন-তরঙ্গে যাহারা হাবুডুবু খায়, তাহাদের পক্ষে চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া—পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করা প্রশস্ত উপায়। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় সংযমী মনীষাদিগের পক্ষে এ নিয়ম নহে। আবার অবস্থাবিশেষ কাহারও পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। সতীর

সতীত্ব নাশ হইবার উপক্রম দেখিয়া, আসন্ন-মৃত্যু মুখে পতিত, দস্যুকর-কবলিত মুমূর্ষুপ্রায় ব্যক্তির দুর্দ্দশা চক্ষে দেখিলে, তখন পরিণাম চিন্তা করা—উহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমার নিজের দশা কি হইবে—এরূপ ভাবিলে চলিবে না। শুধু তাহা নহে—তখন আত্মত্যাগ না করা মহাপাপ। সহজ কথায়—পরোপকার করিবার সময়—পরের জীবণাধিক ধর্ম্ম-রত্ন রক্ষা করিবার সময়—নৈয়ায়িকের বিধান-শাস্ত্র কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এরূপ কঠিন সমস্যাস্থলে পাত্রাপাত্রের ভেদ নাই—দেশ কাল অবস্থার কোন নিয়ম নাই। যাহার যতটুকু সামর্থ্য, সে ত করিবেই; কিন্তু যাহার কিছুই সামর্থ্য নাই—সেও তাহার আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াও এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। এরূপ পরোপকারের ব্যভিচার করা মহাপাপ। এরূপ স্থলেই শাস্ত্রকারের গভীর ধর্ম্ম-তত্ত্ব উপদেশ দিতেছে,—"নোপকারাৎ পরোধর্ম্ম পাপঞ্চ পরপীড়নং।"

এখন সে কথা যাক। কথা হইতেছে—অতৃপ্তি-আকাঙ্ক্ষা—অনন্তলক্ষ্য। বস্তুতঃ, দুর্ব্বল-চিত্ত অসহিষ্ণু অতৃপ্ত মানুষ নিয়তই এই পথে অবিরাম-গতিতে ছুটিতেছে। সংসারের শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি সত্বেও, প্রতিপদে লাঞ্ছনা, তাড়না, ভৎর্সনা, অপমান, নির্য্যাতন, নৈরাশ্য, মর্ম্মপীড়া, শোক, দুঃখ প্রভৃতি অসংখ্য বিপদরাশি ফুৎকারে উড়াইয়া এই মহাপথের পথিক হইতে অভিলাষী হইতেছে। কঠোর সংসার-বন্ধন এবং সময়ের তীব্র কষাঘাতেও বিচলিত হইতেছে না। যেন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই—দুই চারি দশ দিন মাত্র একটু বিমর্ষ, একটু অবসাদগ্রস্ত, একটু উদাসীন, একটু আলস্যভাবে কালাতিপাত করিয়া আবার যে সেই! ইহার কি কোন অর্থ নাই? এ লীলা-বৈচিত্র্যের কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে।—অবশ্যই কোন অলঙ্ঘনীয় সূক্ষ্ম-সূত্রে মানব প্রবৃত্তি প্রকৃতির বিশ্বজনীন কর্ম্ম-সূত্রে বাধা;—অবশ্যই কোন অনির্ব্বচনীয় চরম-লক্ষ্যে অনন্ত কোটী মানুষের প্রাণ আকৃষ্ট। তাহা না হইলে কেন এরূপ হয়? কেন মানুষ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও সংসার-রঙ্গভূমে উৎকট বিকট বীভৎস রসের অভিনয় করে? কেন ভীষণ ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়—মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করে? কেনই বা পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত বিপদাগ্নিতে

ঝাঁপ দেয়? বিশাল বিশ্ব-সংসারে কেনই বা অবিরাম এ হলাহল-স্রোত উঠিতে থাকে? অবশ্যই ইহার কোন অতি সূক্ষ্ম—অতি সত্য—অতি গূঢ় কারণ প্রচ্ছন্নরূপে ওৎপ্রোত ভাবে সমগ্র মানব মণ্ডলীর মধ্যে সমাবিষ্ট আছে। ইহার একমাত্র অব্যর্থ অলঙ্ঘনীয় কারণ—পরিণাম—হরিনাম। মানুষের চরম লক্ষ্য—অনন্ত বিশ্বের চরম—পঞ্চভূতময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিদান—পরিণাম—হরিনাম। দেব-যোগী মহেশ্বর যে প্রেমে উন্মত্ত, ভক্ত-প্রাণ মহর্ষি নারদ যে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর, ধ্রুব প্রহ্লাদ শ্রীচৈতন্য-দেব যাহার জন্য জগতের আদর্শ ও ভক্তবৃন্দের নমস্য—ইহা সেই অমূল্য অপার্থিব ধন! সংসারে এ মহারত্ন ক্বচিৎ চকিতের ন্যায় দুই একবার মাত্র দেখা যায়—সেই জ্যোতির্ম্ময় মহোজ্জ্বল রত্নের অলৌকিক কিরণ ছায়াবাজীর মত ক্বচিৎ মোহান্ধ মানব-হৃদয়ে বিজলীর ন্যায় নিমেষ মাত্র খেলা করিয়া কোন্ অদৃশ্য—অপরিজ্ঞেয় পথে অন্তর্হিত হয়। সেই স্বর্গীয় সুধার আস্বাদ যে জীবনে একবার পাইয়াছে, সেই-ই কৃতকৃতার্থ ধন্য হইয়াছে। কিন্তু "পরিণাম—হরিনাম"—ইহা অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীব মণ্ডলীর সকলের ভাগ্যে একবার ঘটিবেই। প্রবৃত্তির পূর্ণ ধ্বংস হইয়া নিবৃত্তির শান্তি-কুটীরে মানুষ একবার উপবেশন করিবেই। তা একজন্মে হউক, দশজন্মে হউক,—আর শতজন্মেই হউক। পরিণাম—হরিনাম, ইহাই জগতের সার—ইহাই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম—ইহাই অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির অপূর্ব্ব নিয়ম। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করা যাইতেছে।

"আশা নাচায়—কাঁদায়।" বস্তুতঃ, কথাই তাই। পূর্ব্বেই আমরা এ কথার একটু আভাস দিয়াছি। অতৃপ্ত মানুষের কিছুতেই স্বস্তি নাই—সুখ নাই—শান্তি নাই। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার জয় সর্ব্বত্রই। মানুষ ইচ্ছা সত্বেও কিছুতেই তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অনিবার্য্য বাসনা-তরঙ্গের দুর্দ্দমনীয় ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ উঠিতেছে—পড়িতেছে—নামিতেছে—হা-হুতাশ-হাহাকার করিতেছে। নিত্য-নূতন আকাঙ্ক্ষা-সাগরের কুল নাই—পার নাই—শেষ নাই—সীমা নাই। আশার তৃপ্তি কোথায়? "বাসনায় জগৎ সৃজন।" তবে কি উপায়ে তুমি ইহাকে জয় করিবে? "বাসনায় মনের জনম, মন সৃষ্টি করে এ শরীর।" তবে কেন, কেন বৃথা

আশা-মরীচিকায় উন্মত্ত হও—অধীর হও—নিজ হৃদ্-পিণ্ড বিসর্জ্জন দিবার পথ পরিষ্কার কর? কেন এ উত্থান-পতন উন্নতি-অধঃপতনশীল কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিশাল কার্য্যক্ষেত্রের কুটীল পথের পথিক হও? ইহার চরম পাইবে না—এরূপে এ অনন্ত লক্ষ্যের শীর্ষ স্থান দেখিতে পাইবে না। কবে দেখিয়াছ, মানুষ আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট—আপন সুখে তৃপ্ত! কবে নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছ যে, চিরজীবনের মত আরাম পাইলাম! আজ মনে হইতেছে, অতুল ধনেশ্বর হইলে সুখী হইব—আর আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কিন্তু যাই সে আশা পূর্ণ হইল, অমনি নূতন বাসনার সৃষ্টি হইল। এ স্রোতের বিরাম নাই—এ বাসনা-সূত্রের অন্ত নাই। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইলেও আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই—অন্ত নাই। প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই ইহার অমোঘ ঔষধ। পরিণাম—হরিনাম, জীবমাত্রেরই লক্ষ্য; অতএব দিন থাকিতে সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। একজন্ম, দশজন্ম, শতজন্ম, সহস্রজন্ম, লক্ষজন্ম, কোটীজন্ম—অনন্ত কোটী জন্ম—অনন্ত লক্ষ্য-কোটী যোনি পরিভ্রমণ করিয়া নিজ কর্ম্মানুসারে শোক-দুঃখ-জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল—আধি-ব্যাধি-শোক-তাপপূর্ণ এ ছার মাটীর সংসারে জন্ম পরিগ্রহ কর, হাস, কাঁদ, বাঁচ, মর—আবার ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া আবির্ভূত হও! মরি মরি, কি রহস্যই রে! কি খেলাই রে! কি লীলা-বৈচিত্র্যই রে! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ মহা-আগুন জ্বলিতেছে—ধু-ধু-ধু। ইহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—শেষ নাই—অন্ত নাই। পৃথিবীর মহাপ্রলয়েও এ অনন্তব্যাপী মহা আগুন নির্ব্বাণ হইবে না। মানুষ এ বাসনা-আগুনে পুড়িতেছে, মরিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, বাঁচিতেছে—আবার প্রকৃতিস্থ হইতেছে। তথাপিও বলিতেছি, পরিণাম—হরিনাম।

অনন্ত জীব-জন্তু পরিপূরিত, চেতন অচেতন উদ্ভিদ্ পদার্থত্রয় সংযুক্ত এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবিরাম ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমরাও ঘুরিতেছি। কিন্তু এ ঘূর্ণন কি আমরা বুঝিয়াও অনুভব করিতেছি? বর্ত্তুলাকার আধারে—গম্বুজের মধ্যে কোন জন্তুকে নিক্ষেপ কর, সে অবিশ্রান্তই ঘুরিতে থাকিবে—সে স্থান হইতে মুক্ত হইতে সে প্রাণপণে চেষ্টা

করিবে, কিন্তু যখন তাহার কণ্ঠাগত প্রাণ হইবে, তখন সে মধ্যস্থলের কোন অবলম্বনীয় পদার্থ ধরিবে বা সেই কেন্দ্রস্থলেই বিশ্রাম করিবে। আমরা সেইরূপ এই "গোলকধাঁধাঁয়" পড়িয়া অবিরাম ঘুরিতেছি—কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এই খানে ভক্ত-কবি কবিরের একটি দোঁহা মনে পড়িল,—

"চল্‌তি চক্কি সবকোই দেখে, কীল দেখে না কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়্‌কে রহে, সাবেৎ রহা হেয়্‌ওই॥"

বস্তুতঃ, জগৎরূপ বৃহৎ জাঁতাকলের অবিরাম ঘূর্ণনে জীবদল প্রতিনিয়তই নিষ্পেষিত হইতেছে; কিন্তু যে বুদ্ধিমান মাঝের সেই খোঁটা ধরিয়া থাকে, সেই-ই আস্ত থাকিয়া যায়—তাহার বিনাশ নাই। ঘূর্ণীয়মান জাঁতাকলের মধ্যে দ্বিদলের দশা কে না দেখিয়াছে? কিন্তু কেই বা পূর্ব্ব হইতে সেই খোঁটা ধরিতে প্রয়াসী হয়? প্রবৃত্তির ধ্বংস করিয়া নিবৃত্তির চরম মার্গে কে উঠিতে চেষ্টা করে? কিন্তু তুমি কর্ম্মবাদী, তুমি বৈজ্ঞানিক, তুমি নিরীশ্বরবাদী—তুমি যতই কেন আস্ফালন করনা, যতই কেন নিজ তেজ, বিদ্যা, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও না,—"পরিণাম—হরিনাম" তোমার ঘটিবেই। অবিনশ্বর আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও একদিন না একদিন তোমায় এই মহাপথের পথিক করিবেই। বিশাল কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হও—জগতের হিত সাধন করিতে নিষেধ করি না, বাসনা-আগুনে অতৃপ্তি-ইন্ধন প্রদান কর—উন্নতি অধঃপতন দুই-ই হইবে,—কিন্তু যতই করনা কেন, যতই সিদ্ধ-কাম হও না কেন,—যতই নব-নব আশা হৃদয়ে পোষণ কর না কেন, পরিণাম—হরিনাম তোমার হইবেই। আবার বলি, আজ যাহা মনে করিলে—অমুক বস্তু পাইলেই সুখী হইব, কিন্তু কাল যাই তাহা সফল হইল, অমনি নূতন বাসনার সৃষ্টি হইল। তাহাতে সফল হইলে—আবার কোন অভিনব বাসনার তরঙ্গ উঠিল। এইরূপ করিতে করিতে যতই তুমি অগ্রসর হইবে, অনন্ত আশা-পথ ততই পিছাইয়া পড়িবে। দু' দিনের জন্য সুখী হইতে পার সত্য; দু' দিনের জন্য তৃপ্তিলাভ করিতে পার স্বীকার করি, কিন্তু তোমার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটিবে না। এ জীবনে যাহা না হইল, অন্তিম কালে—মৃত্যু সময়েও—যদি আস্তিক হও—পরকাল ভাবিলে, মনকে

প্রবোধ দিলে—পরজন্মে পাইব;—আশায় বুক বাঁধিয়া প্রমত্ত মনকে সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইল? জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আবার যে-সেই। বলিহারি, কি রহস্যই রে! এইরূপে উপর্য্যুপরি পুনঃ পুনঃ ঘা খাইয়া—মনে মনে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বৈরাগ্য লাভ অপেক্ষা—"পরিণাম—হরিনাম" অবলম্বন অপেক্ষা—দিন থাকিতে কি এ মহাপ্রেমে দীক্ষিত হওয়া বিধেয় নয়? নিস্তব্ধ, শান্ত, ধীর, গভীর প্রশান্ত, চঞ্চলতা শূন্য, আবেগ সন্দিগ্ধতা শূন্য, সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষা শূন্য প্রশস্ত হৃদয়-ক্ষেত্রেই ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়।

আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা উপস্থিত প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা অবশ্য সকলেই সুখের আশায় যা' কিছু সকলই করিতেছি। তা ইন্দ্রিয়গত হউক—আর মানসগতই হউক। সকল কার্য্যেরই মূলে এই সুখ সন্নিবিষ্ট। এ সুখ আমাদের কতদূর আয়ত্বাধীন হয়, তাহাই দেখান যাইতেছে।

তোমার মস্তকোপরি ঐ সুনীল, স্বচ্ছ, মনোহর আকাশ রহিয়াছে; ঠিক সম্মুখে চাহিয়া দেখ, যেন একটু নিম্ন বোধ হইবে; তাহার কিঞ্চিদ্দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, আরও নিম্ন বোধ হইবে; আবার তাহার আরও দূরে চাহিয়া দেখ, দেখিবে—বিপরীত আকাশের সীমা ভূমিদেশ স্পর্শ করিয়াছে। এখন তুমি তাহাকে ধরিতে যাও, আকাশ তোমাকে ধরা দিবে না; তুমি যেমন একটু একটু যাইতেছ, আকাশও তেমনি একটু একটু উঠিতেছে। এইরূপে একেবারে তোমার লক্ষ্যস্থানে গিয়া দেখ, আবার ঠিক পূর্ব্বমত আকাশের উচ্চতা বোধ হইবে। তথা হইতে চাহিয়া দেখ, বোধ হইবে, অগ্রে যে স্থানে দাঁড়াইয়া আকাশের গভীর উচ্চতা দেখিয়াছিলে, এখন আবার তাহাই ভূমিতল স্পর্শ করিয়াছে। আকাঙ্ক্ষার তীব্র উত্তেজনায় আশাও আমাদিগকে এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া থাকে। কিন্তু সকলই ফক্কিকার—সকলই মিথ্যা—সকলই ছায়াবাজী! তাই বলিতেছিলাম, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—অনন্ত বাসনা—অনন্ত আশার চরম লক্ষ্য—"পরিণাম—হরিনাম"—ভগবানের প্রতি আত্মজীবন বিসর্জ্জন! নিবৃত্তির এই চরম সোপানই ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ। এই মহাপথের পথিক হইতে পারিলেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ— এই

চতুর্বর্গের ফল লাভ করা যায়। শাক্ত বৈষ্ণব, শৈব গাণপত্য, হিন্দু অহিন্দু—যে যাহার উপাস্য-দেবতার চরণে আপনার, মন প্রাণ সমস্তই অর্পণ করিবে। ইহা ভিন্ন ত মানুষের আর জুড়াইবার স্থান নাই! সকল গণ্ডগোল, বিবাদ বিসম্বাদ, সুখ দুঃখ—এইখানে সমান হয়। এ মহামিলনে মহাপ্রাণী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। শত্রু মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞান মন হইতে বিদূরিত হয়। সমগ্র জীব-জগতকে আলিঙ্গন দিতে প্রাণ সদাই ব্যগ্র হইয়া থাকে। প্রেমিক-হৃদয় ভিন্ন এ ভাব অন্যে বুঝিতে অক্ষম; ভক্ত-সাধক ভিন্ন এ ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। অনন্ত লক্ষ্য পথের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই তোমার পূর্ণ হউক—অপার বাসনা-স্রোত সমস্তই তোমার স্বকীয়াত্বাধীন হউক, যাহা চাহিবে—তাহাই পাইবে—সব স্বীকার করিলাম। কিন্তু তার পর,—শেষ—পরিণাম? ধরিলাম, যখন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তোমার সমস্তই মিটিল—সকল রকম ভোগ-সুখে তুমি কৃতকৃতার্থ হইলে, অন্তরেও সুখ পাইলে—কিন্তু তাহা ক্ষণিক থাকিয়া আবার যখন হৃদয় মরুভূমি সমান নীরস, কঠিন, পাষাণ তুল্য হইয়া—অশ্রুবিন্দু ফেলিবারও সামর্থ্য থাকিবে না, দুর্ব্বহ-জীবন আত্মগ্লানি রূপ বিষম বাড়বাগ্নিতে মিশিয়া ধু ধু রবে যখন জ্বলিতে থাকিবে, তখন?—তখন "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা" ভিন্ন আর উপায় কি?—তখন ত এই "পরিণাম—হরিনাম" অবলম্বন করিতে হইবেই। অতএব অল্পে অল্পে আকাঙ্ক্ষা দমন, ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহার, সংস্কার, আশা ও লোভের সীমাবর্ত্তী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করাই যুক্তিসঙ্গত। সকলকেই সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিতে পরামর্শ দিতেছি না,—তবে প্রবৃত্তির দমনে নিবৃত্তির অভ্যুদয়—অতি অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য! পরিণাম—হরিনাম অতি অপূর্ব্ব সত্য কথা!

বিমলা।

(শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দুর্গেশনন্দিনী" গ্রন্থের "বিমলা" চরিত্রের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।)

সম্মুখে বিরাট এক বাজার মিলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাতে বিকি কিনী করিতেছে। বিক্রেয় সামগ্রী অনন্ত; স্তরে স্তরে—স্তূপে স্তূপে ক্রেতৃবর্গের মন ভুলাইবার জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। কোন ক্রেতা তাহার মনোমোহন রূপে আকৃষ্ট হইয়া তদ্দিকে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু সামগ্রীর মহার্ঘতা দেখিয়া নযযৌ নতস্থৌ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—হাটের অন্যান্য সামগ্রী তাহার কেনা হইতেছে না। মস্তকোপরি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড স্বীয় খর করমালায় ক্রেতৃবর্গের শরীর মর্ম্মাক্ত করিয়া দিতেছে—তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। ক্রেতৃবর্গ চলিতেছে—ফিরিতেছে—জিনিসের দর দস্তর করিতেছে—কেহ বা কিনিতেছে—কেহ বা ক্ষুণ্ণমনে এক দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে ফিরিয়া যাইতেছে। সে জ্বালাময় মরীচিমালা কিন্তু অপ্রতিহত প্রভাবেই সমভাবে মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে। সেই অসংখ্য জনতা মহা কোলাহল করিয়া, সেই অদ্ভুত রঙ্গভূমিতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি করিতেছে।

এই কোলাহলময় তপনতাপ-সংযুক্ত অদ্ভুত আপণের অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড মহীরুহের মূলদেশে একটি রমণী বসিয়া সেই ক্রয় বিক্রয়ের অদ্ভুত ক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে রমণীর কপোলদেশে এখনও স্বেদজল পরিলক্ষিত হয়—এখনও তাঁহার সেই আপণ-পর্য্যটন-ক্লান্তি শরীরে পরিদৃষ্ট হয়। রমণী মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সুস্থচিত্তে সমুখীন পণ্য-বিথকাগুলির খেলা পরিদর্শন করিতেছেন—আর এক একবার টিপ্পি টিপি হাসিয়া স্বীয় পর্য্যটন কথার সঙ্গে তথাকার ক্রেতৃবর্গের দুইটি লোকের খেলা তুলনা করিতেছেন। মুখে বড়ই আনন্দের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সহসা কে একজন বলশালী বিকট পুরুষ আসিয়া রমণীকে ছায়াচ্যুত করিয়া দূরে লইয়া গেল। রমণী মহা বিপদগ্রস্ত হইলেন। ভয়ে—আতঙ্কে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। এ অবস্থায় পতিত হইয়াও যাইবার কালে রমণী

সেই বৃক্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণকাল পরে কৌশলক্রমে রমণী সেই বিকট পুরুষের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আবার সেই স্থানে সমাগত হইলেন। কিন্তু এখন আর তথায় সে বৃক্ষও নাই—সে ছায়াও নাই—কে সেই মহাবৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এবার তাঁহার মুখশ্রী বড়ই গম্ভীর—বড়ই বিষণ্ণ। সুন্দরী বিপদজালে জড়িত; তথাপি তিনি সেই বিথিকার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াই রহিয়াছেন। হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য সে মুখখানিতে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল—সে গম্ভীর বিষণ্ণ শ্রী আনন্দময়ী হইয়া উঠিল। তারপর আর সে রমণীকে দেখা গেল না।

পাঠক, এ রমণী কে, চিনিয়াছ? ইনিই আমাদের বিমলা। বিমলা কখন যে প্রেমের হাটে বিকি কিনা করিল, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই—গ্রন্থকার তাহা বলিয়া দিয়াছেন। বীরেন্দ্রসিংহের সহিত বিমলার, প্রণয়ের সঞ্চার, বিকাশ ও সম্ভোগ আমরা বিমলার প্রৌঢ়-চরিত্র দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি সত্য, কিন্তু গ্রন্থকার তাহা আমাদিগকে মুখে বলা ভিন্ন বিশদ করিয়া দেখান নাই। আমরা যখন বিমলাকে দেখিলাম, তখন বিমলা ঐ ছায়ায় বসিয়া প্রেমের হাটের ক্রীড়াই দেখিতেছিলেন। তখন বিমলার বিকিকিনী সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিমলা সেই রঙ্গভূমির অভিনেতৃবর্গের অদ্ভুত ক্রীড়ার সহিত স্বীয় গত জীবনের ক্রীড়ার তুলনা করিয়া হাসিতেছেন ও ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিতেছেন। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেম-লীলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিমলা সজীবিতা। দেখিতে দেখিতে কতলু খাঁ বিমলাকে বীরেন্দ্রসিংহের ছায়া হইতে অপহরণ করিয়া লইল। বিমলা কিছুকালের জন্য আবার নিজের কার্য্যে ব্রতী রহিলেন। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য। ক্ষণপরেই বিমলা আবার সেই অদ্ভুত রঙ্গভূমিতে সমাগত হইয়া জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন বটে—কিন্তু এবার সেরূপ আনন্দ নাই—সেরূপ হাসি নাই। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পরিণয়ে বিমলার মুখে বিজলী অবশ্যই খেলিয়াছিল—কিন্তু সে সব কথা আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। বিমলা সেই আনন্দের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল।

বিমলার এই স্বার্থ-বিমুক্তি ভাব বড়ই সুন্দর, তিলোত্তমা ও আয়েষা

আপনার লইয়া ব্যস্ত। বিমলার এরূপ চিত্ত অবস্থাধীন—স্বাভাবিক বটে। একে তরঙ্গময় যৌবন কাল অন্তর্হিত প্রায় হইয়াছে, তার পর আবার বীরেন্দ্রের সহিত তাঁহার অদ্ভুত সম্বন্ধ। বিমলা বিধবার ন্যায় পরের সুখ লইয়াই ত থাকিবে। কিন্তু বিধবারও অন্তর প্রদেশে—লুক্কায়িত ভাবে স্বীয় সুখের আকাঙ্ক্ষা-স্রোত তীব্রভাবে প্রবাহিত থাকে। বিমলার তাহাও ছিল না। সে স্রোত অনেক দিন স্থির হইয়া গিয়াছিল। তখন বিমলার মনে কেবল তুলনা ভিন্ন আর কিছুই উঠিত না।

বিমলার বচন চাতুরী, বিমলার অন্তর্দর্শী বুদ্ধি, বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিমলার রসালাপ পটুতা, বিমলার সাহস—"দুর্গেশনন্দিনী"র পাঠকবৃন্দের নিকট বড়ই মনোহর অনুভব হয়। এ সকলের বিশেষ বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিমলার রসিকতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। বিমলা পৌরস্ত্রী—কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাকে কিছু নীচ জাতীয় রসিকতায় ব্যাপৃত দেখা গিয়াছে,—এটি কি তবে বিমলার কলঙ্ক? বিমলা যেরূপ ভাবে দিগ্‌গজ-হরণ করিয়া লইয়াছিল, যেরূপ ভাবে সেখ রহিমের সহিত রসালাপ করিয়াছিল, যেরূপ ভাবে কুতলুখাঁকে বিমোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা অন্তঃপুরচারিণীর পক্ষে একটু অসম্ভব নয় কি? এই দুইটি কথার উত্তরে আমাদিগকে দুই এক কথা বলিতে হইবে।

প্রথমে, বিমলার পূর্ব্ব-পরিচয় স্মরণ করিতে হইবে। বিমলার পূর্ব্ব-পরিচয়ে আমরা বিমলাকে বড় একটা শাসন-সীমারক্ষিতা দেখিতে পাই না। বিমলা বাল্যকালে কতকটা স্বাধীন ভাবেই ছিল। এই স্বাধীনতার ফলে তাহার বুদ্ধি, সাহস, চতুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। রসালাপে ক্ষমতা সকলের থাকে না। ইহা খানিকটা লোকের মৌলিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। বিমলারও এই মৌলিক ক্ষমতাটি স্বাধীনভাবে যথেচ্ছস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যৌবন কালের কথা জানি না—প্রৌঢ় বয়সে বিমলা এই ক্ষমতাটি দ্বারা দুই একবার স্বার্থসাধনও করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ব্যবহারে আমরা বড় কুরুচি দেখিতে পাই। বিমলা তাহা দেখিতে পাইত না। তাহার কারণ অনেক। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, ইন্দ্রিয়ের উপর যাহাদের মনের আধিপত্য জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণী শক্তি তাঁহাদের নিকট বড়ই আমোদের ও ক্রীড়ার জিনিস। আমরা যেমন ইহাতে ভয় পাই, তাহারা ইহাতে সেরূপ ভয় পায় না—বরং আবশ্যক হইলে তোমার আমার মত লোককে ভয় দেখাইয়া ইহারা সেই শক্তির ক্ষমতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। এরূপ অবস্থায় যখন সে শক্তি দ্বারা অন্যকে অভিভূত করিতে পারিলে, কোন কর্ত্তব্য কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহারা সে শক্তি প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে কেন? বিমলা নিজ রূপ বা রসিকতার ক্ষমতা জানিতেন—কিন্তু এ ক্ষমতা তাঁহার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত না। আবশ্যক মত তিনিই বরং ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইতেন। এরূপ লোকের সুরুচিই বা কি—আর কুরুচিই বা কি? এই সব কার্য্যে বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিত ইহাঁদের অন্তরের মিলন থাকিত না।

বিমলার চরিত্রের অন্যান্য দোষ গুণ অতি সহজেই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়—কিন্তু বিমলার দারুণ প্রতিহিংসা বৃত্তি ও সেই বৃত্তি চরিতার্থ জন্য তাহার অমানুষিক কার্য্য বঙ্গীয় পাঠিকার নিকট কিছু পুরুষভাব-ব্যঞ্জক—অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এরূপ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যে রমণীতে দেখা যায় না—তাহা নহে—এতদধিক বৈর নির্য্যাতন স্পৃহা আমরা রমণীতে দেখিতে পাইতেছি। রমণীতেই বরং এই বৃত্তির বিশেষ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। কাল সর্পিনীর ন্যায় রমণীই এ বৃত্তি হৃদয়ে পুষিয়া রাখে। এ সবই সত্য; কিন্তু বিমলার ন্যায় রমণীর পক্ষে যেন ইহা একটু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। সেই হাসিভরা হৃদয়ে, সেই আনন্দময়ী প্রকৃতিতে, সেই পর-মিলন-লোলুপ অন্তরে এ বিষের স্থান কিছু কষ্ট-কল্পনা বোধ হইতে পারে। এতৎ-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে হয়।

প্রথমতঃ,—বিমলা রাজপুত-রমণী। বঙ্গনারীর সাহস ও বীর্য্যের সহিত তাহার তুলনা হয় না। রাজপুতের যুদ্ধে বা শত্রু কর্ত্তৃক মৃত্যু সচরাচরই ঘটিয়া থাকে; এবং প্রভূত তেজোসম্পন্ন রাজপুতগণ সররাচরই এই বৈর-নির্য্যাতনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকেন। পুরুষের কার্য্য অনেক সময়েই রমণীতেও অনুসরণ করে। বিমলা যে বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী হইয়া বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহ হইবে— ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

দ্বিতীয়তঃ,—স্বামী বা কোন প্রিয়জন অন্য কর্ত্তৃক অবৈধ উপায়ে অন্যায়রূপে হত হইলে, সেই হত্যাকারীর উপরে বিজাতীয় ক্রোধ বাঙ্গালি রমণীরও হয়।—তবে বিমলার ন্যায় অবস্থাপন্না চরিত্রশালিনী বঙ্গ রমণীকে সে ক্রোধ মনোমধ্যেই বিলীন করিতে হয়। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিয়া ক্রোধের শান্তি দুর্ব্বলা রমণীর সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু বিমলা সেরূপ রমণী নহেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধি ও সাহস তাঁহাকে সকল সময়েই অপূর্ব্ব বলে বলবতী করিয়া রাখিত। বিমলা, নিজের বুদ্ধি ও সাহস জানিতেন। তাই তাঁহার ক্রোধ প্রতিজিঘাংসা আনয়ন করিল ও কার্য্য-ক্ষেত্রে অসম সাহসিক কার্য্যে সফলকাম করিল। বিমলা চিত্রের এ ভাগও অস্বাভাবিক নহে। তবে, আমাদের বঙ্গ রমণীদের নিকট যেন কেমন কেমন বোধ হইলেও হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ,—সতীত্ব রক্ষার জন্য বঙ্গ রমণীও এরূপ অবস্থায় অস্ত্র ধারণ করিত—কিন্তু তাহা নিজের বিরুদ্ধে। রাজপুত-রমণী তাহা পরের বিরুদ্ধে ধরিয়াছেন। ইহা জাতিগত সাহসাদির পার্থক্যগত বিভিন্ন কার্য্য মাত্র।

পাঠক! আর একটি দৃশ্য অবলোকন করুন:—

বিলাসভবন বিলাসদ্রব্যে বিভূষিত করিয়া বিলাসিনী মণ্ডলে বসিয়া ভোগ-পরায়ণ নবাব কতলু খাঁ। চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রিয় মুগ্ধকর ভোগেচ্ছা প্ররোচক সামগ্রী সম্ভার সুসজ্জিত রহিয়াছে। নবাবকে বেষ্টন করিয়া রমণীগণ কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ কটাক্ষ করিতেছে, কেহ প্রেমালাপ করিতেছে। সে অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী দিব্যাভরণ-শোভিতা বিলাসিনী বৃন্দের অনির্ব্বচনীয়া বিলাস চেষ্টা পাঠককে একবার কল্পনা-চক্ষে দেখিতে হইবে। যদি পাঠকগণ সুরুচির অনুরোধে বারবনিতাবৃন্দের ভোগ বিলাস প্রত্যক্ষ করিতে অস্বীকৃত হয়েন, অন্ততঃ তাঁহাদিগকে এই রূপসী মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী কুসুমবনে 'স্থল-পদ্মিনীবৎ' বিলাসিনীর বিলাস-রঙ্গ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ঐ দেখুন—পাঠক, রমণীর কিবা সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গী, কিবা রসাল-মধুরালাপ, কিবা মনোমোহন কটাক্ষ-ক্ষেপণ! রমণীর সম্মুখে সুবর্ণ সুরার পাত্র। সুন্দরী, কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেম-পাত্রে সুরা ঢালিতেছে। নবাব সম্মোহন ভাবে অধীর হইয়া ঢল ঢল ভাবে সেই

লাবণ্যময়ীর প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কতলু খাঁ আজি সে রূপ পানে উন্মত্ত। একে বিবিধ বিলাসদ্রব্যে মন বিমোহিত, তাহাতে আবার সম্মোহবর্দ্ধিনী তীব্র সুরার মাদকতা—কতলু খাঁ আজি অধীর ও প্রমত্ত। ও আবার কি? পাঠক, শুনিতেছ, বিলাসিনী কি দিব্যস্বরে কি বিলাস ব্যঞ্জক মধুর ধ্বনি করিল? এ যে রূপের সুরা—সুরার সুরা হইতেও অধিকতর মাদক। শুনিয়া কতলু খাঁ ভাবিল, আহা, মরি মরি! কি সঙ্গীত রে!—সঙ্গীতের কি অপূর্ব্ব বাসনা উদ্বেলক স্বর-কম্পন, সুর, তান, লয় রে! কতলুখাঁর এখন আর কিছুই ত জীবিত নাই—কতলুখাঁর জীবিত আছে—কেবল, ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা ও 'তৎসাধনার্থ ভোগী ইন্দ্রিয়-নিচয়। সঙ্গীতের তালে তালে সুন্দরী নাচিতেছে। কিবা সুন্দর নৃত্য-ভঙ্গী—কিবা সুন্দর অঙ্গ গঠন—কতলুখাঁর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। সে অগ্নিতে ইন্ধন-স্বরূপ ঘন ঘন সুরা সেবনে কতলু খাঁ ধৈর্য্য শূন্য হইয়া সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন—বিহ্বলচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কোথা প্রিয়তমে!"

পাঠক, এই রমণীকে কি চিনিতে পারিয়াছ? ওকি, সুন্দরীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? চাহিয়া চাহিয়া কি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছ? মনে করিতেছ যেন ইহাকে আর কোথাও দেখিয়াছ—না? আচ্ছা, আমিই বলিয়া দিতেছি। আর একবার চাহিয়া দেখ দেখি—ইহাকে বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গের মধ্যে দেখিয়াছ কি না? চাহিয়া দেখ দেখি, সুন্দরী বিমলা কি না? ওকি! একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলে যে—দারুণ ঘৃণায় রোষে তোমার শরীর অস্থির হইয়া পড়িল যে! তুমি বুঝি মনে করিতেছ, বিমলা বড়ই বিশ্বাসঘাতিনী—ঘোর কুলটা? তুমি বুঝি বিমলার এ কার্য্য দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির চরিত্রে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছ? আমাদিগের অনুরোধে তাহা করিও না। তোমাকে আমরা বলিয়া রাখি—বিমলা কুলটা নহে—বিশ্বাসঘাতিনী নহে,—বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের পরমা সাধ্বী সহধর্ম্মিনী। এখন আর একবার চাহিয়া দেখ দেখি—এ রহস্য কিছু উদ্ঘাটন করিতে পার কি না? মুগ্ধের ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ কেন? কিছু বুঝিতে পারিতেছ না? আচ্ছা, আমরা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। ঐ যে

বিমলার মনোমোহন বিলাস চেষ্টা, উহার মধ্যেই বিমলার আন্তরিক নির্লিপ্ত ভাব কিছু দেখিতে পাও কি? ঐ যে বিমলার বিলাস-হাসি, উহার মধ্যেই বিমলার অন্য রকমের কোন আনন্দ-চিহ্ন দেখিতে পাও কি? ঐ যে বিমলার বিলাস-কটাক্ষ—উহার মধ্যে বিমলার তীব্র-দৃষ্টি দেখিতে পাও কি? আর—আর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি, বিমলার সুন্দর বসন মধ্যে কিছু খুঁজিয়া পাও কি না? পাইলে না—আমরা বলিয়া দিতেছি—উহার মধ্যে শাণিত ছুরিকা লুক্কায়িত আছে। যেমন মনোমোহন লাবণ্য-লীলার মধ্যে দারুণ প্রতিজিঘাংসা—তেমনি নেত্র-মুগ্ধকর পরিচ্ছদ মধ্যে শাণিত ছুরিকা!—অবিশ্বাস করিলে? অসম্ভব মনে করিলে? আচ্ছা, কিছু কাল অপেক্ষা কর—আর অপেক্ষা করিতে হইল না—ঐ দেখ, ঐ বিমলা আলিঙ্গনচ্ছলে কতলুখাঁর হৃদয়ে দারুণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল—ঐ শুন, কতলু খাঁ বিকট চীৎকার করিয়া অচেতন প্রায় হইয়া পড়িল—ঐ দেখ, বক্ষদেশ হইতে রুধির ধারা উৎসের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল! আর ঐ দেখ, দুঃশাসন বক্ষ-বহির্গত রক্ত-পিপাসু ভীমসেনের ন্যায় তৎপ্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সানন্দচিত্তে বিমলা ছুটিয়া পলাইয়া গেল। এখন বিশ্বাস হইল—এখন বিমলাকে বুঝিলে? এখন সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা চেষ্টা দেখিলে? এখন রাজপুত রমণীর বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা দেখিলে? এখন রমণীর লাবণ্যলীলার ক্ষমতা দেখিলে? এখন প্রমীলার সেই কথা মনে হয় কি?—

"বাম আঁখি—মরে নর তাহারি কারণে।" ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বিমলার এই অদ্ভুত অভিনয় বিমলা চরিত্রের অন্যতর পৃষ্ঠ। ইহাতে তাহার বুদ্ধি, তাহার সাহস, তাহার সতীত্ব তেজঃ, তাহার রাজপুত রমণীত্ব অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে!

আমরা প্রথমে বিমলার এই অদ্ভুত জীবন লীলা ক্ষেত্রের স্বার্থ বিমুক্ত পরম পুলকিত পরিদর্শকের ভাব প্রদর্শন করিয়াছি—এখন অবস্থাধীন তাহার ঘোর স্বার্থযুক্ত পরম কঠিন হিংসা জ্বালা-জর্জ্জরিত অভিনেতৃ ভাব প্রদর্শন করিয়া বিমলা-চরিত্র শেষ করিলাম। পাঠক, এখন একবার একাধারে এই দুইয়ের কল্পনা করিয়া সমগ্র বিমলাকে প্রত্যক্ষ করুন।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

সুবে বাঙ্গালা।

(মূল আইন আকবরী হইতে সঙ্কলিত।)

চট্টগ্রাম হইতে গাড়ি (তেলিয়া গাড়ি) পর্য্যন্ত সুবে বাঙ্গালার দৈর্ঘ্য চারিশত ক্রোশ। পর্ব্বতের উত্তর (কুচবিহার) হইতে সরকার মন্দারণের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত চিতুয়া পর্য্যন্ত ইহার পরিসর দুইশত ক্রোশ। উড়িষ্যার কিয়দংশ সুবে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত হইলে পর ইহার দৈর্ঘ্য ৪৩ ক্রোশ ও পরিসর ২৩ ক্রোশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সুবে বাঙ্গালা, বিহারের সীমার সংলগ্ন, পর্ব্বতের দক্ষিণ, ও সমুদ্রের উত্তর। ভাটী নামক প্রদেশ সুবে বাঙ্গালার একাংশ; ঈশা খাঁ (মছনদে আলি) নামক আফগান সেই প্রদেশে আধিপত্য করিয়া থাকেন। এই প্রদেশের আম্রবৃক্ষগুলি মানবের ন্যায় (৩॥০ হস্ত.) উচ্চ, ইহার পরিমাণ অল্প ও ফল সুমিষ্ট।

ভাটী প্রদেশের সহিত সংলগ্ন একটি বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা)। তাহার অধিপতির নাম বিজয় মাণিক্য। যিনি রাজা হন তিনিই তাহার নামের অন্তে "মাণিক" উপাধি ধারণ করেন। সেই রাজ্যের আমির ওমরাহগণ "নারায়ণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রাজার দুইলক্ষ পদাতি, একসহস্র হস্তী আছে। কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।

সুবে বাঙ্গালার উত্তরদিকে কুঁচদিগের রাজ্য, এই রাজ্যের সরদারের একসহস্র অশ্ব ও একলক্ষ পদাতি সৈন্য আছে। ইহার পার্শ্বে আর একটি রাজ্য আছে, তাহাকে সেই দেশ বাসীগণ কামরূপ বা কাঁউর বলে। কাঁউরও কামতা কুঁচ রাজ্যের অন্তর্গত। কামরূপের রমণিগণ বিশেষ সুন্দরী ও যাদুকরী। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তাহারা যাদু বিদ্যার সাহায্যে মনুষ্য দ্বারা স্তম্ভ, প্রাচীর ও ছাদ প্রস্তুত করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে। যে সকল পুরুষকে ইহারা যাদু বিদ্যা দ্বারা বশীভূত করে, একবৎসর অন্তে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।* বার্ষিক চণ্ডী পূজার সময় স্ত্রীলোকেরা সেই সকল পুরুষদিগকে

* ভেড়া বানাইবার গল্পটী দীল্লির রাজদরবারেও উপস্থিত হইয়াছিল।

ছাড়িয়া দিয়া অসি হস্তে বহির্গত হইয়া দেবীর আরাধনা করে; এবং তৎকালে সেই পুরুষের আয়ু বৃদ্ধি ও যাহাতে আজীবন তাহার প্রেম পাশে বদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই প্রার্থনা করে। এই সকল স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে তাহারা জানিতে পারে যে, সেই গর্ভে কি সন্তান হইবে। পুত্র হইলে গর্ভেই তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। সেই রাজ্যে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা ভগ্ন করিলেই সুমিষ্ট জল বহির্গত হয়, তদ্দ্বারা তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে। একপ্রকার আম্র আছে, তাহা আঙ্গুরের ন্যায় সুমিষ্ট ও ক্ষুদ্র। একপ্রকার ফুল আছে, তাহা বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া লইলেও দুইমাস পর্য্যন্ত সজীব থাকে, তাহার বর্ণ বিবর্ণ হয় না ও সুঘ্রাণের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। সেই পুষ্প দ্বারা মালা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসামের রাজার অধিকার কামরূপের সহিত সংলগ্ন। এই রাজা বিশেষ পরাক্রম শালী। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার অনেক জীবিত দাস দাসীকে তাঁহার সহিত দগ্ধ করা হইয়া থাকে।

আসামের সীমান্ত প্রদেশ তিব্বতের সহিত সংলগ্ন, তিব্বতের অপর প্রান্তে মহাচীন, ইহার প্রধান নগর খানবালিগ (পিকিন), সমুদ্র হইতে ৪ দিবসের পথ দূরে অবস্থিত। রাজধানী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একটি খণিত খাল আছে, তাহার উভয় পার্শ্ব প্রস্তরের পোস্তা দ্বারা সুদৃঢ় করা হইয়াছে। রুমদেশীয় সুবিখ্যাত পাত্‌সা সেকেন্দর (আলেকজেণ্ডার) এই খাল দিয়া গমন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব দক্ষিণ পার্শ্বে আরখাং * নামে একটি বিস্তৃত রাজ্য আছে। চাটগাঁ বন্দর ইহার অন্তর্গত। এই রাজ্যে বহুসংখ্যক হস্তী আছে, অশ্ব খর্ব্বকায় বিশেষত বিরল। উষ্ট্র দুষ্প্রাপ্য। গো মহিষ নাই, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী আর একটি জন্তু আছে, তাহার বর্ণ প্রধানত মেঘের ন্যায়, কিন্তু অন্যান্য বর্ণও দৃষ্ট হয়। এই জন্তুর দুগ্ধ ইহারা পান করে। (বলা বাহুল্য যে ইহা গবয়।)† এই দেশ বাসীদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের সহিত হিন্দু কিম্বা মুসলমান কাহারও ঐক্য নাই। ইহারা জমজা ভগি-

* রাক্ষিয়াং। ইংরাজী আরাকান।

† বাঙ্গালার পূর্ব্ব সিকিম পর্ব্বতে এই জন্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নীকেও বিবাহ করিয়া থাকে। বৈবাহিক-কার্য্যে ইহাদের বড় একটা বাদ বিচার নাই। ইহারা পুরোহিতদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রাজ্যের অধিবাসীগণ শ্যামবর্ণ, পুরুষদিগের দাড়ি গোঁপ নাই।

এই রাজ্যের অপর পার্শ্বে পিগু; প্রাচীন লেখকগণ ইহাকে চীন বলিয়াছেন। এই রাজ্যের হস্তী ও পদাতী সৈন্য অপরিমেয়। তন্মধ্যে শ্বেত হস্তীও আছে। এই রাজ্যের নিকট কয়েকটি মণি রত্নের খনি আছে। ইহার জন্য, পিগু, রাক্ষিয়াং ও মগ রাজনবর্গ সর্ব্বদা কলহ করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন নাম বঙ্গ। এই দেশের জনৈক প্রাচীন নরপতি দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ২০ গজ পরিসর ও ১০ গজ উচ্চ একটি পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই রাজমার্গ সাধারণতঃ "আল" নামে পরিচিত হইয়াছিল। বঙ্গ শব্দের সহিত আল শব্দ সংযুক্ত হইয়া এইদেশ "বাঙ্গাল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রাজ্যে গ্রীষ্ম ও শীত ঋতু অল্পকাল স্থায়ী। প্রায় ৬ মাস ক্রমে বৃষ্টি হইয়া থাকে। ভূমি প্রায় জলে প্লাবিত হয়, প্রায় সর্ব্বদাই ঝড় তুফান হইয়া থাকে। সময় সময় তদ্বারা অনেক প্রাণী বিনষ্ট হয়। সুবে বাঙ্গালায় অনেক নদ নদী আছে, তাহার প্রধান নদী গঙ্গা। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন, "মহাদেবের জটা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।" উত্তরাখণ্ডের পর্ব্বত হইতে এই নদী বহির্গত হইয়া, দিল্লী, আগরা, আলাহাবাদ ও বিহার প্রভৃতি সুবা সমূহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। তদনন্তর সরকার বার বকাবাদের অন্তর্গত কাজিহাটা গ্রামের সম্মুখে গঙ্গা দুই প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। এক প্রবাহ পদ্মাবতী নাম ধারণ পূর্ব্বক চট্টল গ্রামের অনতিদূরে সাগর সঙ্গম লাভ করিয়াছে। অপর শাখা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া তিন প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে, যথা সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা। যে স্থানে এই নদী তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, হিন্দুগণ তাহাকে ত্রিবেণী বলে, তাঁহাদের মতে ইহা অতি পবিত্র স্থান। সপ্তগ্রামের নিম্নে গঙ্গা সহস্র ধারায় বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবাহিত হইতেছে। যমুনা ও সরস্বতী পুনর্ব্বার গঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। হিন্দু পণ্ডিতগণ গঙ্গার অনেক মহিমা কীর্ত্তন

করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহার জল পবিত্র, সুমিষ্ট ও তরল এবং জগ-তের নদ নদী সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুগণ ইহাঁকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। সুবে বাঙ্গালায় দ্বিতীয় নদী ব্রহ্মপুত্র; ইহা কুঁচদিগের রাজ্যের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া সরকার বাজুহা প্লাবিত করিয়া সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই বাঙ্গালা দেশে প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার ধান্য জন্মে। প্রত্যেক জাতীয় ধান্য হইতে এক একটি করিয়া গ্রহণ করিলে একটি প্রকাণ্ড গোলা পরিপূর্ণ হইতে পারে। কোন কোন স্থানে এক একটি ক্ষেত্র বৎসরে তিনবার কর্ষিত হয়। এবং তিনবারই শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপাদিকা শক্তি এত প্রবল যে, এক একটি ধান্য হইতে দুই তিন সের ধান্য জন্মিয়া থাকে। বর্ষার জল যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ধান্যের গাছগুলি ততই বড় হইতে থাকে। কৃষিকার্য্যে পারগ কৃষকগণ এক দিনে ৬০ হস্ত পরিমিত ভূমি কর্ষণ করিতে পারে।

বাঙ্গালার প্রজাগণ বিশেষ আজ্ঞাবহ। বৎসরে আটমাস তাহারা রাজস্ব পরিশোধ করে। এবং ভূস্বামীর কাছারীতে উপস্থিত হইয়া তাহারা কিস্তী অনুসারে মোহর ও টাকা দ্বারা তাহাদের দেয় কর পম্প পরিশোধ করিয়া থাকে। এই সুবার প্রজাগণের সহিত শস্য বিভাগ করিয়া লইতে হয় না। শস্য সর্ব্বদাই সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কর-সংগ্রহকারক রাজ-কর্ম্মচারিগণ প্রজার সহিত একমত হইয়া ভূমির রাজস্ব স্থির করিয়া থাকেন। প্রজাগণের সদ্ব্যবহার দর্শন করিয়া সম্রাট এই সকল প্রাচীন প্রথা স্থির রাখিয়া-ছেন। এই সুবার অধিবাসীগণের প্রধান খাদ্য চাউল ও মৎস্য। গম ও যব অল্প পরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্যান্য খাদ্য তাহাদের বিশেষ প্রীতিকর নহে। অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রায় উলঙ্গ, কেবল কটিদেশের নিম্নে একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম অধিকাংশই স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হয়।

তাহাদের গৃহাদি অধিকাংশই বংশ নির্ম্মিত, এইরূপ কোন কোন গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে পাঁচ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই সকল গৃহ অনেক দিন স্থায়ী হয়। বাঙ্গালিগণ সাধারণত জলপথে গমনাগমন

করিয়া থাকে। বিশেষত বর্ষাকালে নৌকার চলাচল বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালি-গণ যুদ্ধ মাল বোঝাই এবং গমনাগমনের সুবিধার জন্য বিবিধ প্রকার নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিশেষ তাহাদের সমরতরীগুলি এরূপ কৌশলের সহিত নির্ম্মিত যে, কোন স্থান কিম্বা দুর্গ আক্রমণ কালে সেই সকল নৌকা যতই তীরের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে থাকে এবং এজন্য তাহারা অনায়াসে শত্রু দুর্গ অধিকার করিতে পারে।*

সুবে বাঙ্গালার জমিদারগণ কায়স্থ। তাঁহারা সম্রাটের সাহায্যার্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ২৩৩৩০ অশ্বারোহি, ৮০১১৫৮ পদাতি, ১৭০টি হস্তী, ৪২৬০টি কামান ৪৪০০ নৌকা উপস্থিত করিতে সক্ষম।

বাঙ্গালিগণ স্থলপথে সুখাসনে আরোহণ করিয়া গমনাগমন করে। কেহ কেহ হস্তী আরোহণ করিতে আনন্দানুভব করিয়া থাকে। বাঙ্গালা অশ্ব অতি বিরল। এই সুবায় পাটের দ্বারা একপ্রকার গাল্লিচা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই সকল এত সুন্দর যে, রেসম নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বাঙ্গালিগণ অত্যন্ত লবণ-প্রিয়। এই সুবার কোন কোন অংশে লব নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। সুবে বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট ফল ও ফুলের অভাব নাই। বাঙ্গালিগণ পান চর্ব্বণ দ্বারা ওষ্ঠাধর সুরঞ্জিত করিয়া থাকে। হীরা, পান্না মুক্তা ও অন্যান্য প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর সকল অন্যান্য দেশ হইতে বাঙ্গালার সামুদ্রিক বন্দর সমূহে আমদানী হইয়া থাকে।

এই সুবায় খুজা প্রস্তুত হয়।† খুজাদিগের তিনটি শ্রেণী আছে, যথা ছান্দলী, বাদামি ও কাফুরী। শিশুকালে যাহাদের উপস্থ ও মুষ্ক আমূ ছেদিত হয়, তাহাদিগকে ছান্দলী বা আতলছী বলে। যাহাদের কেবল মা

*যে জাতি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র পথে বিচরণ করিয়া ভারত সাগরের প্লবম দ্বীপপুঞ্জ সমূহে আপনাদের কীর্ত্তি-পতাকা সংরোপিত করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দ পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নিবাসী, কবিচূড়ামনি কালিদাস যাহাদিগকে জলযুদ্ধে সুপারগ বলি বর্ণন করিয়াছেন,—তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ও আকবরের সচিব আবুল ফাজেল যাহাদিগকে জ যুদ্ধে বিশারদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা কি সেই বাঙ্গালি? হায় বিধাতঃ, কে পাপে আমরা সিংহের ঔরসে শৃগাল হইয়াছি? সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

† সরকার সমূহের বর্ণনা করিতে যাইয়া আবুল ফজল রঙ্গপুর ও শ্রীহট্ট প্রদেশে খু প্রস্তুত হওয়ার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

মুষ্ক ছেদিত হয়, তাহাদিগকে বাদামী বলে। শৈশবে যাহাদের উপস্থ ছেদন করিয়া স্ত্রীসংসর্গের ক্ষমতা বিনষ্ট করা হয়, তাহাদিগকে কাকুরী বলে।

আবুল ফজল রাজা তুডলমল্লের কৃত ওয়াশীল জমা অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, সুবে বাঙ্গালা ঊনবিংশ সরকারে বিভক্ত। প্রত্যেক সরকার বহুসংখ্যক পরগণা, মহল, জোয়ার ও ডিহি প্রভৃতি দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। আইন আকবরীর এই অংশ একটি উপাদেয় ভূগোল বিবরণ। আরব্য পারস্য ভাষা তত্ত্ববিৎ মৃত মহাত্মা ব্লকমান সাহেব যৎকালে তাঁহার "বাঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আইন আকবরীর অনুবাদের* দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য ইহা রক্ষা করিলাম।—Nor shall I minutely describe the Sirkars and the mahalls or detail the historical and geographical changes that took place; these I must necessarily reserve for the second volume of my Ain translation."

আমাদের দুর্ভাগ্যবশত ব্লকমান অকালে পরলোকে গমন করিয়াছেন, এজন্য তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহাহউক, আমরা বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন দ্বারা সরকার ও মহাল প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি; ভরসা করি, মৎপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে পাঠকগণ ইহা দেখিতে পাইবেন।

আইন আকবরীতে সুবে বাঙ্গালায় ঊনবিংশ সরকারের বর্ণনা আছে। কিন্তু আমরা তৎ সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে বাঙ্গালার একটি উৎকৃষ্ট অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে স্থানে বসিয়া বাঙ্গালার আদি মহাকবি মুকুন্দরাম স্বীয় চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে রামেশ্বরের শিব-সংকীর্ত্তন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান উক্ত ঊনবিংশ সরকারের অন্তর্গত নহে। তৎপর অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে, আধুনিক মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ তৎকালে উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরী গ্রন্থে উড়িষ্যা ৫ সরকারে বিভক্ত হইয়াছে। যথা, ১। সরকার জলেশ্বর, ২। ভদ্রক, ৩। সরকার কটক,

৪। সরকার কলিঙ্গ দণ্ডপাট, ৫। সরকার রাজমহেন্দ্রী। এতন্মধ্যে সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত অধিকাংশ স্থান সুবর্ণরেখা নদীর বাম তীরে অবস্থিত—সুতরাং বাঙ্গালার অন্তর্গত। এজন্য আমরা বাঙ্গালার ইতিহাসে সরকার জলেশ্বর উড়িষ্যা হইতেই "খারিজ" দিয়া বাঙ্গালায় "দাখিল" লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

মহিলা।*

"মহিলা"র কবি সুরেন্দ্রনাথ এখন ইহ-জগতে নাই। তিনি অসময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যায়—তাহার স্মৃতি থাকে—কিছুদিনের মধ্যে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ গিয়াছেন—তাঁহার স্মৃতি আছে,—কিন্তু এ স্মৃতি শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—"মহিলা" তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন প্রকৃত কবিত্ব ও কাব্যের আদর থাকিবে,—"মহিলা" রচয়িতার নাম ততদিন শিক্ষিত বঙ্গবাসীর স্মৃতি-পট হইতে কিছুতেই অপসৃত হইবে না—এ কথা আমরা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। বড়ই দুঃখের বিষয়, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ জীবিতাবস্থায় তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভ দেখিয়া যাইতে অবসর পান নাই—দুরন্ত ব্যাধি তাঁহাকে অকালে কালের কোলে শায়িত করিয়াছে। ততোধিক দুঃখের বিষয়,

* (প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ) ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১ম অংশের মূল্য বার আনা ও ২য় অংশের মূল্য এক টাকা চারি আনা। ১২৮৭—৮৯ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থকারের জন্ম ১২৪৪ বঙ্গাব্দ—মৃত্যু ১২৮৫ বঙ্গাব্দ—জীবনকাল ৪০।১।৯ বর্ষ। গ্রন্থখানি বহুদিন হইল সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু সময়াভাবে আমরা এতদিন পালন করিয়া উঠিতে পারি নাই; তজ্জন্য প্রকাশক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা করিতেছি। কর্ণধার-সম্পাদক।

বঙ্গ সাহিত্যের এই প্রখর পর্য্যালোচনার দিনে—এই গভীর সুমস্যা-পূর্ণ সন্ধিস্থলে—"মহিলা" বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট বিশেষরূপে পরিচিত নহে। সাধারণ জন-সমাজে ইহার সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ হওয়া দূরে থাক—অদ্যাবধি অনেক বঙ্গ-সাহিত্য-সেবক ও সূক্ষ্মদর্শী-সমালোচক দিগের চক্ষুও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। এরূপ গ্রন্থ-বিড়ম্বন ও সমালোচন-বিভ্রাট কেবল এ দেশেই শোভা পায়!

একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্যাবধি একখানিও প্রকৃত মহাকাব্য রচিত হয় নাই। মাইকেলের "মেঘনাদ" বা হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" মহাকাব্য নহে। খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্যের কিছু উচ্চে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারত ছাড়া মূল সংস্কৃত সাহিত্যেই ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়—তা' বাঙ্গালা সাহিত্য ত দূরের কথা। গীতিকাব্যে যাঁহারা সিদ্ধহস্ত, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিহারিলাল আর আমাদের "মহিলা"র কবি সুরেন্দ্রনাথ উল্লেখ-যোগ্য। কবি গিরিশচন্দ্রেরও দুই একটি গানে ও এক আধ খানি দৃশ্যকাব্যে এ ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তবে ভাবগত ও সৌন্দর্য্যগত কবিত্বের লক্ষণ দেখিতে গেলে, এক বঙ্কিমচন্দ্রকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। বি গদ্য সাহিত্যের সহিত আমাদের এ আলোচ্য প্রবন্ধের বিশেষ সংস্রব নাই তুলনায় সমালোচনা করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—সুতরাং তাহার অব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে "মহিলা" এক খানি প্রথম শ্রেণীর গী কাব্য। ভাব, ভাষা, সৌন্দর্য্য, আখ্যায়িকা—সকল বিষয়েই এ কথা প্রযুজ্য "সারদা-মঙ্গল" এর কবি বিহারিলাল ও "মহিলা"র কবি সুরেন্দ্রনাথ বোধ হয়, এক টোলের ছাত্র। সারদামঙ্গলে সেই একটি কেমন অর্দ্ধ স্বপ্ন অর্দ্ধ জাগরণ—অর্দ্ধ তন্দ্রা—অর্দ্ধ আবেগ—অর্দ্ধ নীরব—অর্দ্ধ সুমৃদু গ ঝিম্ ঝিম্ ভাব বিদ্যমান—আর এই মহিলায়ও সেই মধুর কড়ি-কো সুরের পূর্ণ বিকাশ। মহিলায় গানে প্রাণ কখন আনন্দে নাচিয়া দুঃখে অবসাদগ্রস্ত ও ম্রিয়মাণ হয়,—কখন বা কবির মনোমুগ্ধকর তেজ

বর্ণনায় প্রাণ উর্ধাও হইয়া অনন্ত-লক্ষ্য-পথে ছুটিতে থাকে। মহিলার প্রথম অংশ—বিশেষতঃ অবতরণিকায়—সাক্ষাৎ করুণাধার সাকার-প্রতিমা জননীর স্বর্গীয় স্নেহ, প্রেম ও প্রীতির কথা তন্ময় ভাবে ভাবিতে পারিলে বোধ হয়, যেন প্রাণ এ ছার মাটীর সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! এইরূপ তন্ময় ভাবে বিভোর করাইত কবিত্ব—এই ত কাব্য! কবি যথার্থই প্রাণের আবেগে গাহিয়াছেন,—"গাব গীত খুলি হৃদি দ্বার, মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।" এ গীত তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

রসবোধ ও রস-বিচার করা বড় কঠিন। মহিলার কবির সে ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তবে সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, উদ্দীপন-রসে হেম নবীন যেমন সিদ্ধহস্ত, মহিলার কবি তেমন নহেন। স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, সখ্য, প্রীতি, করুণ প্রভৃতি কমনীয় ভাবেই কোমল-প্রাণ মহিলার উৎপত্তি, স্থিতি, উপসংহার। কবিত্ব—কবির স্বকীয় আয়ত্বাধীন। ইচ্ছা করিলেই কবি ইহাকে যন্ত্র-পুত্তলের মত ফিরাইতে, ঘুরাইতে, নাচাইতে, চালাইতে পারেন। "গৃহ দেখে বুঝা যায় গৃহস্থ কেমন।" মহিলার কবিরই এ কথা; সুতরাং আমরা গৃহ দেখে গৃহস্থ বুঝিতেছি।

আদিরসের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য "মহিলা"র স্তরে স্তরে ওৎপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট। মহিলার পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে ভাব-মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ বিদ্যমান। তবে বেশী ভাবিতে গিয়া—ততোধিক পাঠককে ভাবাইতে গিয়া দুই এক স্থান অতি দুর্ব্বোধ্য ও কষ্ট-কল্পনা হইয়াছে—নীরস শব্দগুলি ভাবের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। কবিত্ব ও ভাবের সৌন্দর্য্য তুলনায় মহিলার ভাষা প্রাঞ্জল ও বেগবতী নহে—ইহাতে কোন কোন স্থানে ভাবের বড়ই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তবে এ ত্রুটী গুলি সমস্তই গ্রন্থকারের উপর চাপাইলে বড় অবিচার করা হয়। কারণ, আমরা ভূমিকা পাঠে অবগত হইলাম, গ্রন্থকার একবার মাত্র যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—এমন কি পুনর্দৃষ্টি করিতেও অবসর পান নাই, তাহাই যথাযথ ভাবে অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি যে * এইরূপ তারা চিহ্ন দিয়া টীকায় ভাব পরিষ্কার করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, নির্ম্মম কাল তাঁহাকে সে অবসর টুকুও প্রদান করে

নাই। এই সকল প্রতিবন্ধক নিবন্ধন সমস্ত ত্রুটী গুলি গ্রন্থকারের স্কন্ধে চাপাইলে তাঁহার প্রতি বড়ই অবিচার করা হয়। তবে এ স্থলে "মহিলা"র একটি বিশেষ দোষের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এ মহাত্রুটী কিছুতেই খণ্ডন করিবার নহে। সে ত্রুটী—সম্প্রদায়গত—সমাজ-গত লক্ষ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পক্ষপাতী বা অনুরাগী বলিয়া সুরেন্দ্র-নাথকে অপরাধী করিতেছি না, হিন্দুর অনুকূলে ধ্বজা উড়ান নাই—বা সংস্কারকদলের অগ্রণী হইয়াছেন বলিয়াও একথা বলিতেছি না,—আমরা বলি, কবির এ সকল ছোট খাট বিষয়ে লক্ষ্য করিবার আবশ্যক কি? ক্ষুদ্রত্বের দাস—কিন্তু-তাইত-কি-করি-ভাব লঘুচিত্ত অনুদার ব্যক্তিরই একচেটিয়া—মৌরশি পাট্টা! কবির এ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি কেন? 'মহিলা'র প্রথম অংশ পড়িয়া—জননীর স্বর্গীয় প্রেম-পীযূষের আস্বাদ পাইয়া, দেবতা-জ্ঞানে স্বর্গীয় গ্রন্থ-কারের চরণে যেমন মস্তক অবনত করিয়াছি, ইহার দ্বিতীয় অংশ—বিশেষতঃ জায়ারশেষ ভাগটা পড়িয়া তেমনই মর্ম্মাহত ও দুঃখিত হইয়াছি। সংস্কারক ও বাক্য-বীরের জ্বালায় আমরা ঘরে বাহিরে জ্বালাতন ও অস্থির হইতেছি, আর কেন, কাব্যেও কি তাহাই দেখিব রে! গভীর মর্ম্মস্পর্শী উদাত্তভাবপূর্ণ দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় দেখিতে দেখিতে সংএর ভাঁড়ামী দেখিতে আমরা বড়ই নারাজ; যে গ্রন্থকার আবার ইচ্ছা করিয়া এ সকল দেখাইতে আসেন, তাঁহার উপর আমরা ততোধিক নারাজ। বস্তুতঃ, ইহাতে কবিত্বের বড় অমর্য্যাদা হয়—প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও ভাবের অপচয় ঘটে। "মহিলা"র অনেক গুণ—অনেক প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই, আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত এত গুলি কথা বলিলাম। ভরসা করি, ইহার অন্য সংস্করণে—যদি কেহ ইহার সম্পাদন কার্য্য সমাধান করেন, তিনি বিবেচনা করিয়া এ গুলি বাদ দিবেন।

মহিলায় আদিরসের আধিক্য বা চরমসীমা দেখিয়া কেহ কেহ একটু আধটু ভ্রূকুটী করিয়াছেন—সমালোচকও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ইঙ্গিতে দুই এক কথা বলিতে ত্রুটী করেন নাই। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তির কথাটা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—"মাতৃস্তুতি" শীর্ষক শেষ কবিতাটির একস্থলে—"কাল পেয়ে তবু, তব গর্ভ পরিহরি, যৌবন রতন তব হরি" এই যে "যৌবন

রতন তব হরি" এই কথাটা অনেকের চক্ষে কেমন ধাঁধা লাগিয়াছে। এইরূপ স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি ঘোর আপত্তি আছে। কিন্তু ইহার উত্তরে আমরা বলি, ভাই সমালোচক ও পাঠক! হঠাৎ এত চটিও না। আরও একটু অন্তর্দৃষ্টি কর—সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখ, "যৌবন রতন তব হরি" কথাটা প্রযুজ্য কি না? তুমি বলিবে, "পরমারাধ্য জননীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে আর কি ভাব ও ভাষা মিলিল না?" আমরা বলি, মিলুক না মিলুক—এ কথায় কোন দোষ হয় নাই বরং "মহিলা" রচয়িতার সম্যক গৌরব রাখিয়াছে। তোমার আমার মত লোকের মনে এ 'কিন্তু' ভাব ও এ 'খট্‌কা' উদয় হওয়া বিচিত্র নয় বটে, কিন্তু "মহিলা" রচয়িতার ন্যায় হৃদয়বান্ উদার সাধক-কবির নিকট এ ভাব ভ্রমক্রমেও 'কু' ভাবে উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, নারী জাতি তাঁহার উপলক্ষ মাত্র; তিনি এই জননী ও জায়ার মধ্য দিয়া জগজ্জননী আনন্দময়ীর ভুবন-মোহিনী রূপ দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়া-ছেন। প্রকৃত সাহিত্য ও ধর্ম্মালোচনায় খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। হৃদয়বান্ সাহিত্য-সেবকই একথা বেশ জানেন। ধর্ম্ম ও সাহিত্য জিনিসটা কি, ইতিপূর্ব্বে "কর্ণধার ও আমাদের নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে এ কথা আমরা মোটামুটি এক রকম বলিয়াছি। "মহিলা" রচয়িতাকে সেই শ্রেণীর অন্ত-র্বিষ্ট বলা যাইতে পারে। আমরা কয়েক স্থান হইতে একটু আধটু উদ্ধৃত করিয়া এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছি:—

"যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি আননে তোমার
বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন!—
যুক্ত বাক্য যোগাতে না শক্তি রসনার,
হৃদে ক্ষোভ,—মূকের স্বপন!
মনের মতন কায়!—
কেমন বা মন তায়!!
কি গ্রন্থ নরের জ্ঞান হেতু!
স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধানে কি শোভন সেতু!"

কি গভীর মর্ম্মস্পর্শী কবিত্ব! অন্য স্থলে * * * * *

"সমুদয় নারী জাতি নায়িকা আমার।
* * * স্মরি চির উপকার, দিব গীত উপহার,
সুধিবারে ধার মমতার,
মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার।"

হায়, কবিবর! তোমার সকল সাধ মিটিল না, মাতা ও জায়া লিখিয়াই তুমি ইহসংসার পরিত্যাগ করিলে! ভগ্নী ও নন্দিনী তোমার জীবন জল-বুদ্বুদে মিশিয়া গেল—আমরাও সে মহারত্ন লাভে বঞ্চিত হইলাম। পাঠক, আর এক স্থান দেখ :—

"বিষয়-মদিরা পানে মত্ত চিত যার,
তারে কি পারিব বুঝাইতে?—
ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার
নর হৃদি বেদনা বারিতে;
তার মনে আছে স্থির, কাম-পিপাসার নীর,
নারীর কি প্রয়োজন আর!—
ভোগের পদার্থ নারী গরিমা কি তার!"
"হে বর্ব্বর নর! গতি কি হ'তো তোমার,
বিহনে অঙ্গনা অবতার!
* * * দয়া ধর্ম্ম শিখাইয়া, কোমল করিয়া হিয়া,
কে করিত সভ্যতা স্থাপনা;—
কে পূরাতো স্বর্গ-চ্যুত আত্মার কামনা!"

কি প্রেমিক-হৃদয়!—কি প্রশস্ত অন্তঃকরণ!—কি গভীর কল্পনা!—কি অপূর্ব্ব সত্য!—কি উদাত্ত-ভক্তি-প্রেম!

আর এক স্থানে—

"হে জননী কর পুনঃ বালক আমায়।"

কি মধুর প্রার্থনা—কি সুন্দর আব্দার! পাঠক, আর একটি স্বাভাবিক চিত্র প্রত্যক্ষ কর;—মা ও ছেলে দুইজনে বসিয়া কত খেলা খেলিতেছে। স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেব-শিশু মায়ের অঞ্চল ও কুন্তল ধরিয়া টানিতেছে, মারিতেছে—তাঁহাকে দীক্ষ করিতেছে, জননী "বেদনা পাইয়া সরোষ নয়নে"

চাহিলেন; কিন্তু কবি এ স্থানে মাত্র দুটি ছত্রে এ ভাব কত উজ্জ্বল ও সজীব করিয়াছেন, দেখ :—

"চোকে চোকে মিলে পুন হাসে দুই জন!
আছে কি প্রেমের ছবি কোথাও এমন!"

আমাদের স্থানাভাব; নচেৎ এ গ্রন্থের অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু কি করিব, নাচার। এ শ্রেণী গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা এরূপ ক্ষুদ্র পত্রিকায় সম্ভবে না। কিন্তু যাহা উদ্ধৃত করা গেল, বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট তাহাই যথেষ্ট হইল। ইহাতেও কি তুমি বুঝিবে না যে, মহিলার কবি কত উন্নতমনা ছিলেন? "যৌবন রতন তব হরি" কথাটা ঠিক-ই হইয়াছে। এ শ্রেণীর যতই আদিরস আছে, কিছুই অসঙ্গত হয় নাই। আর এক কথা, এ গ্রন্থ অপরিণত মস্তিষ্ক বালকের জন্য লিখিত হয় নাই—একটু সূক্ষ্মদর্শী প্রবীণ বয়সেরই উপযোগী হইয়াছে।

তবে ইহার প্রথম অংশ—বিশেষতঃ অবতরণিকা যত মধুর, যত উচ্চ, যত সুন্দর, যত স্বাভাবিক হইয়াছে—দ্বিতীয় অংশে—বিশেষ জায়ার শেষ ভাগটায় সে পরিমাণে গুণ-গরিমা কিছুই নাই। এই অংশে তিনি তাঁহার অতি মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আরও, প্রথম অংশ অপেক্ষাও দ্বিতীয় অংশে অলঙ্কার ও রূপকটার কিছু বেশী বাড়াবাড়ী হইয়াছে। ভাষার ওজস্বিতার অভাব, কষ্ট-কল্পনা, সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য, শব্দ বিন্যাস পদ্ধতির অঙ্গহীনতা প্রভৃতি কয়েকটি অল্প-বিস্তর অভাব যদি না থাকিত, তাহা হইলে "মহিলা"র কবি বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিতে পারিতেন—সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অবস্থায়ও "মহিলা" পাঠে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে হেম নবীনের অপেক্ষা উচ্চাসনে না হউক—তাঁহাদের পার্শ্বেই বসিতে পারিতেন; এবং তিনি জীবিত থাকিলে বোধ হয়, এতদিনে আরও কোন্ না এ শ্রেণীর দু'এক খানা কাব্য-গ্রন্থ দেখিতে পাইতাম! হায়, ঈদৃশ কবিতা-গ্রন্থ পাঠ করা দূরে থাক—"মহিলা"র নামও অনেকে শ্রুত নহেন! এই সুদীর্ঘকাল—দশ বৎসর যাবৎ ইহার প্রথম সংস্করণও নিঃশেষিত হয় নাই—বোধ করি,

ছাপার খরচও উঠিয়াছে কি না সন্দেহ! এ অমর কবির অনাথা পরিবারি মণ্ডলীর জীবিকা নির্ব্বাহ কিরূপে হয়, কে তার তত্ত্ব লইয়া থাকে?—কারণ, দ্বিতীয়াংশে কবির জীবনী পাঠে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়াই অনুমিত হয়; এতদ্ব্যতীত আমরা কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে তাঁহার পরিবারবর্গের দারিদ্র্য-দুঃখের কথাও শুনিয়াছি। কিন্তু হায়, এ হতভাগ্য দেশের লোক কি তাহার প্রতিকার করিতে যত্নবান হইবে?

সুরেন্দ্রনাথের "মহিলা"র উদ্দেশ্য অতি মহৎ—অতি পরিষ্কার! প্রকৃতির প্রতিকৃতি নারী-বদনে তিনি যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় প্রেমের ছবি দেখিতেন, সে ছবি ক্রমে ঈশ্বর-প্রেমে উপনীত হইয়াছিল। মহিলার প্রথম অংশে এ উদ্দেশ্য অনেক অংশে সফল হইয়াছে। ইহা পাঠে বুদ্ধিমান পাঠক কবির হৃদয়ের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

সুরেন্দ্রনাথের "সবিতা-সুদর্শন" ও "বর্ষবর্ত্তন" নামক আরও দুইখানি খণ্ড-কাব্য আছে। এতদ্ব্যতীত "বিশ্ব-রহস্য" (রহস্য সন্দর্ভ) ও "হাম্মীর" নামক একখানি নাটকও আছে। এ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিলাম, এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁহার ভ্রাতা—এই "মহিলা" প্রকাশকের নিকট আছে;—উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে তিনি তাহা যে কোন লোককে ছাপাইতে বা কাপিরাইট্‌ও দিতে পারেন। কবি সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বশেষ কবিতাটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা উপস্থিত প্রস্তাবের উপসংহার করিব। কবিতাটি এই:—

"দীর্ঘকাল পরে কেন এ ভাব আবার!
কেন এ কটাক্ষ লালসার!
কিবা না ঘটেছে প্রেমে সাধনে তোমার,
বাকী কিবা রেখেছে আমার!
ভোগ যশ আশা গেছে, আছে মাত্র প্রাণ;
মধু গন্ধ কান্তিহীন কুসুম সমান!
তুলে আছি,—ভাল আছি, হৃদয় কন্দর
দগ্ধ হ'য়ে হয়েছে কঠিন;—
লোভের সিঞ্চনে আর গলে না অন্তর!
পরীক্ষায় হয়েছি প্রবীণ!
সুখ-দুঃখ-হীন সুখ এমন আমার!
চন্দ্রাননি! তুমি কেন বৈরী হও তার!
জেনেছি তোমায়, তুমি জেনেছ আমায়,
জানি তব প্রেম হলাহল;—
আমার মত্ততা, নাই গোপন তোমার,—
প্রেমে কভু নাহি জানি ছল।
না বুঝে পিরিতে প'ড়ে, বুঝে তার পর,
বহু দুঃখ ভুগে তবে হ'য়ে আছি পর!
চেয়ে দেখ অঙ্গে মম, ভেব দেখ মনে,
দেখেছিলে প্রথমে যেমন!—
কালে না নিন্দিতে পারি এ পরিবর্ত্তনে;
দেহে জরা—বয়সে যৌবন!
তব প্রেম-চিন্তা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুধার,
পুড়ে, উড়ে, ধুয়ে নিলে প্রাণের সুসার!!!"

"আহা, কি হৃদয়-ভেদি উক্তি! এই কবিতাটি কবির শারীরিক অবস্থার চিত্র,—মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাস,—সরল প্রেমের অশ্রুপাত!!" কবিবর! এ ছার মাটীর সংসার তোমার নহে—তাই তুমি অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ! এখন ঐ দেব-লোক হইতে চাহিয়া দেখ, তোমার এই সন্তপ্ত-অশ্রুজলের সহিত আমরাও ভক্তি-অশ্রু মিশাইয়া তোমার পাদপদ্ম-উদ্দেশে মুক্তাফল বর্ষণ করিতেছি!

মীরাবাই।

রাজপুতনার অন্তর্গত মেরতা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে মীরাবাই জন্ম-গ্রহণ করেন। জনৈক রাঠোর বংশীয় ভূপতি তাঁহার পিতা। মিবারাধিপতি রাণা কুম্ভসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাণা কুম্ভসিংহের গুণ-

গরিমা ও কীর্ত্তি-কলাপ ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। এখানে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে আবশ্যক মত আমরা দুই এক কথা বলিব।

ফলতঃ, এই দাম্পত্য-মিলন যোগ্যভাবেই সমাধা হইয়াছিল। ধন ঐশ্বর্য্য, রূপ গুণ, পরাক্রম প্রতিভা, কীর্ত্তি বদান্যতা,—কোন অংশেই কুম্ভ-সিংহ হীনপ্রভ ছিলেন না। এতদ্ব্যতীত আরও একটি অসাধারণ গুণে তিনি বিদ্বান ও শিক্ষিত সমাজের বরণীয় ছিলেন। তিনি একজন সুকবি বলিয়া বিখ্যাত। তদ্বিরচিত অনেক কবিতা ও গান আছে! একাধারে এত গুণে অধিকার থাকা মানুষের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, মীরার স্বামী-ভাগ্য অতি প্রশস্ত। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে সুখ-ভোগে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

মীরা রমণী-রত্ন। মীরা সাধিকা—হরিভক্তি-পরায়ণা। রমণীর কোমল-প্রাণে ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইলে, তাহার পরিণাম অতি রমণীয় হইয়া থাকে। মীরার সাধন-বৈচিত্র্য ও আত্মত্যাগ কিরূপ সৌন্দর্য্যময় ও মনোহর, তাহা ক্রমে বিবৃত করিতেছি। হায়, এই অপার্থিব রত্নের জন্য তাঁহাকে পার্থিব জগতের পার্থিব সর্ব্বপ্রকার ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

ধর্ম্ম বিষয়ে উৎকট মতদ্বৈধ জগতে চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—চিরকাল চলিবেও। ইহার জন্য কত বিবাদ বিসম্বাদ, কত জিঘাংসা রক্ত-পাত, কত আত্মবন্ধু বিচ্ছেদ—কতই যে অনর্থ ঘটিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব-হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাই ইহার মূল কারণ। কুম্ভসিংহ মীরাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলেন। মীরাও স্বামী-গৃহে পরম সমাদরে গৃহীতা হইলেন। তাঁহার অতুলনীয় গুণগ্রামে অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি সকল-কেই মোহিত করিলেন। রূপে গুণে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। তাঁহার সমান পরম লাবণ্যবতী রমণী তৎকালে আর পরিদৃষ্ট হইত না। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিছেন। সুকুমার কবিত্ব ও কাব্য-শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও স্ব-রচিত পদাবলী অতুলনীয়। বস্তুতঃ, কোমল নারী প্রকৃতিতে একাধারে এ

অমূল্য গুণ-গরিমা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। মীরার দোঁহা অদ্যাপিও ভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশ দেশান্তরে—বিশেষতঃ মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভক্তি-তীর্থ স্থান সমূহে গীত হইয়া থাকে।

স্বামী গৃহে মীরার কিছুদিন অতি সুখে অতিবাহিত হইল। পতি-পত্নী—উভয়েই কবি—উভয়েই অমূল্য কবিত্ব-রসাস্বাদনে বিভোর। উভ-য়েই উভয়ের গুণগ্রামে মোহিত। কিন্তু অনিবার্য্য কালস্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে এইবার আপনার আধিপত্য দেখাইল—চিতোর-অধিশ্বরী মহারাণী মীরাকে পথের ভিকারিণী করিল। ঈদৃশ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে পালিতা হইয়াও মীরার কেন এ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

মীরা অতিশয় বিষ্ণুভক্তি পরায়ণা ছিলেন! পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ের ফলে এক্ষণে সে ভক্তি-স্রোত শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। ধর্ম্ম-পরায়ণা পরম-বৈষ্ণবী মহারাণী মীরা ভোগ-বিলাস তুচ্ছ করিয়া একমনে—একপ্রাণে "রণছোড়" নামক পরমারাধ্য কৃষ্ণ মূর্ত্তির আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করি-লেন। এইবার কারণে কার্য্যের সংযোগ হইল—প্রজ্জ্বলিত আগুনে ঘৃতা-হুতি পড়িল। কুম্ভসিংহের পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি সকলেই শক্তি-উপাসক—সুতরাং ঘোর বিষ্ণু-বিদ্বেষী। সকলেই মীরাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিল। বিশেষতঃ রাজমাতা শ্বশ্রূ—ঠাকুরাণীর সহিত মীরার মনের অকৌশল জন্মিল—ধর্ম্মবিষয়ে উভয়ের মতদ্বৈধ হওয়ায় বিষম অনর্থের সূত্রপাত হইল। অভাগিনী মীরা এক্ষণে সকলের নিকট লাঞ্ছিত, অপ-মানিত ও তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন। রাজমাতা পুত্রবধূকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিষ্ণু উপাসনায় প্রতিনিবৃত্ত করিতে সাধ্যমত যত্ন করিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। মহারাণা কুম্ভসিংহ বিষম বিপদ-গ্রস্ত হইলেন। একদিকে পতিপ্রাণা সরলা সহধর্ম্মিণীর সকরুণ প্রেম-দৃষ্টি, অন্যদিকে সাক্ষাৎ করুণাধার সর্ব্ব-পূজনীয়া জননীর মাতৃ-ভক্তি! মহারাণা বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। দুই প্রমত্ত মাতঙ্গের মধ্যস্থলে পতিত-ব্যক্তির ন্যায় কুম্ভসিংহের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। শেষে বাধ্য হইয়া ধীর, বীর, কর্ত্তব্য-পরায়ণ কুম্ভসিংহ আপনার হৃদ্‌পিণ্ড বিসর্জ্জন করিলেন—নিজ প্রাণাধিক সহধর্ম্মিণীর প্রতি বিরূপ হইলেন—মাতৃভক্তিরই

জয় হইল—পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা মিটিল—অমাত্য প্রতিবাসী প্রজা সকলেরই সাধ পূর্ণ হইল। শক্তি-উপাসক ঘোর অসূয়া পরতন্ত্র হইয়া বিষ্ণু-উপাসকের প্রতি অতি কঠোর অহিতাচরণ করিল। জনরব উঠিল, মীরা ভ্রষ্টা—দ্বিচারিণী;—হরি-ভক্তি তাহার ভেকধারণ মাত্র। রাজমাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—পুত্রকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এইবার কুম্ভসিংহের বিশ্বাস টলিল—তিনিও মাতার সহিত একমত হইয়া অভাগিনী মীরাকে গৃহ-বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। মীরা স্বামী-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐকান্তিক মনে "রণছোড়ের" আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তিস্রোত আরও বর্দ্ধিত হইল। বিশেষ, ভগবানের প্রতি যাহার প্রাণ টানিয়াছে, তাহার গতির প্রতিরোধ করে কার সাধ্য? অলৌকিক সাধনার মোহ-মন্ত্র বলে এই সময় অনেকে তাঁহার নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। আরও, দিন দিন তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তিনি বহু তীর্থ-স্থান পর্য্যটন করিলেন। শেষে তিনি যখন মথুরা ও দ্বারকা তীর্থে গমন করেন, সেই সময়ে রাণা তাঁহার অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং মীরাকে জোর জবরদস্তি করিয়া গৃহে আনিবার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ-অনুচরকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে মীরা দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, আপনার আরাধ্য-দেবতার নিকট চির-বিদায় লইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রাজ-অনুচরগণ ইহাতে সম্মত হইলে মীরা তথায় উপস্থিত হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রাণভরে ইষ্ট দেবতার নিকট আপনার মনোদুঃখ জানাইলেন। দেবতার কাণে সে কাতরোক্তি স্থান পাইল। মীরার উপাসনা সমাপ্ত হইলে সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি সহসা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। ভক্ত-বৎসল অনাথ-শরণ ভগবান আপনার ভক্তকে হৃদয়ে স্থান দিলেন। মীরা তাহাতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবা মাত্র আবার সেই মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ অবিভক্ত হইল। অভাগিনী মীরা চিরদিনের মত এ ছার মাটীর সংসার পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত বৈকুণ্ঠ-লোকে প্রস্থান করিলেন—স্থূল শরীরী-দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম অমরী-দেহে অনন্ত পূর্ণ ব্রহ্মে লীন হইলেন!

"অদ্যাপিও মিবারে "রণছোড়" নামক কৃষ্ণমূর্ত্তির সহিত মীরাবাইএর পূজা হইয়া থাকে।" এই সময়ে মীরাবাই যে দুইটি পদ রচনা করিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১ম পদ। রাজন্ রণছোড়! দ্বারকায় আমাকে স্থান দাও এবং তোমার শঙ্খচক্র গদাপদ্ম দ্বারা যমভয় নিবারণ কর। তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং তোমার শঙ্খ ও করতাল ধ্বনিতে পরম আনন্দ রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, প্রেম সমুদয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।"

২য় পদ। "তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর। তোমা বিনা আমাকে দয়া করে এমন আর কেহ নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। মীরাপতি, হে প্রিয় গিরিধর! মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কখনও আমার বিয়োগ না হয়।"

মীরাবাইএর সমগ্র জীবনী যথাযথ ভাবে বর্ণন করা অতি কঠিন। ভক্ত-প্রাণ বৈষ্ণব কবির "শ্রীভক্তমাল" নামক ভক্তি-গ্রন্থে মীরা সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত-প্রাণ প্রহ্লাদের ন্যায় অভাগিনী মীরাকেও ভীষণ মৃত্যু-পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্ত মার্জ্জিত-বুদ্ধি পাঠকদিগের নিকট তাহা বিশ্বাস-যোগ্য হইবে না বিবেচনায় সে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে বিরত হইলাম। জানিনা, ইহার জন্যই বা কত কৈফিয়ৎ দিতে হয়। মীরা-বাইএর জন্ম-শক নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। কথিত আছে, একদা বাদসাহ আকবর সাহ তানসেনকে সঙ্গে লইয়া মীরার সঙ্গীত শুনিতে গিয়াছিলেন। ইহাতে এই বুঝাইতেছে যে, মীরাবাই আকবরের সম সাময়িক। কিন্তু ইতিহাস পাঠে এ প্রবাদ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

কবি-কল্পনা, রূপক ও জন-প্রবাদ ছাট বাদ দিলেও ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে যে, মীরাবাই একজন উপশ্রেণীর সাধিকা—হরিপরায়ণা বৈষ্ণবী ছিলেন। ফলতঃ, কোমল প্রকৃতি রমণীতে এত উৎকট সাধনার পরিচয় ইতিহাসে প্রায় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তদ্বিরচিত দোঁহা ও পদাবলী দৃষ্টে সহজেই তাঁহাকে একজন সুকবি ও সাধিকা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমিত হয়।

এই সকল পদাবলী ও দোঁহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। এস্থলে আমরা তাঁহার একটি মাত্র দোঁহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :—

"নিৎ নহনে সে হরি মিলে তো জল জন্তু হোই।
ফল মুল খাকে হরি মিলে তোঁ বাদুড় বাঁদরাই॥
ভিরণ ভখন কে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হ্যায় খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা॥"

মীরাবাই কৃত আরও একটি পদও এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"গিরিধর গোপালই আমার ; দ্বিতীয় কেহ নাই। যাঁহার মস্তকে ময়ূরমুকুট, তিনিই আমার পতি। যাঁহার গলায় কৌস্তুভমণি ও বক্ষঃস্থলে ভৃগু-পদ-চিহ্ন দেখা যায়। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কণ্ঠমালায় সুশোভিত। আমি তো ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি ; যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অশ্রুজল সেচন করিয়া প্রেমবীজ বপন করিয়াছি। সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোকলজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখন তো কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকেই জানে। প্রেমরূপ মন্থন দণ্ডদ্বারা যুক্তিপূর্ব্বক মন্থন করিয়া আমি মাখন ঘৃত বাহির করিয়া লইতেছি, যে কেহ ঘোল থাক্। রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করাতে সকল সুখ-সম্ভোগই হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর প্রতি মীরার প্রেমানুরাগ হইয়াছে ; ইহাতে যা হবার তা হউক।"

ধন্য পুণ্যভূমি আর্য্যস্থান! তোমাতেই এ মন রমণী-রত্ন শোভা পায়! মীরাবাইএর নামে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা আমাদের দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। ইঁহাদের রীতি নীতি ও পূজা-পদ্ধতি ও অস্মদেশীয় বৈষ্ণবগণ হইতে পৃথক। "অদ্যাপিও ইঁহারা মীরাবাই এবং তাঁহার ইষ্টদেব রণছোড়কে বিশিষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।"*

* ভক্ত-প্রাণ বৈষ্ণব কবির "শ্রীভক্তমাল" গ্রন্থ, ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "বীরমহিমা" গ্রন্থস্থ "মীরা-বাই"এর জীবনী অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। কর্ণধার-সম্পাদক।

প্রবাস-পর্য্যবেক্ষণ।*

শির্ষস্থ নাম দিয়া যে গ্রন্থের সমালোচনায় আমরা প্রবর্ত্ত হইতেছি, উপস্থিত পুস্তকখানি তাহার দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডের সমালোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, সুতরাং এই দ্বিতীয় খণ্ডের সম্বন্ধেও দুই চারি কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। তদ্ব্যতীত পুস্তকখানি যখন আমরা সমালোচনার জন্যই পাইয়াছি, তখন গুণাগুণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতেও বোধ হয় আমরা বাধ্য। ইচ্ছাধীন হইলে এ সমালোচনায় হয়ত আমরা প্রবৃত্ত হইতাম না—না হইতে হইলেই অন্ততঃ ছিল ভাল। অমৃত বাবুর সম্পাদিত সংবাদপত্রের যতটা আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের এইরূপ ধারণা যে, তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন, চিন্তাশীল এবং কৃতী লেখক। তাঁহার রচিত কোন পুস্তকের সমালোচনায় যদি প্রতিকূল কথাই বলিতে হয়, তাহা হইলে সে সমালোচনা করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, এ পুস্তকের সমালোচনা আমাদিগকে না করিতে হইলেই ছিল ভাল।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচন কালে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এই খণ্ডের অভাব যাহা কিছু আছে, তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে সংশোধিত হইবে। অমৃত বাবু তাঁহার পুস্তকের প্রথম খণ্ডে সেইরূপ আভাসই দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ড পড়িয়া আমরা সে আশায় নিরাশ হইয়াছি।

এই পুস্তক ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টা—গ্রন্থকার নাম দিয়াছেন, অবতরণিকা ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কতকগুলি অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক কথায় পরিপূর্ণ। অমৃত বাবু যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন সেখানকার একখানি বিখ্যাত সাময়িক পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকের সমালোচনকালে "ইণ্ডিয়ান নেশন" তাঁহার সেই

* Reminiscences : English and American. Part 2nd. England and India. By Amrita Lal Roy. Calcutta Roy Publishing House-Price 1 Re.

মারকীন প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া এবং তৎপরে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের ছল ধরিয়া বোধ হয় কিছু উপহাস করিয়াছিলেন। এই উপহাস বা সমালোচনার উত্তর দিবার জন্য এই গ্রন্থের এতটা স্থান নষ্ট করা হইয়াছে, যে তাহা একরূপ অমার্জ্জনীয়। এরূপ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবারই কোন প্রয়োজন ছিল না। এ জীবনে মত পরিবর্ত্তন কে না করে—কাহার না ঘটে? যাহার না ঘটে, সে মানুষ নহে। জ্ঞানের পরিবর্ত্তনেই মতের পরিবর্ত্তন। জ্ঞান যখন বৃদ্ধিশীল, তখন মতও যে পরিবর্ত্তনশীল হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। এ সহজ কথা বুঝাইবার জন্য এত আয়াস করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, ডিস্‌রেলীর উদাহরণ প্রদর্শন করিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। যদি অমৃত বাবু সেরূপ আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই থাকেন, তাহার সদ্বিধান দুই ছত্রে হইতে পারিত। যাহা দুই ছত্রে হইতে পারিত, তাহার জন্য বিশ পাতার অপব্যবহার করা কখনই সঙ্গত হয় নাই।

আমরা এ পর্য্যন্ত যতটুকু বলিয়াছি, তাহাতে পুস্তকের নিন্দাই বুঝাইয়াছে। আমাদের কিন্তু সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। পুস্তকে অনেক দোষ আছে, সত্য; তাই বলিয়া পুস্তকে কোন গুণ নাই, এরূপ কেহ যেন না মনে করেন। এমন কথা যদিও অনেক আছে, যাহার সহিত আমাদের মতের মিল বা সহানুভূতি নাই; তথাপি এমন অনেক কথা আছে, যাহা অন্তঃসার পূর্ণ এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচায়ক। সে সকল কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। ইহার এক আধটা নমুনা আমরা দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে, অমৃত বাবু লিখিয়াছেন যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে পরের নিকট ধার করা ধর্ম্ম, এবং কতকগুলি খৃষ্টানী প্রণালীর হাস্যজনক অপভ্রংশ বা সং মাত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ইহার উপযোগিতা নাই বলিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী যাইতে না যাইতে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। অমৃত বাবুর এই উক্তি অতি সারবান এবং তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক। বাস্তবিক আমাদের দেশের এই লুপ্তপ্রায় অথবা লোপ-প্রবণ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম—হিন্দু-ধর্ম্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্মের অস্বাভাবিক মিলন হইতে উৎপন্ন। সুতরাং অন্তঃসার শূন্য।

অস্বাভাবিক মিলনোৎপন্ন ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপর অনেক পরিচয় জগতে আছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরও সেই ঘটিতব্য দশা ঘটিতেছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অমৃত বাবু যে এই কথা সাহস করিয়া প্রকাশ্যতঃ লিখিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সৎ সাহসের আমরা শত প্রশংসা করি।

নব্য বাঙ্গলার কেমন একটা বিড়ম্বিত বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা যারপর নাই সুশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি তাঁহাদের সমকক্ষ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা বুদ্ধি-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতর কেহ নাই।—এই বিশ্বাসের মূলীভূত কারণ এই যে, তাঁহারা বিদেশীয় ইংরেজি ভাষা বেশ শিখিতে পারেন এবং সহজে ও সুন্দররূপে ব্যবহার করিতে পারেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সম্বন্ধে অমৃত বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বেশ সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী। অমৃত বাবু বলেন যে, আমাদের নিজের ভাষায় আমরা অজ্ঞ এবং আমাদের মৌলিক ভাব নাই বলিয়াই আমরা বিদেশীয় ভাষা সহজে উপার্জ্জন ও ব্যবহার করিতে পারি। সমালোচ্য বিষয়ে অমৃত বাবু আর যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমাদের মতের মিল থাকিলেও এই কথাটার উপর বিশেষ আপত্তি আছে। অমৃত বাবু ইহা অবশ্যই জানেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের যাঁহারা অধিনেতা, যাঁহাদের পরিশ্রমেই বাঙ্গালায় আবার একটা সাহিত্য হইতেছে, তাঁহারা সকলেই ইংরেজিতে কৃতবিদ্য—ইংরেজিনবীশ। সচরাচর ইংরেজি শিক্ষিতের অপেক্ষা ইহাঁরাই ইংরেজিতে অধিকতর অভিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। সুতরাং আর যে কারণই থাক্, স্বদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়াই যে আমরা সহজে বৈদেশিক ভাষা উপার্জ্জন ও ব্যবহার করিতে পারি, এ কথা ঠিক নহে। তবে এতৎ প্রসঙ্গে অমৃত বাবু আর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের ঐকমত্য আছে।

অমৃত বাবু বলেন যে, আত্ম-পরিতৃপ্তি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল মন্ত্র বলিয়া এবং ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক বেচা কেনার সামগ্রী বলিয়া আমাদের দেশ অপেক্ষা সে দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ব্যভিচারের ভাগ অধিক। অধিক যে বটে, তাহাত আমরাও দেখিতে পাই; কিন্তু কারণটা কি সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে? হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ব্যভিচারের অল্পতার আর যত কার-

ণই থাক না কেন, একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহারা অধিকতর ধর্ম্ম-শাসিতা, ধর্ম্মপ্রাণা। সে যাহাই হউক, অমৃত বাবুর এই কথাটা আমরা সখের সমাজ-সংস্কারকদিগকে বিবেচনা করিতে বলি।

আরও অনেক কথা বলিবার ছিল; কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। তাই সকল কথা বলা হইল না; যাহা বলিলাম, তাহাও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল না। অমৃত বাবুর এই পুস্তকে গুণ নাই, এমন কথা বলি নাই, বলিবারও নহে। তবে, যতটা গুণ দেখিলাম, তদপেক্ষা অধিক গুণ দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। দোষ যতটা দেখিলাম, তদপেক্ষা অনেক অল্প দেখিব, মনে করিয়াছিলাম। অধিক আশা করিলেই মানুষকে হতাশ হইতে হয়; আমরাও হইলাম। তত্রাপি নব্য বাঙ্গলীকে আমরা এই পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। ইহা পাঠে তাঁহাদের অনেক উপকার হইবে—অনেক দোষ সংশোধিত হইবে,—অনেক বিষয়ে চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

ফুলের সাজি।

ভবানী-স্তব।

নটনারায়ণ—ঝাঁপতাল।

পাষাণি! পাষাণ-প্রাণ হ'বে না কি বিগলিত,
কতদিনে দুঃখ-নিশি হ'বে মাগো সুপ্রভাত;—
অকৃতী সন্তান তোর ডাকিতেছে অবিরত।
প্রীতি-অশ্রুজলে, প্রেম-ভক্তি-ফুলে,
নির্ব্বিকার বিল্বদলে মাতৃপদ পূজরে;—
মুখে বল জয় জয়, 'মা' নামে কি আছে ভয়,
দেখিব কেমনে দয়া না হয় সঞ্চারিত।

কোথা মা লুকা'লে— ফেলিয়ে অকূলে,
চকিতে দেখা দিয়ে পুনঃ কোথা গেলে;—
উর মা শারদে, অভয়ে, বরদে,
রাখ মা শ্রীপদে—ত্রিলোক-বাঞ্ছিত॥

ফুল-নারী।

১

এস কাছে, ফুল-নারি, রাখ দূরে ফুল-ঝারি—
তুচ্ছ বন-ফুল।
হের এ প্রাণের কাছে কত গান ফুটে আছে,
কত প্রেম ফুটিতে আকুল!

২

বনে বনে কর খেলা, ফোটে ফুল কোন্ বেলা,
গাঁথে বা কি দিয়ে,—
জান তো সকলি, নারি, কত হাসি-অশ্রুবারি
দু-দণ্ডের হেলা-খেলা নিয়ে!

৩

ফুল সম হাসি-হাসি— ফোটে সুখ-অভিলাষী
হারাইয়া দিশে,
ল'য়ে প্রাণ, ল'য়ে দেহ, ল'য়ে কত আশা-স্নেহ
পর-হাতে টুটিতে নিমেষে!

৪

টুটিতে পরের হাতে, কত স্বপ্ন পাতে—পাতে
ফোটে কাব্য হ'য়ে!
নিমেষ বিস্মৃতি লাগি, চির-জন্ম আছি জাগি,
শত চুম্ব আলিঙ্গন ল'য়ে।

৫

ধর ধর করপুটে, পুলকে পড়িবে লুটে,
আবেশে এলায়ে ;
অপেক্ষার শুষ্ক দল, উপেক্ষার নিশাজল,
ঝর্ঝরে পড়ুক ঝুরে পায়ে।

৬

—থর থর মর্ম্মস্থল, যায় ধরা রসাতল,
আহা, যাক্—যাক্।
আরো লাজে হেসে কও, নিঙাড়ি উপাড়ি লও! * * *
আর না—দ'লো না পায়ে, থাক্।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রেম-গীতি।

নং ১—বিরহ। মূলতান—আড়াঠেকা।

দেখাদেখি ফুরাইল ক'রেছি কঠিন পণ।
দু'দিন না যেতে কেন মন এত উচাটন।
গোপ-নারী ভেবেছিল, 'শ্যাম রাখি কি রাখি কুল',
দুঃখিনীর দায় হ'ল, পণ রাখি কি রাখি প্রাণ॥

নং ২—মিলন। মূলতান—আড়াঠেকা।

শত বর্ষ বাঁচি যদি দেখিব না ছিল পণ।
উপহাস কর কি তাই দু'দিনে দেখে মিলন।
প্রেমের জ্যোতিষে গণে, বিরহে বৎসর ক্ষণে,
ভাবনা কি তবে মনে, বর্ষ গেছে অগণন॥

শ্রীললিতমোহন সিংহ, সাং চকদিঘী।

বিদায়।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মুখে প্রেম থাক্‌লে কি হয় প্রাণে প্রেম থাকা চাই।
প্রাণে প্রাণ এক না হ'লে প্রাণে ব্যথা তাইতে পাই॥
রূপ বলে তায় ভাল বাস, প্রেম বলে তার জীবন নাশ,
হাসির ভিতর বিষের বাণ এমন কোথাও দেখি নাই ;—
এমন সুধায় গরল উঠে প্রেমের গরব এই কি ছাই।
কারেও প্রেমের ভাগ দিব না, কারোর প্রেমের ভাগ নিব না,
যেমন ছিলেম তেম্‌নি রব কারো সাথী আর হ'ব না ;—
একলা হেসে—একলা কেঁদে—একলা হ'য়ে চ'লে যাই॥

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শেষ।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

আর মায়া বাড়া'ও না, আর লোভ দেখা'ও না,
আর ও মোহন-রূপে ছ'লনা আমায়।
বড় প্রাণে দে'ছ দাগা, আরো কি গো দিবে সাজা,
মেরে ফেল একেবারে তবে অবলায়॥
মৃদু হেসে—কাছে ব'সে, কাজ নাই ভালবেসে,
থাক দূরে, হৃদাকাশে হেরিব তোমায় ;—
জীবনের এই শেষ, না চাহি সুখের লেশ,
বিরহ-বিদায় চির মাগি তব পায়॥

সাহিত্য-সংবাদ।

সুরাপান বা বিষপান। কলিকাতা "আর্য্য" সম্প্রদায়ের জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৮০ নং নিমতলা-ঘাট ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বসাকের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ও ছাত্রদিগের জন্য ॥০ আনা। সুরা সেবনের বিষময় ফল ইহাতে বর্ণিত আছে। এই মত পোষকার্থ অনেক ডাক্তারী পুস্তকের সারাংশ, মহা মহা লোকের অভিমত, মাদক-নিবারণী সভার সঙ্গীতাদি অনেক বিষয়ই সংগৃহীত হইয়াছে। সুরা সেবনের ঘোর অপকারিতা প্রদর্শনার্থ "বিষবৃক্ষ" নামক একখানি চিত্রপটও ইহাতে সংযুক্ত আছে। সঙ্কলনকারের সদুদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। এ শ্রেণী গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

রাধামতি। উপন্যাস। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২ টাকা। উপন্যাস খানি অতি বৃহৎ। বিষয় বিবেচনায় ইহা কাটিয়া, ছাটিয়া, বাদ সাদ দিয়া অর্দ্ধেকেরও কম প্রকাশ করা উচিত ছিল—তাহাতেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। বাজে কথায় ও বাজে বর্ণনায় ইহার প্রায় বার আনা স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে গ্রন্থের ভাষা মন্দ নহে—উদ্দেশ্যটিও ভাল। দামটা বড়ই অধিক হইয়াছে। অতঃপর কি অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করা প্রকাশকের ইচ্ছা? বড়ই বে-আইনী প্রথা!

বসন্ত কুমার। উপন্যাস। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার বিরচিত। মূল্য ১৷৹ টাকা। বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিলাম. সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন ত অনেক বহি; কিন্তু এ গ্রন্থ পাঠে তাঁহার সে গুণ-গরিমা ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বিশ ত্রিশ খানা গ্রন্থ-প্রণেতার সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস পড়িয়া যে শ্রম সার্থক-জ্ঞান করিব মনে করিয়াছিলাম, দুঃখের বিষয়, তাহার কিছুই পাইলাম না। উপন্যাসের আগাগোড়াই কাহার না কাহার নকল—ভাবের নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে ভাষা সরল এবং গ্রন্থকারের বর্ণনা-শক্তিও আছে। কিন্তু তাহাও যেন কেমন বিনাইয়া বিনাইয়া থিয়েটারী টানা সুরে গ্রথিত। গ্রন্থকার নূতন আসরে নামিলে, বোধ করি, আমরা এত কথা বলিতাম না; তবে তিনি নাকি একজন "বিশ ত্রিশ" খানি গ্রন্থের রচয়িতা, তাই তাঁহাকে আর অধিক প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। আর বটতলার আদর্শে গ্রন্থের একরূপ দাম লিখিয়া শেষে সিকি কি তাহারও কম মূল্যে—অথবা "ব্রহ্মাণ্ড" উপহার সমেৎ তাহার কাট্‌তি করা বড়ই বে-আদবি! এ দোষের মার্জ্জনা নাই।

আত্মরক্ষার মূল মন্ত্র। গ্রন্থকার বড় সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যে দেশে অত্যুৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থ সমূহের ছাপাই খরচাও উঠে না, সে দেশে পাঠকের উপর মূল্য বিচারের ভার অর্পণ করা মন্দ পরামর্শ নয়। তবে কি না কথা এই, ইহাতে একেবারে মূল্যের—কি গ্রন্থের অস্তিত্বই লোপ না হয়! গ্রন্থের ভাষাটি বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। ইহাতে অন্ন, জল ও বায়ু—মানুষের এই তিন সর্ব্ব প্রধান আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপকারী বটে।

ঊষা-চিন্তা। অর্থাৎ আধুনিক আর্য্য-মহিলাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। শ্রীমতী স্বর্ণময়ী গুপ্তা প্রণীত। মূল্য ৷৷৹ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী অনেক স্থলে আর্য্য-মহিলাগণের জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। পরের দুঃখে চক্ষের জল ফেলা মহত্ত্ব স্বীকার করি; কিন্তু যাহা আদৌ দুঃখের কারণ নয়—প্রকৃত সুখের আধার স্বরূপ, তাহার জন্য বিলাপ করা কিরূপ দেখায়! গ্রন্থকর্ত্রী

পাশ্চাত্য ও জাতীয় শিক্ষার একদেশ মাত্র দেখিয়া বিড়ম্বিতা হইয়াছেন। সবটা দেখিতে পারিলে, বোধ করি, তাঁহাকে আর এ গ্রন্থের সকল কথাগুলি লিখিতে হইত না। তবে তাঁহার দুই একটি প্রস্তাব অতি সারগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত এবং সকলেরই অনুমোদনীয়। এ কারণ গ্রন্থকর্ত্রী ধন্যবাদের পাত্রী, সন্দেহ নাই।

চন্দ্রহংস। নাটক। "পাগলিনী" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য ৸৹ আনা। এ পৌরাণিক গল্পটি নাটকের বিলক্ষণ উপযোগী। নির্ব্বাচন অতি সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত নাটক লিখিবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের নাই। তবে কাব্যাংশে ইনি সুনিপুণ। বিশেষ, সঙ্গীত রচনায় ইহাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, সে পরিচয় পাইয়াছি। "বিফল জনম, বিফল জীবন, জীবনের জীবনে না হেরে" গানটি আমাদের ধারণা ছিল যে, মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্রের রচিত; কিন্তু এ বিষয়ের আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, এটি এই যোগেন্দ্র বাবুরই রচিত বটে।

জীবন-কুমার। (পৌরাণিক আখ্যায়িকা—পূর্ব্বভাগ) "জীবন-পরীক্ষা" প্রভৃতি রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গল্পটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থের ভাষাটিও বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। এখানি উচ্চ-শ্রেণীর বালকদিগের পাঠ্য-শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইলে ভাল হয়। ধর্ম্ম-নীতি ইহার স্তরে স্তরে সংমিশ্রিত। সুতরাং বালকদিগের শিখিবার অনেক জিনিস ইহাতে আছে। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য ইহার মূল্য ৸৹ আনা ও সাধারণের জন্য ১ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সিন্দূর-বিন্দু। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা। এখানিকে 'উপন্যাস' নাম না দিলে ভাল হইত। ইহা একটি গল্প মাত্র। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ভাল নহে—মন্দ। গ্রন্থকারের ভাষা ও লিপি-চাতুর্য্য প্রশংসনীয়।

প্রবেশিকা বোধিনী। শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ভড় (শাস্ত্রী) প্রণীত। এখানি সংস্কৃত আদর্শ-প্রশ্ন। প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীগণ ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে পারেন। প্রশ্ন-নির্ব্বাচন ও তাহার ব্যাখ্যা প্রশংসনীয়।

আক্কেলবাগ। গ্রন্থের নাম শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, বটতলার বুঝি কোন্ সংস্কারক প্রেত-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন! কিন্তু পাঠ করিয়া আমাদের সে সংস্কার দূর হইয়াছে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ভাল—লেখাও বেশ।

মানস-কুসুম। শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র বিরচিত। এখানি কবিতা গ্রন্থ। স্থানে স্থানে ভাষার উচ্ছ্বাস বেশ আছে; তবে হাত এখনও কাঁচা—এখনও শিক্ষার আবশ্যক।

ধ্যানাবলী। শ্রীযুক্ত রাখালদাস কবিরত্ন কর্তৃক সংগৃহীত [illegible]

পাত্র। এ গ্রন্থ পাঠে ভক্ত-প্রাণ পাঠকের ভক্তি-তৃষ্ণা মিটিবে। নানা দেব-দেবীর অমূল্য ধ্যানে "ধ্যানাবলী"র কলেবর পরিপুষ্ট। এ শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

সেন রাজগণ। (বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজবংশের ইতিহাস) ২য় সংস্করণ ও "শ্রীদারুব্রহ্ম" (জগন্নাথদেবের বিবরণ) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। কৈলাসবাবু ইতিহাসে সিদ্ধহস্ত। দেশ দেশান্তরের অনেক বিবরণ সংগ্রহ ও দেখা শুনা পড়া তাঁহার যথেষ্ট আছে। এ দুইখানি গ্রন্থই অতি উপাদেয় হইয়াছে।

প্রসাদ। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। দেবীবাবু বঙ্গ-মাতার সুসন্তান; তিনি একজন প্রকৃত বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবক। ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি অনেক করিয়াছেন—অনেক করিতেছেন; তাহার সাক্ষ্য তাঁহার "নব্যভারত"। "প্রসাদ" পড়িয়া আমরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছি,—বস্তুতঃ বড় সুখী হইয়াছি। ধর্ম্মভাবে ধর্ম্মপ্রাণ-গ্রন্থকারের প্রাণ আকৃষ্ট। যাহা লিখেন, প্রকৃতি-দর্পণ হইতে সেই স্বর্গীয় ছবির প্রতিবিম্ব অমনি তাহাতে প্রতিভাত হয়। প্রবন্ধগুলির সকল স্থলে একমত হইতে না পারিলেও "সরলে শোভাময়ী" ভাষার তেজস্বিতায় ও গভীর উদাত্তপূর্ণ ভাবে আমরা মোহিত হইয়াছি।

সারস্বত-কুঞ্জ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাঙ্গালীর গৌরবের ধন "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" যে লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়া বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে, উপস্থিত গ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত। চন্দ্রশেখর বাবুর ভাষার নূতন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এমন বাজে কথা বর্জ্জিত, অন্তঃসারবিশিষ্ট, গভীর উদাত্তভাবপূর্ণ লিখন-প্রণালী বাঙ্গলা সাহিত্যে অতি বিরল। "সতীদাহ" "পশুপূজা" "যৌন-নির্ব্বাচন" প্রভৃতি প্রবন্ধে গ্রন্থকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি। (কতিপয় সামাজিক প্রবন্ধময় গদ্য-কাব্য) শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত; মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। ঘটক মহাশয় সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। তাঁহার উপস্থিত "আমি" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের সৌন্দর্য্য, বর্ণনার ঐশ্বর্য্য—কবিত্বের উপযোগী মাল মসলা, সাজ সরঞ্জাম এ গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আছে। ব্যঙ্গ রহস্য ও শ্লেষ এ গ্রন্থের অস্থি-মজ্জায় সন্নিবিষ্ট। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া শিখিবার, ভাবিবার, হাসিবার, বুঝিবার অনেক কথা আছে। আর হৃদয়বান্ দূরদর্শী বুদ্ধিমন্ত পাঠক, হয়ত বেশী বুঝিয়া, একটু একটু কাঁদিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় বর্ষ ও দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

বলিতেছেন দাঁড়াও ক্ষণেক? আমি অর্ণবের গানে, পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব অন্তরবিজনে আমি তোমারে বাঁধিব।

প্রথমেই দেখিতে পাই, কবি প্রভাতের পানে চাহিয়া আছেন। আলো-ঘেরা সাগরসঙ্গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে কি যে সাজিয়া উঠিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহার মনে কখনো অজানা সুখ কখনো বা অজানা দুঃখ গুমরিয়া উঠিতেছে। সঙ্গীতে বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে, কবির প্রাণ বীণার তার কাঁপিয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণ তিনি আপনাকে সসীম ভাবিয়াছিলেন, আর সে ভাব নাই, এখন তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণায় আনিতে পারেন, তাহার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসীমকে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন—

জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস
জানিনা গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ
অনন্তের ছায়া ভরা আমার পরাণ!
সাড়া পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতে আলো মাঝে, সাঁঝের আঁধারে
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয়-দুয়ার
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে।

কবির প্রাণে অনন্ত উচ্ছ্বাস, অনন্ত আকুলতা, কোথাও তিনি সীমা পাইতেছেন না, বিশাল অগাধ সঙ্গীতমণ্ডলে তিনি চিরনিমগ্ন থাকিতে চান। তিনি বলিতেছেন—

"আমি অন্ধ হব
শব্দসাগর মাঝে আমি ডুবে রব!
আর কিছু রহিবে না। ভুবন মণ্ডল
গানে গানে সুরে সুরে কাঁপিবে কেবল।"

আজ তাহার দৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত। অতীতকে তিনি বর্ত্তমানে দেখিতেছেন। সকল জনম যেন এক হয়ে গেছে একটু পুষ্পের মত স্বপ্নে ভাসিতেছে। মেঘপূর্ণ দিনে সমুদ্রের তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কবির প্রাণেও তীব্র

হাহাকার। এ হাহাকার কিসের? একি সুখ? একি দুঃখ অথবা ইহা গভীর প্রণয়? এই দিগন্তব্যাপী ভয়ঙ্কর উন্মত্ততার মধ্যে কবি আপনাকে বিসর্জ্জন করিতে চান। মৃত্যুকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন——

"আমার পরাণতরে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হতে দিতেছিনু ধরা

এ ভবে যাঁহার তাঁহার কাছে কিছুই ভয়ঙ্কর নয়। তাই কবি পরেই আবার শান্তির চিত্র আঁকিয়াছেন—তাঁহার প্রাণে অসীম আনন্দ ও গভীর প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। সাগরের সহিত আজি তাহার প্রাণ একসূত্রে বাঁধা। কিন্তু এই বন্ধন মুক্তির রূপান্তর কেননা এই বন্ধন হইয়াছে বলিয়াই আজ তাঁহার প্রাণ আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মিলনের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের পরে কবি বিরহের সুর ধরিলেন। "মেঘাক্রান্ত দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ চারিধার। কবি সমুদ্রের এপারে বসিয়া আছেন। কবে তাহার সহিত প্রণয় হইয়াছিল সে সব কথা আজ মনে নাই। দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দ পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিবার জন্য তিনি নিভৃতে অভিসারে আসিয়াছেন। সকলে যে গান শুনিতে পায়, আজ তিনি সে গান শুনিতে আসেন নাই। তিনি গাহিতেছেন।

গাব দুজনায়
আঁধার রজনী যবে ঢাকিবে তোমায়

মিলনের পর কবি সাগরকে আর এক চোখে দেখিয়াছেন। এবার আর আবেগ উচ্ছাস নয়, এবার তিনি বলিতেছেন—

কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে পাতান উত্তর তার
হৃদয় ভরিয়া আছে কোন সমস্যায় ভাব
জীবন মরণ সাথে কি কথা কহিছ আজি
কোন্ তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে কি ব্যথা উঠিছে বাজি।

তারপর

হে পূজারি! আজি তুমি কোন্ পূজা কর
পরাণ প্রদীপ মোর উর্দ্ধে তুলি ধর

তারপর

দেবতার তরে আজি আমার আকুল হিয়া
ঢেকেছ ঢেকেছ মরি! কি মধু বিরহ দিয়া।

এই খানে সাগরের এপারের কথা শেষ হইল। এপারে কবির প্রাণে দেবতার জন্য একটা ব্যাকুল বিরহ জাগিয়া উঠিল এইখানে কিন্তু তাঁহার আকাঙ্খা পূর্ণ হইল না। তাহার গতি আরো উর্দ্ধে। কবি তারপর ওপারের কথা কহিয়াছেন

আমারে ডুবায়ে দাও ওগো মহাপ্রাণ
আমারে ভাসায়ে লও তোমার ওপারে
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন
কাঙ্গাল পরাণ হবে রাজার মতন।

এখনও সন্দেহ? এখনো শান্তি নাই। তবে শান্তি কোথায়? বিশ্রাম কোথায়?

বিশ্রাম কাহাকে বলে? নদী যখন সাগরে মিলিত হয় তখনই তাহার বিশ্রাম। স্বল্পগতির বিশ্রাম অনন্ত গতিতে, অন্তের বিশ্রাম অনন্তে। অনন্তের ছায়া যখন অনন্তে মিলাইয়া যায় তখনই সে বিশ্রাম লাভ করে। মানুষ যখন পরম চৈতন্যে বিলীন হয় তখন বলিতে পারি সে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে তাই কবি গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন—

এপার ওপার করি পারি না ত আর
আজ মোরে ল'য়ে যাও ওপারে তোমার
পরাণ ভাসিয়া গেছে কুল নাহি পাই
তোমার অকুল বিনা কোথা তার ঠাঁই।

বেদান্তের সার কথাগুলি কবির ভাষায় কবির গতিতে এই গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে। কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা হিন্দুর প্রাণের সহিত মিশিবে।

আজকালকার কবিতায় ভাবের অন্তর্মুখী গভীরতা বড় একটা দেখা যায় না। বাহিরের বা অংশের সৌন্দর্য্য লইয়া প্রায় সকল কবিরাই ব্যস্ত। এ গ্রন্থখানি আমাদের একটি নূতন পথ দেখাইয়া দিয়াছে। কবি যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এ দেশে নূতন নয় একথা স্বীকার করে। তবুও তাঁহার সাগর-সঙ্গীত একটা নূতন, একটা বিপুল জিনিস—গম্ভীর মনোরম। অনেকে যে বাঁশী বাজায় তিনিও সেই বাঁশী বাজাইয়াছেন, কিন্তু যাদুকরের হাতে তাহা অপূর্ব্ব মোহন সুরে বাজিয়াছে।

অনেকে ইহার কতকগুলি কবিতা অস্পষ্ট বলিতে পারেন, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট নয়—তাহা mystic unfathomable—সাধারণে তাহার তলদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। সেটা কি কবির দোষ?

গ্রন্থে কতকগুলি কবিতা আছে বলিয়াছি। কিন্তু কবির ভাব তাহাদের ভিতর দিয়া এমন সহজ ভাবে তরঙ্গিত হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের এক একটা স্বতন্ত্র কবিতা বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থখানি যেন একটি সম্পূর্ণ কবিতা নানা-রূপ সৌন্দর্য্য সম্ভারে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজকালকার দিনে, খাঁটি দেশী ভাব এমন সুন্দর কবিতায় যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে থাকিয়াও যিনি আত্মবিস্মৃত হন নাই। গৃহে গৃহে তাঁহার কবিতার সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থের বহিরবয়ব সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, বাঙ্গলা ভাষায় ইতি পূর্ব্বে এমন সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। যেমন ছাপা, তেমনি কাগজ, ছবিগুলিও তেমনই সুন্দর। সর্ব্বত্র প্রকাশকের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিয়জনকে উপহার দিবার স্বতই ইচ্ছা জন্মে। মাঃ সঃ

রবীন্দ্র সম্ভাষণে। *

বর্ত্তমান রজনীর পূজ্য অতিথির জন্য আনন্দ করিতে আজ আমরা মিলিত হইয়াছি, কি আমাদের নিজের গৌরব-কথা স্মরণ করিয়া এই আনন্দ-সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা একটু কঠিন। আমার মনের মধ্যে যতদূর অন্বেষণ করিয়া পাইলাম, তাহাতে মনে হয়, স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই আসিয়াছি। যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে মনে পূজা করিয়া আসিয়াছি, শিক্ষকের তাড়না সহ্য করিয়া পাঠ্য পুস্তক দূরে সরাইয়া গোপনে যাঁহার কবিতা ও রচনা পাঠে আমার বালকহৃদয়কে তৃপ্ত করিয়াছি, যাঁহার গল্প নাটক গান ও কবিতা পাঠ করিয়া যৌবনে ও প্রৌঢ়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, যাঁহাকে আমার দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া দিগ্বিজয়ের জন্য দেশান্তরে পাঠাইয়াছি, আজ সে জয়ী হইয়া সফলকাম হইয়া বিশ্ব-সাহিত্যের বিপুলক্ষেত্রে আমার সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়াইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, ইহা আমার আনন্দের দিন নয় তো কি বলিব? আমি সর্ব্বপ্রথমে যাহাকে ভাল বলিয়াছি আজ জগতের লোক তাহাকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিতেছে ইহা আমারই গুণগ্রাহিতার পরিচয়, তাই আমি আজ সুখী ও আনন্দিত। আমি তাঁহাকে ভাল না বলিলেও আজ বিশ্ববাসী তাঁহাকে ভাল বলিত, কিন্তু আমি সর্ব্বাগ্রে

* Orient ক্লাবের আনন্দ-ভোজে পঠিত।

তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম আজ আমার সেই গৌরব। আমি অর্থে এখানে আমর যে কয়জন উপস্থিত আছি তাহা নহে, আমি যাহা বলিতেছি ইহা বঙ্গের সাত-কোটি নরনারীর সম্মিলিত সমস্বরে—বঙ্গবাণী আমার মুখ দিয়া বাহির করাইতে-ছেন, ইহাতে কেহ সন্দিহান হইবেন না।

যে কেহ সমাজে ধর্ম্মে বা সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে তাহাকে অনেক সময় অনেক অযথা অন্যায় তাড়না সহ্য করিতে হয়, ইহা বোধ হয় নৈসর্গিক নিয়ম, কোন দেশের কোন মনীষি ব্যক্তিই এ তাড়নার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। আমাদের কবিরও কখন কখন সে দুরবস্থা ঘটে নাই এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না।

আদর্শ ব্রহ্মচারী, বীরোত্তম ভীষ্মের নিন্দা অনেক সময়ে শাস্ত্র করিয়াছে, স্বয়ং ভগবানের নিন্দা কংস শিশুপাল জরাসন্ধ প্রভৃতি মূঢ়েরা করিয়াছে, তাহার ফল যাহা হইয়াছে, পুরাণ তাহার সাক্ষী। যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব তাহাই চিরন্তন এবং তাহাই সর্ব্বশেষে জয়লাভ করিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

আর কবিশ্রেষ্ঠ, আজ তোমারও আনন্দের দিন। পিতৃহীন শিশু বঙ্গভাষাকে যখন তুমি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন আজকার দিন তোমার কল্পনায় আসিয়াছিল কিনা জানি না। তোমার মানসখনিসমুত্থিত বহুমূল্য মণিমাণিক্য-দ্বারা যখন তাহার সর্ব্ব অঙ্গবিভূষিত করিতেছিলে, তখন সে আজ যে গৌরব লাভ করিয়াছে তাহার কল্পনা তোমার মনে সম্ভবতঃ আইসে নাই, আসিয়া থাকিলেও এত শীঘ্র তুমি সফলমনোরথ হইবে তাহা বোধ করি ভাবিতে পার নাই। যে নগ্ন, নিরুপায়, উপেক্ষিত শিশুর সর্ব্বপ্রকার 'ভরণ পোষণের' ভার তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলে সেই শিশু আজ বলয়-কুণ্ডল-কেয়ুর সুশোভিত হইয়া যৌবন সৌন্দর্য্যের বিপুল গৌরবে বিশ্ব-সাহিত্য সভায় উন্নত মস্তকে শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করিয়া তোমার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে—ইহা তোমারও পরম আনন্দের দিন এবং এই আনন্দের দক্ষিণ বায়ুর ঈষদুষ্ণহিল্লোলে তোমার মানসোপবনজাত স্ফুটতর-কুসুমশোভার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য বিশ্ব-মানব উদ্‌গ্রীব হইয়া উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিবে ইহা যেন তুমি বিস্মৃত না হও।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার

বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বিলাতের গল্প" নামক বহুচিত্রশোভিত একখানি গল্পের পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত করিবেন। পুস্তকখানির জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

মালঞ্চের ও সাগর-সঙ্গীতের সুবিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয় 'প্রেম ও কবিতা' নামক একখানি অপূর্ব্ব অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করিবেন।

মানসীর লেখক ও বঙ্গের উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি, এ তাঁহার নূতন "পর্ণপুট" নামক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন মানসীর লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকের সম্পাদনের ভার গ্রহ করিয়াছেন।

'মন্দিরা' প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'সপ্তস্বরা' ও 'খঞ্জনী' নামক অপূর্ব্ব কবিতা পুস্তক সহ শীঘ্রই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। আশ করি তিনি 'সপ্তস্বরা'র গানের সহিত 'খঞ্জনী'র বাদ্য মিলাইয়া সকলের মন মুগ্ধ করিতে পারিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদি ১০৮ খানি উপনিষদ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। তন্মধ্যে যে বারখানি শাঙ্করভাষ্য আ সেইগুলি মূল অন্বয় মূলানুবাদ শাঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ সহ প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত দুষ্কর্ম্মা নষ্টাচার্য্য মহাশয়ের নূতন 'বিজ্ঞাপনের নমুনা' আগামী মাসের মানসী প্রকাশিত হইবে।